ভারতের সঙ্গীত গুণী

দ্বিতীয় খণ্ড

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

সঙ্গীত বিষয়ক :

বাঙ্গালীর রাগসঙ্গীত-চর্চা
ভারতীয় সঙ্গীতে ঘরানার ইতিহাস
দরবার নটী কলাবন্ত (প্রথম পর্ব)
সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ
আসরের গল্প
বিষ্ণুপুর ঘরানা
সঙ্গীতের আসরে
সঙ্গীতসাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীতকল্পতরু

জীবনী :

বিচিত্র প্রতিভা
CHAITANYA

ছোটদের :

এশিয়ার রূপকথা
কথায় কথায়
একদা যাহার বিজয় সেনানী
একলব্য

উৎসর্গ

সুহৃদ্বর শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

করকমলেষু

নিবেদন

'ভারতের সঙ্গীতগুণী' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশে অনেক বিলম্ব ঘটে গেল। বিদ্যুৎ সঙ্কট, প্রেসের কাজকর্মে বিপর্যয়, প্রয়োজনের সময় কাগজ অপ্রাপ্য ইত্যাদি নানা কারণে নষ্ট হয়েছে দুটি বছর। আশা করা যাক পরের খণ্ডগুলিতে এমন বিপত্তি দেখা দেবে না।

এই দ্বিতীয় খণ্ডে আছে বন্দে আলী খাঁ, মুরাদ খাঁ, তাজ খাঁ, গৌরীশঙ্কর মিশ্র, মানদাসুন্দরী, বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, মীর্জা সাহেব, কৃষ্ণভামিনী ও মৌজুদ্দিনের সঙ্গীতজীবন-ব্যক্তিজীবনের বিস্তারিত পরিচয়। বিগত যুগের সাঙ্গীতিক ইতিহাসের বিশিষ্ট অঙ্গ তাঁদের সঙ্গীতকৃতি। সাধনা ও সিদ্ধিতে, বহু বিচিত্র দানে ও কীর্তিতে সমুজ্জ্বল সেইসব শিল্পীদের নন্দন-জীবন। কিন্তু অতীতের হারানো লোকে আত্মগোপন করেছিলেন তাঁরা। কয়েকজনের নাম পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়। একমাত্র মৌজুদ্দিন খাঁ ভিন্ন তাঁদের প্রসঙ্গ গ্রন্থভুক্ত হল এই প্রথম। প্রতিকৃতিগুলিও দুষ্প্রাপ্য। তাজ খাঁর ছবিটি এই প্রথম মুদ্রিত। প্রথম খণ্ডে যেমন, উক্ত গুণীদের সম্পর্কেও যাবতীয় তথ্য, উপকরণ নির্ভরযোগ্য, নিরপেক্ষ সূত্রে সংগৃহীত হয়েছে। আর তাঁদের অনুষঙ্গে স্থান পেয়েছে সমকালীন সঙ্গীত-জগতের নানা জ্ঞাতব্য সংবাদ। সেইসূত্রে ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে উনিশ শতক ব্যাপী এবং বিশ শতকীয় প্রথম ভাগের কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের কয়েকটি ধারার বিবরণ পাওয়া যাবে।

'ভারতের সঙ্গীতগুণী' পুস্তকমালা সম্পর্কে আমার বক্তব্য সবিস্তারে জানিয়েছি প্রথম খণ্ডের ভূমিকায়। এখানে সংক্ষেপে বলি, ভারতীয় রাগসঙ্গীত-চর্চার ক্ষেত্রে বিস্মৃতির অতল থেকে লুপ্ত রত্নোদ্ধার আমার প্রধান লক্ষ্য এবং সমস্ত পরিশ্রমের প্রেরণা। আমাদের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যের প্রতি পাঠকদের যদি ঔৎসুক্য ও অনুরাগ জাগে, তাহলেই সব শ্রম সার্থক হয়। ইতি

দোল পূর্ণিমা,
১৭ ফাল্গুন, ১৩৮৬,
১লা মার্চ, ১৯৮০

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

মানদাসুন্দরী
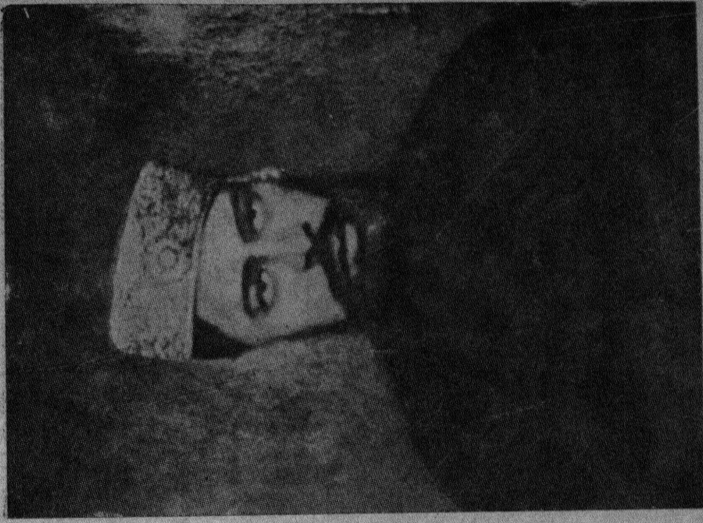
বন্দে আলিখাঁ

বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

তাজ খাঁ

কৃষ্ণভামিনী
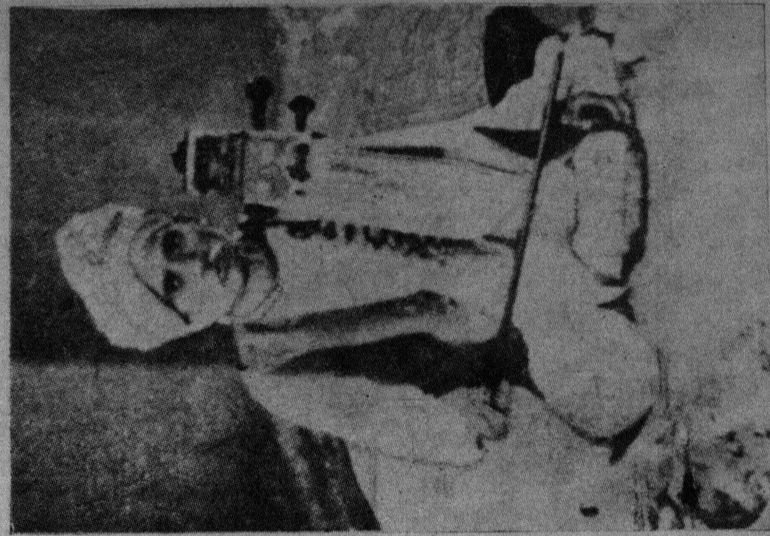
গৌরীশঙ্কর মিশ্র
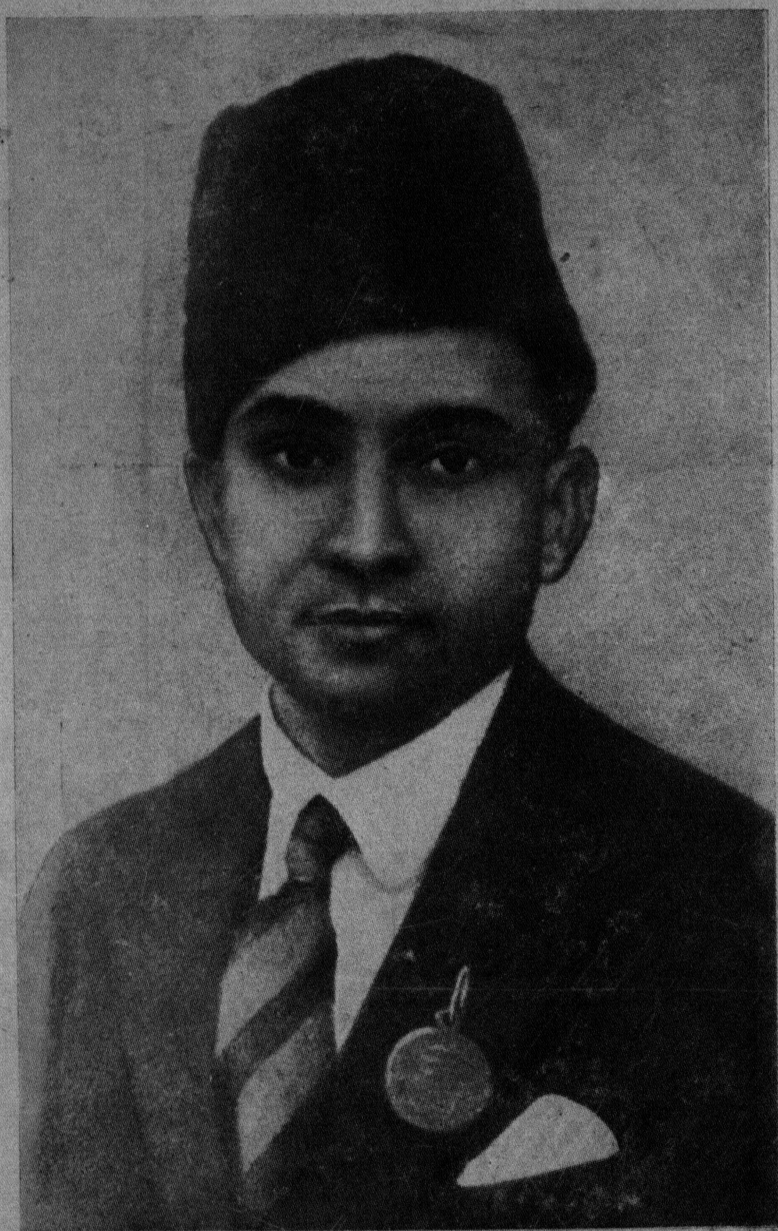
মৌজুদ্দিন খাঁ

বীণ্‌কার ও বখ্‌শিষ্‌

বন্দে আলী খাঁ

ইন্দোর দরবারের সে এক আশ্চর্য সংবাদ। তেমন বখ্‌শিষের কথ কোন দরবারে মজলিসে শোনা যায়নি। সেদিন আসরের প্রথমে কেউ ভাবতে পেরেছিলেন যে শেষ হবে এমনভাবে ?

মহারাজা শিবাজী রাও হোল্‌কার ? না। তাঁর কাছে কল্পনার অতীত ছিল এমন পরিণতি।

চুন্না বাঈ ? তিনিও নিশ্চয় ভাবতে পারেননি।

বন্দে আলীর মনে ছিল কি ? কে জানে।

অথচ মহারাজা কত দিন থেকে কত বার এনেছেন বন্দে আলীকে। বীণা বাজিয়ে খাঁ সাহেব দরবার মাত করে দিয়েছেন। মোটা মুজরো পেয়েছেন। বখ্‌শিষও দিয়েছেন শিবাজী রাও। তবু তো বন্দে আলী দরবারের নিযুক্ত বীণ্‌কার।

আর ইন্দোরেই গল্প-কথার মতন আসর হয়ে গেল !

সেবার কিছুদিন বাইরে ছিলেন বন্দে আলী। ফিরে এসে মহারাজাকে সেলাম করলেন।

তখন শিবাজী রাও একদিন খাস দরবার বসালেন খাঁ সাহেবের জন্যে। সেদিন শুধু তিনি বাজাবেন। শ্রোতাদের মধ্যে হোলকরের সঙ্গে থাকবেন তাঁর প্রিয় ক'জন সভাসদ। আর চুন্না বাঈও। দরবারের নর্তকী গায়িকা চুন্না বাঈ। কিন্তু সেদিন বাঈজীর নাচ গান হবে না। তিনিও শুনবেন বন্দে আলীর বীণা।

ইন্দোর মহারাজার সবচেয়ে প্রিয় দরবারী কলাকার বন্দে আলী। কি মিঠে তাঁর আঙুলের টিপ্‌। কি মধুর তাঁর বীণার

ঝঙ্কার। যন্ত্রের সুরে তিনি যেন বশ করে রেখেছেন শিবাজী রাও হোলকরকে। মহারাজা তাঁকে সঙ্গীতগুরুর মতন মান্য করে থাকেন।

সেকালের দিকপাল বীণ্‌কার বন্দে আলী খাঁ। উনিশ শতকের শেষ কুড়ি-পঁচিশ বছরে আর কজন তাঁর সমকক্ষ ছিলেন এ যন্ত্রে? কাশীর সাদিক আলী খাঁ কিংবা কাসিম আলী খাঁ। এই দুই সেনীয়া বীণা-গুণী ভিন্ন তাঁর চেয়ে নামী তখন আর কেউ নেই।

আসরে দরবারে কি নাম-ডাক সে যুগে বন্দে আলীর! আর তেমনি মুজরো।

ইন্দোর রাজ্যেই তিনি বেশিদিন থেকেছেন বটে। শিবাজী রাও তাঁকে দাক্ষিণ্যও করেছেন সবার চেয়ে বেশি। কিন্তু তিনি অনেক জায়গায় ঘুরেছেন, বাজিয়েছেন। নানা দরবারে, আসরে। হায়দরাবাদ পুনা গোয়ালিয়র দাতিয়া বোম্বাই কাশী এমন কি নেপালের রাণা দরবার পর্যন্ত দেখেছে তাঁর গুণপনা।

হাত ভরে তাঁর রোজগার। আর আসরে আসরে নাম যশ খাতির।

তবে খাঁ সাহেবের মেজাজ বড় খামখেয়ালী। আর চঞ্চল স্বভাবও। এক জায়গায় বেশিদিন তিষ্ঠতে পারেন না। কদিন হলেই—আরে চলো চলো। তল্পি গুটিয়ে নিতে বলেন শিষ্যদের।

ব্যতিক্রম শুধু হোলকর রাজ্যে।

যেমন আশ্চর্য শিল্পী, তেমনি বিচিত্র প্রকৃতি। যেন বিপরীতের সমাবেশ। একদিকে তাঁর দস্তুরমত ভোগসুখের লালচ। আবার অন্তরে কোথায় আছে এক মুসাফির। সে কেবল ভার হালকা করতে চায়। যত মুজরোর বহর, তত বে-হিসাবী দেমাক। ভর্তি থলিয়া ফাঁকা করে দিতে কতক্ষণ! হাতে রেস্ত থাকলেই আমীরী চাল ছাড়া বরদাস্ত হয় না। তখন একেবারে দিল্‌দরিয়া। খাইখিলাই পান-ভোজন, এমন কি দান খয়রাতও। তারপর আবার সেই ফকিরের

হাল। তাঁর মনোবীণায় সুরৈশ্বর্যের অন্তরালে কোথায় লুকিয়ে থাকে এক-স্বরা একতারাটি!

মধ্যবয়স থেকেই বন্দে আলী শিষ্যের দলে ঘেরা। অনেক শিষ্য-সেবক তাঁর। তারাই তাঁর তদ্‌বির-তদারক করে। নজর রাখে ওস্তাদজীর মেজাজ-মর্জির দিকে। তাঁর নিজের কোন উদ্‌যোগই নেই। শিষ্য-সেবকরাই নিয়ে যায় দরবারে। এক আসর থেকে অন্য আসরে। তিনি জানেন শুধু আসর মাত করতে। সুরের ঝঙ্কারে মায়ালোক সৃজন করে দিতে। তারপর মুজরোর তোড়া তেমন হলেই নবাবী শুরু। আবার হালকা হয়ে গেলেও নির্বিকার। কোন আফসোস নেই। বিনা মুজরোয় যে আসর করবেন না, তাও নয়। কদরদান মহ্‌ফিলে নিজেরগরজেই বাজনা শোনাবেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

অতি চিত্তাকর্ষক তাঁর বাজনার রীতি। আর 'সুরিলি' হাত। আঙুলের টিপে টিপে ঝরে পড়ে সুরের ধারা। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। যন্ত্রটির ওপর তাঁর অসামান্য অধিকার। সব পর্দার সব স্বরে, এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে অবলীলায় তাঁর দুটি আঙুলের চলাফেরা। সুরের সঞ্চরণে, সুরের নির্ঝরে।

বন্দে আলীর হাতে যন্ত্র যেন কথা কয়। তাঁকে লঘু চিত্তে মজা করতেও দেখা যায় বাজনা নিয়ে। ঘরোয়া পরিবেশে কত ধ্বনি বার করেন খেলাচ্ছলে। যে-কোন শব্দ নিজের যন্ত্রে নকল করে দেখিয়ে দেন। কারুর কথার সঙ্গে মেলান বীণার স্বর।

ধ্রুপদ অঙ্গের বাজই তিনি শুনিয়ে থাকেন। ধ্রুপদ গানও করেন ইচ্ছা হলে, নিজেই বীণা বাজিয়ে। কিন্তু একেকদিনের মেজাজে ঠুংরির কাজও এই অভিজাত যন্ত্রে করেছেন, এমন 'অপযশ'ও তাঁর আছে। তবে তা ব্যতিক্রম। স্বতঃস্ফূর্ত মতিভ্রম যেন। আসরে দরবারে বন্দে আলীর প্রকৃত শিল্পী-রূপ—রাগ রূপায়ণে ধ্রুপদী নিষ্ঠা, সমাহিতচিত্ত। আর প্রায়শ উচ্চমানের বাজনা সর্ব আসরে। নেপাল দরবারে মোহর লাভেও যেমন, কোন খাতিরের আসরেও তেমনি।

তাঁর বাজনার স্মৃতি সবচেয়ে জীবন্ত আছে ইন্দোরে। যেমন সেদিনকার আসরটি হয়েছিল। সেই ১৮৮০-৮২ কিংবা তার কাছাকাছি কোন বছরে।

সে আসর ইন্দোর শহরের ত্রিতল বিশাল লালবাগ প্রাসাদে নয়। ও তো নতুন রাজভবন। আরো পুরনো আমলের আটতলা প্রাসাদ ইন্দোরের। সেখানেই বিখ্যাত দরবার।

রাণী অহল্যা বাঈয়ের (মৃত্যু : ১৭৯৬) সময়েও ছিল সেই আটতল রাজপ্রাসাদ। আর তার দরবার। কিন্তু তখন কি গৌরব বৈভব তার! রানী অহল্যার শ্বশুরের সময়েই তো হোলকর রাজবংশের পত্তন হয়েছিল। তবে এ স্থানটি আরো অনেক কালের পুরনো। সেই প্রাচীন নাম ইন্দ্রেশ্বর। তাই থেকে ইন্দোর।

মলহর রাও হোলকর (১৬৯৩—১৭৬৬) এই নতুন কালের ইন্দোর রাজ্যের প্রথম নৃপতি। হোল্ নামে গ্রামে মলহর আগে বাস করতেন। সেজন্যে তিনি হলেন (মারাঠী ভাষায়) হোল্-কর। হোলের সামান্য এক কৃষিজীবীর পুত্র মলহর। কিন্তু যেমন তাঁর সাহস, বীরত্ব, তেমনি বিচক্ষণ বুদ্ধি।

শক্তিমান মারাঠা সাম্রাজ্যের পেশোয়া বা প্রধান মন্ত্রী তখন প্রথম বাজী রাও। মলহর রাও সেই পেশোয়ার এক সেনাপতির পদ পেলেন, অতি তরুণ বয়সেই, বীরত্বের পরিচয় দিয়ে। তারপর ১৭২৮ সালে বাজী রাও জায়গীর দিলেন মলহর রাও হোলকরকে। তার কয়েক বছরের মধ্যেই মলহর মালবের সর্বাধ্যক্ষ হলেন। তারপর তাঁকে ইন্দোর প্রদেশের জায়গীরদার করলেন বাজী রাও পেশোয়া।

তখন থেকেই ইন্দোর রাজ্যের পত্তন হল মলহর রাও হোল্‌করের হাতে। আর তার একালের রাজধানী ইন্দোর। মলহর রাওয়েরই পুত্রবধূ পুণ্যশ্লোকা অহল্যা বাঈ (জন্ম : ১৭২৫-২৬)। ১৮ বছর বয়সে বিধবা রানী অহল্যা সন্ন্যাসব্রত নিয়ে অতি যোগ্যতায় রাজকার্য করে

যান। ধর্মকর্মে প্রজা-পালনে ন্যায় শাসনে আর বীরত্বেও প্রাতঃস্মরণীয়া রানী তিনি।

অহল্যা বাঈয়ের মৃত্যুর প্রায় ৮০ বছর পরে ইন্দোর-রাজ তখন শিবাজী রাও হোল্‌কর। কিন্তু মলহর রাও কিংবা রানী অহল্যার মাহাত্ম্যের তুলনায় এ রাজ্য এখন নামমাত্র। বাহ্যরূপ যেন। কারণ শিবাজী রাও হোল্‌কর ইংরেজের খেতাবী মহারাজা। প্রকৃত কর্তৃত্ব বা স্বাধীনতা-হারা একটি 'দেশীয় রাজ্য' মাত্র।

তবে আগেকার ঠাট অনেকখানি আছে। পুরনো রাজ্যপাটের কাঠামো। আর সে আমলের আটতল রাজপ্রাসাদ। তার সেকালের দরবারে এখন কেবল সঙ্গীতের দরবার। অতিশয় সঙ্গীতপ্রেমী শিবাজী রাও। তাঁর কল্যাণে ইন্দোর দরবার হয়েছে উত্তর ভারতের এক শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতসভা। নানা গুণীজনের আশ্রয় আর সম্মানের আসন এখানে। সদাশয় মহারাজা তাঁদের গুণগ্রাহী পোষক। আর তাঁর দরবারী গুণীমণ্ডলীর মধ্যমণি বন্দে আলী খাঁ।

সেখানে তাঁর সেই ১৮৮০-৮১ সালের আসরটির কথা। বন্দে আলীর তখন পরিণত বয়স। শিল্পী-সত্তার চূড়ান্ত বিকশিত পর্ব। বহুদিনের সাধনায় অর্জিত বাদন-নৈপুণ্য এবং প্রসিদ্ধি প্রতিপত্তি।

সেদিন সন্ধ্যার পর খাঁ সাহেব আসরে এলেন। আজ বিশেষ দরবার, তাই শিষ্য-সেবকরা অনুপস্থিত।

খাস দরবারে আছেন মহারাজা। অনতিদূরে তাঁর ক'জন বিশিষ্ট পাত্রমিত্র। আর এক পাশে দরবারের বাঈজী চুন্না বাঈ। গুণ বিচারের আগে বাঈসাহেবা দর্শনধারিণীও। মঞ্জরিত যৌবন-নিকুঞ্জ।

শিবাজী রাও বন্দে আলীকে বাজনা আরম্ভ করতে বললেন। প্রথম প্রহর রাত্রি। সুসজ্জিত বিরাট দরবার-কক্ষ। রশ্মিঝরা চিক্কণ ঝাড়লণ্ঠন। তার আলো বিচ্ছুরিত, প্রতিফলিত হয়েছে হোল্‌করের মুক্তামালায়, উষ্ণীষের মোতিতে, অঙ্গুরীয়কের হীরকখণ্ডে। চুন্না-

বাঈয়ের মণিহারে। দেওয়ালের বর্ণাঢ্য চিত্রাবলীতে। সুকোমল সুচিত্রিত গালিচায়। বন্দে আলীর সুদৃশ্য যন্ত্রটিতে।

সুগন্ধী নির্যাসে আমোদিত আবহ। সুখস্পর্শ আসনে বসে খাঁ সাহেব বীণা কোলে তুলে নিলেন। মহারাজকে নতি জানিয়ে, সুর মেলাতে আরম্ভ করলেন অচল ঠাটের চারটি তারে।

বন্দে আলীর বীণার সুর বাঁধার বিশেষ প্রকরণ আছে। তা বহু সময়সাপেক্ষ।

এই অবকাশে পরিক্রমা করে নেওয়া যায় তাঁর পূর্ব-বৃত্তান্ত ঃ

কিরানার সন্তান বন্দে আলী খাঁ। যুক্তপ্রদেশের সাহারাণপুর অঞ্চলের একটি সামান্য গ্রাম কিরানা। কিন্তু সঙ্গীতজগতে স্থান তার অসামান্য। কারণ গ্রামখানি কলাবৎ অধ্যুষিত। বহু সংখ্যায় বিভিন্ন রীতির গায়ক-বাদকরা কিরানা থেকে সঙ্গীতজগতে আত্মপ্রকাশ করেছেন। বোধহয় শাহী আমল থেকে এখানে তাঁদের বসবাসের সূত্রপাত।

দিল্লীর অনতিদূরে কিরানার অবস্থান। দরবারী গুণী হয়ে তাঁরা জমি জায়গীর পেয়েছেন শাহী ফর্মানে। বংশানুক্রমে এখানে স্থায়ী হয়েছেন। আর কালক্রমে গড়ে উঠেছে নানা সঙ্গীত-সেবক পরিবার। উত্তর ভারতের সাঙ্গীতিক মানচিত্রে কিরানার স্থান চিহ্নিত হয়ে গেছে। পৃথক পদ্ধতির গায়নশিল্পী, বিভিন্ন যন্ত্রের কলাবৎদের জন্ম দিয়েছে কিরানা। ধ্রুপদী খেয়ালীয়া এবং টপ্পা-ঠুংরির গায়ক। সারঙ্গী বীণ্‌কার তবলিয়া। তাঁদের পরস্পর আত্মীয়তা তথা পারিবারিক সম্পর্ক থাকতে পারে। কিন্তু সাঙ্গীতিক-পরম্পরা কিংবা আদান-প্রদান সর্বথা নয়।

একই বংশে বা পরিবারে দেখা দিয়েছেন ভিন্ন রীতির গীতশিল্পী, স্বতন্ত্র যন্ত্রী। তাই এত বড় সঙ্গীতকেন্দ্র হয়েও এখানে কোন বড় ঘরানার প্রতিষ্ঠা হয়নি। কিন্তু হতে পারত, কোন বিশিষ্ট রীতির কণ্ঠ-সঙ্গীত বা একটি যন্ত্রসঙ্গীতের পীঠস্থান হলে। কিরানা ঘরানা বলে যে

খেয়াল পদ্ধতি প্রসিদ্ধ হয়, তা আবদুল করিমের দৃষ্টান্তে এবং অনেক পরের কথা। বন্দে আলীর পরবর্তী প্রজন্মে। তাঁর শেষ বয়সে আবদুল করিমের সূচনাপর্ব। আর কিরানায় সঙ্গীতচর্চার সূত্রপাত বন্দে আলীর অন্তত আট দশ পুরুষ, কিংবা তারও আগে থেকে।

সুতরাং বলা যায় কিরানার ঐতিহ্য তার সামগ্রিক চর্চায়। কোন একটি বিশিষ্ট ধারায় নয়। আবদুল করিমের খেয়ালের চাল যেমন তাঁর নিজস্ব প্রতিভার দান, তেমনি বন্দে আলীর বীণাবাদনও। এই কেন্দ্রের ঐতিহ্যমণ্ডিত সাঙ্গীতিক পরিবেশে দেখা দিয়েছে তাঁদের মতন বিভিন্ন, বিচিত্র প্রতিভা।

সেই কিরানায় আনুমানিক ১৮৩০ সালে বন্দে আলীর জন্ম। তাঁর পিতাও বীণাবাদক ছিলেন, শোনা যায়। তবে বংশানুক্রমে ছিল না তাঁদের বীণার চর্চা। তাছাড়া, পিতাকে অল্প বয়সেই হারান বন্দে আলী। তাঁর কাছে শিক্ষার সুযোগ তিনি পাননি। বন্দে আলী মাতুলের হাতে তৈয়ারী হন। বিখ্যাত ধ্রুপদী বহরম খাঁ জয়পুরে ডাগর পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বন্দে আলীর মাতুল ও শিক্ষাদাতা। পিতৃহীন ভাগিনাকে তিনি কাছে রেখে তালিম দেন।

বীণার বাজ তো ধ্রুপদ অঙ্গের। মাতুলের সেই ধ্রুপদ-বিদ্যায় গঠিত হলেন বন্দে আলী। ধ্রুপদ অঙ্গ বীণায় ওঠালেন। বহরম খাঁর তালিম কণ্ঠে নিতেন তিনি। ধ্রুপদ গানের চর্চাও মাতুলের সাক্ষাৎ দৃষ্টান্তে করতেন। গাইতেন ধ্রুপদ। ফলে গায়কও হয়েছিলেন। পরে আসরেও ধ্রুপদ গান গাইতেন বন্দে আলী। তবে আপন বীণা বাজনারই সহযোগে। তার উদাহরণ পরে দেওয়া হবে।

মাতুলের সঙ্গীত-সঙ্গ বন্দে আলী ছেলেবেলা থেকেই পান। কিরানা থেকে দিল্লী। তারপর সেখান থেকে ৫৭-র মহাবিদ্রোহের ঘনঘটায় চলে যান জয়পুরে, বহরম খাঁরই সঙ্গে। জয়পুরের মহারাজা বহরম খাঁকে দরবারে রেখে দিলেন। বন্দে আলী তখনো মামার

কাছে। এমনিভাবে প্রতিভা, সাধনা ও শিক্ষায় যৌবনেই তিনি গুণী কলাকার হলেন।

কোন কোন মতে বন্দে আলীর ওস্তাদ ছিলেন নির্মল শাহ্। তানসেনের কন্যাবংশীয় মহা-গুণী তন্ত্রকার। বিখ্যাত বীণ্‌কার ওমরাও খাঁর শ্বশুর, কাকা ও ওস্তাদ নির্মল শাহ্। কিন্তু একথায় গভীর সন্দেহ জাগে। কারণ, বালক বয়স থেকে বন্দে আলীর সমস্ত শিক্ষা পর্ব মাতুলের কাছেই উদ্‌যাপিত। বীণাবাদক নির্মল শাহের সঙ্গে বন্দে আলীর অন্তত দুই প্রজন্মের কাল-ব্যবধান। নির্মল শাহের সঙ্গে তাঁর কখনো সাক্ষাৎ ঘটার সম্ভাবনাও অল্প। তাছাড়া, সেনীয়া নির্মল শাহ্ অন্য বংশীয়। অনাত্মীয়, পেশাদার পরিবারের বন্দে আলীকে ঘরানা সম্পদ দেবেন কেন! সেকালের রেওয়াজে তা অস্বাভাবিক। সঙ্গীতজগতের কোন শ্রুতিস্মৃতিতেই নির্মল শাহের সঙ্গে বন্দে আলীর সংশ্রব নেই। বহরম খাঁর সঙ্গীতজীবনের সঙ্গেই যুক্ত আছেন বন্দে আলী। মাতুলের কাছে তৈয়ারী হয়ে তিনি চলে যান গোয়ালিয়রে।

বরং গোয়ালিয়রে বন্দে আলীর কিছু শিক্ষার কথা পাওয়া যায়। তিনি গোয়ালিয়রে আসেন যুবক বয়সে। হদ্দ্, হস্‌সু খাঁ দু ভাই তখন সেখানে খেয়ালের দুর্ধর্ষ কলাবৎ। তাঁরা দুজনেই বীণ্‌কার, সুকণ্ঠ তরুণ বন্দে আলীর গুণমুগ্ধ হলেন। ফলে তাঁকে দামাদ অর্থাৎ জামাই করে নিলেন হদ্দু খাঁ। আর হস্‌সু খাঁর কথায় তাঁর প্রিয় শিষ্য দেবজী বুয়া কিছুদিন বন্দে আলীকে ধ্রুপদ আর টপ্পা শেখালেন। হস্‌সু খাঁর এক যোগ্য বংশধর গুলে ইমামও তখন দেবজীর তালিম পান, বন্দে আলীর সঙ্গে।

গোয়ালিয়রের পর অন্য কোথাও বন্দে আলীর শেখার কথা জানা যায়নি। সেই বিবাহিত জীবন থেকেই তাঁর পেশাদার জীবনেরও আরম্ভ। নানা আসরে দরবারে মুজরো হতে থাকে। বন্দে আলীর রীতিমত নাম যশ হয় গুণী বীণ্‌কার বলে। হায়দরাবাদ থেকে

কাশী। আরো ওদিকে নেপাল দরবার পর্যন্ত তিনি মুজরো করে আসেন।

হদ্দু খাঁর জামাই বন্দে আলীর দুই কন্যা। দুজনেরই তিনি বিবাহ দেন মাতুল বংশে। বহরমের সহোদর অর্থাৎ বন্দে আলীর অপর মাতুল হায়দর খাঁ। বন্দে আলীর দুই জামাতা হলেন সেই হায়দরের দুই পৌত্র জাকরুদ্দিন ও আল্লাবন্দে। মহম্মদ জানের পুত্র তাঁরা। সেই দুই ভাইও জয়পুর-নিবাসী। আর পরের যুগে বন্দে আলীর এই দুই জামাই ধুরন্ধর ধ্রুপদী বলে নাম করেছিলেন।

একেই তো উড়ু উড়ু স্বভাব বন্দে আলীর। পারিবারিক কর্তব্য, দায়িত্ব চুকে যায় দুই মেয়ের সাদী দিয়ে। খামখেয়ালী স্বভাবও তাঁর বয়সের সঙ্গে বাড়তে থাকে। বেশিদিন ভাল লাগে না একত্র। আর চরিত্রের সেই বৈপরীত্য। সুরের ধ্যানী, জাগতিক ব্যাপারে উদাসীন। আবার বিলাসভোগেও নেই অরুচি। একই সত্তায় যাযাবর ও সুখ-নীড়ের কপোত।

তবে সেসব তাঁর ব্যক্তিজীবনের কথা। শিল্পী-সত্তার পরিচায়ক নয়।

বন্দে আলীর নাম শিল্পী এবং গুরু দুই গুণেই। বীণাবাদনে তিনি একটি ধারার প্রবর্তক। তাঁর যোগ্য শিষ্যরা পরের যুগে তার ধারক-বাহক হন। শিষ্যদের জন্যেও চিহ্নিত থাকে ওস্তাদের নাম। তাঁর সেই পরিচয়ও দেবার মতন। বলা চলে, ইন্দোর বীণ্‌কার ঘরানার আদিপুরুষ বন্দে আলী।

নানা সময় মিলে ইন্দোরেই তিনি বেশি কাটান। তাই তাঁর শিষ্যমণ্ডলীও গড়ে ওঠে এখানে। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনজন। গুরুর বিদ্যার উপযুক্ত আধার। বিশেষ মুরাদ খাঁ। অন্য দুজন হলেন বুন্দু খাঁ ও রজব আলী। তাঁরা তিনজনেই বন্দে আলীর তালিম পান বীণায় এবং ইন্দোরে থেকে। তাঁদের মধ্যে মুরাদ ও বুন্দু খাঁর সঙ্গীত-জীবনও বেশির ভাগ ইন্দোরেই কেটে যায়। মুরাদ খাঁ ছিলেন

একান্তভাবেই বীণ্‌কার। আর বুন্দু খাঁ সেই সঙ্গে সেতারও বাজাতেন। বন্দে আলীর তৃতীয় প্রসিদ্ধ শিষ্য রজব আলী একাধারে বীণ্‌কার ও খেয়ালীয়া। খেয়াল গানের তালিম রজব আলী তাঁর পিতা মুগলু খাঁর কাছে পান। তাঁর বীণাযন্ত্রে তালিম হয় বন্দে আলীর কাছে।

বন্দে আলীর প্রধান শিষ্য মুরাদ খাঁ। তাঁর সবচেয়ে কৃতী উত্তরসাধক। মুরাদ খাঁ এই ধারার বীণাবাদনে যোগ্য শিষ্য গড়েছিলেন লতিফ, মজিদ দু ভাইকে।

বন্দে আলীর নানা সাময়িক শিষ্যের মধ্যে একজন হলেন এমদাদ খাঁ, কলকাতার সুপরিচিত সেতার-সুরবাহার গুণী। ইন্দোরে তিনি কিছুদিন বন্দে আলীর সঙ্গ করেছিলেন।

তাঁর কাছে আরো অনেকে শেখেন অনিয়মিতভাবে। সেই সব শিষ্যরা কৃতী কিংবা খ্যাতিমান হননি। কিন্তু ওস্তাদের সঙ্গে থাকতেন তাঁরা। খিদ্‌মদগারী:করতেন আর তাইতেই সন্তুষ্ট।

একজন মাত্র মহিলা বন্দে আলীর তালিম পেয়েছিলেন। কিন্তু সে শিষ্যার কথা এখন নয়।

বন্দে আলীর পূর্ব-কথা এই পর্যন্ত। এবার আরম্ভ করা চলে ইন্দোর দরবারের সেই প্রসঙ্গ। তবে তার ক'বছর আগেকার বন্দে আলীর বিষয়ে একটি বিবরণ পাওয়া যায়। সেটি উদ্ধৃত করে দেবার মতন। কারণ ওস্তাদজীর এক অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে এখানে। আর তাঁর আসরের ধরণধারণও।

বিবৃতিটি দিয়েছেন বারাণসীর ধ্রুপদী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। কিশোর বয়সে তিনি কাশীরই দুটি আসরে বন্দে আলীর বীণা শুনেছিলেন। প্রথমটি ১৮৭৪-৭৫ সালে। আর একটি 'তারই কিছুদিন পরে'।

সেই আসর দুটি হয় যথাক্রমে (কাশীর) দীঘাপতিয়া ভবনে ও মদনপুরার রায়বাহাদুর গিরীশচন্দ্র লাহিড়ীর গৃহে। প্রথমটি হল, চৌষট্টি

যোগিনীর ঘাটে, গঙ্গার ধারেই। যে বাড়িতে বর্তমানে সীতারামদাস ওঙ্কারনাথের বারাণসী আশ্রম। বন্দে আলী সেই দুটি আসরেই অংশ নেন। অন্য যে গুণীরা একটি বা দুটি আসরে যোগ দেন তাঁদের মধ্যে বীণ্‌কার সাদেক আলী খাঁ, ধ্রুপদী গোপালপ্রসাদ মিশ্র, তাঁর শিষ্য (কলকাতার) ধ্রুপদ-গায়ক গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, সেতারী আহম্মদ খাঁ, ধ্রুপদী রামদাস গোস্বামী, বীণ্‌কার মহেশচন্দ্র সরকার, সেতারী গণেশীলাল বাজপেয়ী, পাখোয়াজী কাশীনাথ মিশ্র, পাখোয়াজী গণেশ সিংহের নাম উল্লেখ্য।

হরিনারায়ণের বিবরণী থেকে বন্দে আলী খাঁর বীণার রঞ্জিনী শক্তি, তাঁর যন্ত্র বাঁধার নিজস্ব রীতি, তখনকার সঙ্গীতসমাজে তাঁর সম্মান ও প্রভাব, বীণার সঙ্গে গান গাওয়া, তাঁর সরস সিক্ত চিত্ত, 'কারণ' করা ইত্যাদির চাক্ষুষ পরিচয় পাওয়া যায়। সেজন্যে হরিনারায়ণের বিবৃতির অংশ উদ্ধৃত করে দেওয়া হল, বন্দে আলীর যন্ত্র বাঁধবার বর্ণনা থেকে :—

'তিনি এক একটি তার সুরে মিলাইয়া সেই তার ধরিয়া বীণা যন্ত্রটি তুলিয়া ধরিতেন ; যদি তারটি নরম (বেসুরা) না হইত, তবে সে তার রাখিতেন, নচেৎ অন্য তার চড়াইতেন। এই প্রথম প্রকরণ। সমস্ত তার এইভাবে পরীক্ষা করিয়া চড়াইতেন, পরে একটি ঝঙ্কার দিতেন। সব তারের সুর মিলিত হইয়া একটি সুর (ধ্বনি) যতক্ষণ পর্যন্ত না বাহির হইত, ততক্ষণ তিনি সুর মিলাইতেন। ইহা দ্বিতীয় প্রকরণ।...বন্দে আলী খাঁ সরস্বতী স্তব ও প্রণামান্তে বীণা ঘাড়ে করিলেন এবং চারি প্রকার রীতি অনুসারে আলাপ করিতে লাগিলেন। পরে তারপরণ্‌ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন এবং গণেশ সিংহ মৃদঙ্গে সঙ্গত করিতে লাগিলেন।...গোপালবাবু 'চরণ মেরে মাথে' কল্যাণের ধ্রুপদ গান করিয়াছিলেন। রামদাসবাবু 'গোরা গণেশ' কল্যাণের ধ্রুপদ গান করিয়াছিলেন। গোপালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই কি কেদাবতী (প্রাচীনকালের) চিত্র?' মহেশবাবু

তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, ‘কল্যাণের সনন্দী ধ্রুপদ দুই চারিটিই আছে।’ বন্দে আলী খাঁ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ‘কল্যাণকা দো চারহি ধ্রুপদ সনন্দী আউর সব রামানন্দী।’ খাঁ সাহেব একটু কারণ করিতেন। তিনি হাসিতে হাসিতে ‘হাদি এ আল্লাহ্’ গান করিতে লাগিলেন এবং বীণা বাজাইতে লাগিলেন। আমি এই প্রথম বীণার সঙ্গে গান শুনিলাম এবং পরেও আর একবার কাসিম আলী খাঁর গান বীণার সহিত শুনিয়াছি। তৃতীয়বার শুনি নাই। ৫০ বৎসরে কি ভীষণ পরিবর্তন।’···

‘কিছুদিন পরে পুনরায় কাশীধামের মদনপুরায় স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী রায়-বাহাদুর মহাশয়ের বাটীতে তন্ত্রকারগণের সম্মেলন হইয়াছিল।···বাজপেয়ীজী সেতার বাজাইলেন, কিন্তু বীণার সমস্ত কার্য সেতারে দেখাইলেন। এই নিমিত্তই বন্দে আলী খাঁ অত্যন্ত খুশী হইয়াছিলেন এবং বাজনা শেষ হইলে বাজপেয়ীজীকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।···পরদিন বন্দে আলী খাঁর বীণা হইয়াছিল। খাঁ সাহেবের বীণাবাদনের কথা কি বলিব! সে ঝঙ্কার যিনি শুনিয়াছেন, তিনি ধন্য; এক্ষণে আর সেরূপ বীণাবাদন শুনা যায় না।···এদিন ঝাঁপতাল সুর-ফাঁকতাল চৌতালের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া তারপরণ বাজানো হইয়াছিল। গণেশ সিংজী অবলীলাক্রমে সঙ্গত করিয়া খাঁ সাহেবকে সন্তুষ্ট করিলেন। খাঁ সাহেবও তাঁহার প্রশংসাবাদ করিলেন।’ (সঙ্গীতে পরিবর্তন, পৃষ্ঠা ৩-৮)।

সেদিন ইন্দোর দরবারেও এমনি বাজাতে লাগলেন বন্দে আলী খাঁ। তাঁর তখন মেজাজ শরীফ। কাশীর ওই আসরের মতন ‘কারণ’-করার কারণেও হতে পারে। এবং/বা রূপদৃষ্টির উপলক্ষ্যেও হয়তো।

সে যা-ই হোক, তাঁর বীণার সুরে জমজমাট হয়ে উঠল আসর। চিত্তহারী বাজনা। শিবাজী রাও বার বার সাধুবাদ করতে লাগলেন। আর উদ্বুদ্ধ হয়ে বাজিয়ে চললেন বন্দে আলী। মীড় ঘসিৎ ইত্যাদির

ওস্তাদ তিনি। তেমনি নানা অলঙ্কারের পারিপাট্যে রাগকে প্রাণবন্ত করে তুললেন। অচল ঠাটের পর্দায় পর্দায়, চলন্ত আঙুলের টিপে টিপে সুরের স্ফুলিঙ্গ।

সম্মোহিত হলেন ইন্দোর-পতি।

বাজনা শেষ হতে শিল্পীকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বললেন, 'কি অপূর্ব বীণা আজ শোনালেন খাঁ সাব। এখন আপনি কি বখ্‌শিশ চান, বলুন। যা চাইবেন, আজ আপনাকে তা-ই দেব।'

চুন্না বাঈয়ের দিকে এক নজর চেয়ে নিলেন বন্দে আলী খাঁ। তারপর অকপটেই জানালেন, 'এই বাঈজীকে তাহলে বখ্‌শিশ দিন, মহারাজ।'

অভাবিত আবেদন! অপ্রস্তুত শিবাজী রাও। ক্ষণকাল তিনি স্তম্ভিত হয়ে রইলেন।

তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'অন্য কেউ একথা উচ্চারণ করলে তার গর্দান যেত। কিন্তু আপনি ওস্তাদজী। আপনার কথা রাখব।'

চুন্না বাঈয়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'খাঁ সাহেবের কথায় রাজি?'

সুর্মাটানা আঁখিপক্ষ্ম নত করলেন বাঈজী। তারপর ঈষৎ শির সঞ্চালনে সম্মতি জানালেন। তিনিও সুর-বিদ্ধা হয়েছিলেন।···

সে রাত্রে দরবার থেকে জীবন্ত বখ্‌শিশটি নিয়ে ঘরে ফিরলেন বন্দে আলী। আর অচিরেই চুন্না বাঈকে নিকা করে নিলেন।

বাঈজী হলেন বিবি। এবং শিষ্যাও। আগে থেকেই তো গায়িকা ছিলেন। এবার নতুন করে তালিম নিতে লাগলেন ঘরের এত বড় ওস্তাদের কাছে। বন্দে আলীর একমাত্র শিষ্যা চুন্না বাঈ।

কিছুকাল পরে বন্দে আলী ইন্দোর ত্যাগ করলেন। একা নয় অবশ্য। নতুন বিবিকে নিয়ে বোম্বাই চলে গেলেন।

শোনা যায়, সুখী হয়েছিল তাঁদের বিবাহিত জীবন। সম্মিলিত

সঙ্গীতচর্চায় নাকি রমণীয় ছিল তাঁদের দাম্পত্যচর্যা। আর চুন্না বাঈ এক শ্রেষ্ঠা গায়িকা বলে নাম করেছিলেন।

এবারও একটি কন্যাসন্তান পান বন্দে আলী। তবে সে ধারার সঙ্গীতচর্চা থাকেনি।

বোম্বাইতে বেশ কিছুদিন বাস করে বন্দে আলীরা চলে যান পুনায়। সেই তাঁর শেষ বসতি। অন্য কোথাও আর যাওয়া হয়নি।

পুনাতেই বন্দে আলীর শেষ নিঃশ্বাস পড়েছিল। সেখানেই সমাধিস্থ স্তব্ধ হয়ে আছে, তাঁর বীণাধ্বনি! সে বোধ হয় ১৮৯৩ সালের কথা।

তারপর পুনায় তাঁর স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠান কয়েক বছর চলেছিল।

কিন্তু চুন্না বাঈ আবার ঘরণী হয়েছিলেন নতুন করে। আর একজনের জীবনসঙ্গিনী হয়ে। সে ব্যক্তির সঙ্গীতে কোন খ্যাতি বা পরিচিতি ছিল না। চুন্না বাঈও ছেড়ে দিয়েছিলেন নাচ গানের মুজরো।

বন্দে আলীর একটি বংশপরিচয় আগে দেওয়া হয়নি। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন জ্ঞান সিং, যাঁর থেকে এ বংশের সঙ্গীতচর্চার প্রসিদ্ধি। মোগল আমলের মাঝামাঝি সময়ে জ্ঞান সিং ছিলেন নামী ধ্রুপদী। কি কারণে তিনি মুসলমান হয়ে যান। তখন তাঁর নাম হয় সুরজ্ঞান খাঁ। পরের পুরুষ থেকে তাঁদের পুরোপুরি মুসলমানী নাম-পরিচয়। কিন্তু জ্ঞান সিং থেকে বন্দে আলী খাঁ সকলেই বংশের ধারায় থাকেন রাগসঙ্গীতের একান্ত সাধক।

দিল্লীর শেষ দরবারী

মুরাদ খাঁ

মুরাদ খাঁ নাকি এখনো বেঁচে আছেন! আর থাকেন এই দিল্লী শহরেই।

বাহাদুর শা জাফরের দরবারী ধ্রুপদী মুরাদ খাঁ।

কতদিন থেকে মুরাদ খাঁর নাম জানা, তাঁর কথা শোনা। এক-কালের কত বড় ধ্রুপদী। এখনো তিনি দিল্লীতে রয়েছেন। আর এতদূর থেকে এসে তাঁর দেখা পাওয়া যাবে না? সুযোগ হবে না তাঁর গান শোনার? এ যে আফসোসের কথা।

কিন্তু কোথায় তাঁর ঠিকানা? আগন্তুক যাকে জিজ্ঞেস করেন, কেউ বলতে পারে না।

পুরনো আমলের দিল্লী। কিন্তু তাঁর কাছে নতুন। এই প্রথম এ শহরে এসেছেন। কোন জানাশোনা লোক নেই। পথঘাটও অচেনা। মুরাদ খাঁর ঠিকানাও নিজে জানেন না।

একেকবার হতাশ বোধ করেন আগন্তুক। আবার আশায় আশায় খুঁজতে থাকেন।

পুরনো দিল্লীর একটা এলাকা। চৌকের কাছাকাছি। নোংরা সরু সরু রাস্তা। ছোটখাটো দোকানপসার। সেকেলে ছাঁদের নিচু নিচু বাড়ি ঘর। তারই মধ্যে কাউকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করছেন:

'মেহেরবানি করে মুরাদ খাঁর ঠিকানাটা…'

'কৌন মুরাদ খাঁ?'

'বাদশা বাহাদুর শার দরবারে ধ্রুপদ গাইতেন।'

'মালুম নেহি।'

ওই এক জবাব। কেউ জানে না। কি আশ্চর্য! এত বড় কালোয়াতের নাম শোনেনি এরা?

দরবারী মুরাদ খাঁ দূরের কথা, বাহাদুর শার নামই বা কজন মনে রেখেছে? সেই কবে, ৬০ বছরেরও আগে দিল্লী ছেড়ে গেছেন বাহাদুর শাহ্ জাফর। মহাবিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ার পর্ব তখন। বৃদ্ধ, অক্ষম, নামে-মাত্র বাদশাকেও ইংরেজরা বন্দী করে নিয়ে গেছে রেঙ্গুনে। সেখানেই চার-পাঁচ বছর পরে তিনি মাটি নিয়েছেন।

সেও কত বছর হয়ে গেল। কমবয়সীরা এসব খবর রাখে কে? কিছু বুড়ো মানুষ, রইস্ লোক হয়ত বাহাদুর শাহ্ বা তাঁর দরবারের কথা জানে।

শেষ মোগল বাদশা তিনি। তবে শুধু নামে। স্বাধীনতা, রাজ্য, রাজস্ব কিছুই ছিল না। শুধু দিল্লী কেল্লার চৌহদ্দির মধ্যে বৃটিশের বৃত্তিধারী জীবন। কিন্তু অন্তরের গুণে তাঁর দুর্দান্ত পূর্বপুরুষদের চেয়ে হয়ত বড় ছিলেন বাহাদুর শাহ্। কবি, গীত-রচয়িতা তিনি। 'জাফর' লেখনী নামে উৎকৃষ্ট কিছু কবিতা লেখেন। রচনা করেন কয়েকটি গান। আধ্যাত্মিক গভীরতার জন্যে যার কোন কোনটি বেঁচে থাকে। যেমন—তুমসে হাম্‌নে দিল্‌কো লাগায়া যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়। এক তুঝ্‌কো আপনা পায়া যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।'..

সুফী ভাবধারার মানুষ ছিলেন বাহাদুর শাহ্ জাফর। আর ছিল তাঁর—সেই দুরবস্থার মধ্যেও যতটুকু সম্ভব—সঙ্গীত দরবার। নামমাত্র হলেও বাদশা তো। তাই একটা শাহী কেতা ছিল। সেই লাল কেল্লার পুরনো দরবারে আসর বসত বাদশার জন্যে।

তিনি যেমন কবি, তেমনি কাব্যপ্রিয়। কবি-সঙ্গ পসন্দ করেন। তাঁর কাছে আসেন ঘালিব নামে সুপরিচিত মীর্জা আসাদ উল্লা খাঁ।

শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি ও গজল রচয়িতা। তাঁর নতুন রচনা গজল শের রসিক বোদ্ধা বাদশাকে শোনান।

কোনদিন জমে ওঠে গান-বাজনার মহ্‌ফিল। তলব যেমন হোক, ক'জন গুণী তো ছিলেন দরবারে। বিশেষ দুজন—মুরাদ খাঁ আর নাথ খাঁ। তাঁরা দরদী বাহাদুর শাহ্‌কে গান শোনাতে আসতেন। তাঁদের পেয়ার করতেন বাদশা।

সেই দরবারী কলাকার দুজনেই ধ্রুপদী। তবে নাথ খাঁ সেই সঙ্গে খেয়াল টপ্পা ইত্যাদিও গাইতেন। একবার কলকাতায় এসেছিলেন নাথ খাঁ। বউবাজারের সুপরিচিত সঙ্গীতাসর সরকার বাড়িতে গান শুনিয়েছিলেন।

তার বিবরণ দিয়েছেন (মনীষী শিক্ষাবিদ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র) মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় :—'···একদিন কলিকাতায় বহুবাজারে সরকারদের বাড়িতে খাঁ সাহেবের গান হইতেছিল, রামলাল দত্ত মহাশয় (সুপ্রসিদ্ধ গায়ক, কোন্নগরের নিকটবর্তী ভদ্রকালী নিবাসী 'দীন রাম' ভণিতা সংযুক্ত ভক্তি পরিসিক্ত গানসমূহ ইঁহার বিরচিত) তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি গান শুনিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। সঙ্গীত সমাপ্তির পর রামবাবু বলিলেন, 'খাঁ সাহেব, আপনি নায়ক।' খাঁ সাহেব বলিলেন, 'বাবুজী, আমি নায়কও নহি, গায়কও নহি। আমি কেবল ভজন করি।'···নাথ খাঁ বলিলেন, 'বাবুজী, আমি দিল্লীর ভূতপূর্ব সম্রাট বাহাদুর শার সভায় গায়ক ছিলাম। দিল্লীর রাজসভায় স্থান পাইতে হইলে দরবারীর তিনটি ভাষা জানা অত্যাবশ্যক ছিল—ফার্সী, সংস্কৃত ও উর্দু।'···বাহাদুর শার নাম করিয়াই খাঁ সাহেব কাঁদিয়া ফেলিলেন। দিল্লির শেষ মোগল সম্রাট··· ঘটনাচক্রে ইঁহাকে মিউটিনির সম্রাট হইয়া পড়িতে হইলে, ইনি সর্বপ্রথম ঘোষণা-পত্রে ভারতবর্ষে গোহত্যা ও শূকর মাংস বিক্রয় নিষেধ করেন।' (মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়—আমার দেখা লোক, পৃষ্ঠা ১৭০)।

নাথ খাঁর মতন বাহাদুর শাহের দরবারী মুরাদ খাঁ। তিনি দিল্লীতেই রয়ে যান সেই থেকে। আর বাহাদুর শাহের ১৮৬২ সালে রেঙ্গুনে জীবন সমাপ্তি ঘটে। তারপরও কেটে গেছে ২৭ বছর।

এখন ১৮৮৯ সালের কথা। কিন্তু মুরাদ খাঁ এখনো বেঁচে রয়েছেন দিল্লীতেই। দিল্লীর এই নতুন অতিথি এ কথা শুনেছেন। কিন্তু মুরাদ খাঁর সন্ধান পাচ্ছেন না অচেনা শহরে। কেউ জানে না তাঁর নাম বা আস্তানা। সেকালের বিখ্যাত গায়ক আপন অঞ্চলেই আজ বিস্মৃত।

কিন্তু আগন্তুক আশা ছাড়তে পারছেন না। সকলকেই জিজ্ঞাসা করছেন, 'আপনি কি জানেন মুরাদ খাঁর ঠিকানা? আগেকার আমলের দরবারী গায়ক মুরাদ খাঁ?'

খোঁজ করতে করতে তিনি চৌকে এসে পড়লেন। ওই প্রশ্নই করলেন এক বৃদ্ধ মুসলমানকে দেখে।

এবার আশাপূর্ণ উত্তর পেলেন, 'জী, হাঁ। মুরাদ খাঁর পাত্তা আমার জানা আছে।'

'তাহলে দয়া করে বলুন। আমি তাঁর কাছে যেতে চাই।'

বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'তা হলে আসুন আমার সঙ্গে।'

তারপর চলতে আরম্ভ করলেন একদিকে। তিনিও সেই অপরিচিত পথে অচেনা লোকটির সঙ্গী হলেন।

দিল্লীতে তিনি নবাগত। আর বাইরে কোথাও তিনি জানাতেন না আত্মপরিচয়। কিন্তু বাংলায় তিনি বংশগৌরবে সুপ্রসিদ্ধ নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়।

তখনো তিনি অবশ্য আপন পরিচয়ে বিখ্যাত হননি। কারণ সে সময় জগদিন্দ্রনাথ একুশ বছরের তরুণ। মাত্র সেই বছরেই নাটোর জমিদার-রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। সালটি হল ১৮৮৯।

তাঁর কলেজের পাঠ সমাপ্ত হয়েছে আগের বছর। আর সেই প্রথম বাংলার বাইরে পশ্চিমাঞ্চলে তিনি যাত্রা করেছেন। উদ্দেশ্য

—তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান দর্শন। আর সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য সঞ্চয়ও। বৈদ্যনাথধাম গয়া বারাণসী প্রয়াগ আগ্রা ভ্রমণের পর এসেছেন দিল্লীতে। এখান থেকে লাহোর যাবেন।

এই সবের মধ্যে মুরাদ খাঁকে দেখবার কথা জগদিন্দ্রনাথ ঠিক মনে রেখেছেন। খাঁ সাহেবের গানের এত সুখ্যাতি শুনেছিলেন যে দিল্লীতে সে সুযোগ তিনি ছাড়তে নারাজ। কারণ সঙ্গীত তাঁর বড়ই প্রিয়।

কদিন এখানে কাটল। দিল্লীর ঐতিহাসিক চিহ্নগুলি জগদিন্দ্র দেখলেন সব। মুরাদ খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ শুধু বাকি ছিল।

এখন সেই আশায় মুসলমান বৃদ্ধটির সঙ্গে চলেছেন জগদিন্দ্রনাথ। পুরনো দিল্লীর অপরিচ্ছন্ন পথে, বাহাদুর শাহের দরবারী গায়কের দর্শনপ্রার্থী।

তাঁর মনে কোন বিকার নেই। যে সব সদ্‌গুণে তিনি সুপরিচিত হন পরবর্তী-কালে, সেই তরুণ বয়সেও তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ।

জগদিন্দ্রনাথের অহমিকাশূন্য মানস। ধনী দরিদ্রে তাঁর অভেদ আচরণ। উদার দরদী, ব্যথার ব্যথী তিনি। গুণীজনের আদর ও কদরে অকুণ্ঠ, অকৃপণ। সুকুমার শিল্পে আগ্রহী। বিশেষ আকর্ষণ সঙ্গীতে। ঐশ্বর্যের আড়ম্বরের মধ্যেও ললিতকলার স্বপ্নলোকচারী। শান্ত মধুর তাঁর ব্যক্তিত্ব। স্নিগ্ধ সহজ আভিজাত্য।

অথচ, বিস্ময়ের বিষয়, জন্মসূত্রে অভিজাত নন জগদিন্দ্রনাথ। তাঁর আভিজাত্য আপন স্বভাবগুণে অর্জিত। কারণ তিনি অতি সাধারণ অখ্যাত পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর জনক শ্রীনাথ রায় নাটোর স্টেটের একজন কর্মচারী মাত্র। রাজবংশের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই।

নাটোরের রাণী ব্রজসুন্দরী পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন জগদিন্দ্রকে। স্বনামধন্যা রাণী ভবানীর পোষ্যপুত্র রামকৃষ্ণ। তাঁর পুত্র বিশ্বনাথ। তাঁর পুত্র গোবিন্দচন্দ্র। গোবিন্দচন্দ্রের পোষ্যপুত্র গোবিন্দনাথ।

শেষোক্ত জন অপুত্রক গত হলে তাঁর বিধবা রাণী ব্রজসুন্দরী জগদিন্দ্রকে পোষ্য নেন। তখন তিনি এক বছর দু মাসের শিশু। সে সময় থেকেই শিশুটি নাটোর রাজভবন নিবাসী।

পরিণত বয়সে পালিকা রাজমাতার প্রতি জগদিন্দ্রনাথ গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন আত্মজীবনীতে, তিনি 'দরিদ্রের সন্তানকে রাজাধিরাজ করিয়াছেন' বলে। 'অতি শৈশব হইতে… দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কাল পর্যন্ত যাঁহাকে গর্ভধারিণী জননী বলিয়াই আমার সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছিল।' (শ্রুতি ও স্মৃতি। মানসী ও মর্মবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩, পৃঃ ৪৭৪-৪৭৫)।

পরবর্তীকালে নাটোর মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ যখন বাংলার সম্ভ্রান্ত ও বিদগ্ধ সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয়, সে সময়েই সুপরিচিত সাহিত্য পত্রিকা 'মানসী ও মর্মবাণী'তে ধারাবাহিক এই স্মৃতিকথা প্রকাশ করেছেন। কি নিঃসঙ্কোচ তাঁর সত্যনিষ্ঠা ও সরলতা! প্রচার না করলেও পারতেন: 'যে পুণ্যশ্লোকা প্রাতঃস্মরণীয়া রানী ভবানীর নাম…উচ্চারণ করিয়া আজও অর্ধবঙ্গের নরনারীগণের অন্নসংস্থানে বাধা হইতেছে না, নিতান্ত দীন দরিদ্রের ঘরে দীনার অঙ্কে জন্মিয়াও যাঁহার পুণ্যগৃহের এক কোণে স্থান পাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে' (ঐ, চৈত্র ১৩২৪, পৃঃ ২০৭)।

অমুদ্রিত থাকলে বহু লোকের কাছেই তাঁর পূর্ব বৃত্তান্ত অজ্ঞাত থেকে যেত। কিন্তু এখানেই তাঁর বিনীত মহত্ত্ব। অভাবিত বৈভবের অধিকারী হয়েও তাঁর ছিল দার্শনিক নির্লিপ্ততা। বৈষয়িক অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে তিনি। পরিণতকালে বিদ্বৎ সঙ্গ আর সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে জগদিন্দ্রনাথ সবচেয়ে স্ফূর্তিলাভ করতেন। কাব্যসাহিত্য-প্রেম থেকে রীতিমত চর্চা আরম্ভ করেন সাহিত্যের। 'সন্ধ্যাতারা' কাব্যগ্রন্থ, 'নুরজাহান' ঐতিহাসিক কাহিনী, বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ, (১৮২৬, জানুয়ারিতে আকস্মিক মৃত্যুর ফলে অসম্পূর্ণ) সুদীর্ঘ স্মৃতিচারণ 'শ্রুতি ও স্মৃতি' ইত্যাদি তার সাক্ষ্য। মাসিক 'মানসী', সাপ্তাহিক 'মর্মবাণী' এবং

শেষে 'মানসী ও মর্মবাণী' মাসিকপত্র (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে) সম্পাদনাও তাঁর সাহিত্যচর্চার অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যও প্রধানত সাহিত্যের সরণিতে।

কিন্তু সে সব অনেক পরের প্রসঙ্গ। সাহিত্যচর্চা তাঁর অকালগত জীবনের শেষ পনের-ষোল বছরের কথা। এ কাহিনী তাঁর প্রথম যৌবনকালের। সাহিত্যচর্চা তখনো প্রকাশ পায়নি। তবে সঙ্গীতের চর্চা কিছু আরম্ভ করেছেন—পাখোয়াজে। নাটোর রাজবাড়িতে সাঙ্গীতিক আবহ তাঁর আগেও ছিল। রানী ব্রজসুন্দরীর স্বামী গোবিন্দনাথ ছিলেন (সুরবাহারী ?) মহম্মদ খাঁর শিষ্য।

জগদিন্দ্রনাথ সেই তরুণ বয়সেই সঙ্গীতপ্রেমী। সঙ্গীতশিল্পীদের দরদী। তাঁদের অনুষ্ঠানের আস্বাদ তিনি অতিশয় আনন্দের অভিজ্ঞতা মনে করেন। গুণীজনের প্রতি তাঁর সহৃদয় সৌজন্য।

তাই এই দূর দিল্লীতে এসেও মুরাদ খাঁর সন্ধানে চলেছেন। পরিস্থিতি আরামের নয়, বরং কষ্টকর তাঁর পক্ষে। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশও অপ্রীতিকর বোধ হতে পারত। কিন্তু জগদিন্দ্রনাথ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। ভস্ম আচ্ছাদনের মধ্যেও রত্নের সন্ধানী। তাই এক শিল্পী-সন্নিধানে চলেছেন দ্বিপ্রহরের দিল্লীর পথে পথে।

আরো কিছুক্ষণ পরে, বৃদ্ধটি তাঁকে নানা রাস্তা পার করে নিয়ে এল। দাঁড়াল একটি সঙ্কীর্ণ গলিতে।

তারপর একটি নিচু বাড়ির দোতলার দিকে আঙুল তুলে জানালে —ওই ঘরে থাকেন মুরাদ খাঁ।

বৃদ্ধ বিদায় নিলে। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়িটির নীচে এলেন জগদিন্দ্রনাথ। দেখলেন, বাইরে থেকেই দোতলায় ওঠবার কাঠের সরু সিঁড়ি আছে।

সেই ঘোরানো, নোংরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এলেন তিনি। সামনেই ঘরখানি। কিন্তু দিনের বেলাও সেখানে আলো বড় কম। তিনি ঘরের মধ্যে এসেও প্রথমে তেমন ঠাওর করতে পারলেন না।

একটু পরে নজর পড়ল ঘরের একটি দেওয়ালে। এক অতি বৃদ্ধ সেখানে ঠেস দিয়ে বসে। যে এতক্ষণ তাঁকে পথ দেখিয়ে এনেছিল, তার চেয়েও এ ব্যক্তির বার্ধক্য অনেক বেশি। একেবারে জরাজীর্ণ, স্থবির যেন। শুষ্ক চর্মসার শীর্ণ শরীর। কত যে তাঁর বয়স তা ধারণা করা কঠিন। হয়ত নব্বুই হতে পারে। আরো ক' বছর বেশি হওয়াও অসম্ভব নয়।

বৃদ্ধের চোখ দুটি বন্ধ। ঝুলে রয়েছে ভ্রূ জোড়া। সামনে এসে জগদিন্দ্র সম্ভাষণ করলেন।

ডাকলেন 'খাঁ সাব' বলে। কিন্তু কোন সাড়া নেই।

নিদ্রাচ্ছন্ন নাকি ?

গায়ে হাত দিয়ে ঠেললেন অল্প অল্প। তখন সেই ঝুলন্ত ভ্রূর ফাঁক দিয়ে কোটর-গত চক্ষু খুলতে দেখা গেল।

জগদিন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনিই কি মুরাদ খাঁ ?'

অস্ফুট জবাব ভেসে এল, 'হাঁ। আমারই নাম মুরাদ খাঁ।'

তারপর ধীর স্বরে তাঁর প্রশ্ন, 'কিন্তু আপনার কি দরকার ? কোথা থেকে এসেছেন ?'

এখানেও আত্মপরিচয় দিলেন না নাটোর।

শুধু তাঁকে খাতির করে বললেন, 'আমি বংলাদেশ থেকে এসেছি, খাঁ সাব। আপনার গান শুনতে আমার বড়ই ইচ্ছে।'

মুরাদ খাঁ প্রথমেই উত্তর দিতে পারলেন না। আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল তাঁর কণ্ঠস্বর।

জগদিন্দ্রনাথ আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, তাঁর চক্ষুকোটর ছাপিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে।

তারপর একটু আত্মস্থ হয়ে মুরাদ খাঁ বলতে লাগলেন, 'বাবুজী, কেয়া তাজ্জব! আপনি সেই বাংলা মুলুক থেকে আমার গানা শুনতে এসেছেন ? কিন্তু এই দিল্লীতে কোন মানুষ আমার কাছে আসে না। কেউ আমার খোঁজ খবর নেয় না, বাবুজী। গানও

কেউ শুনতে চায় না। আমার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। সহায় সম্বল কিচ্ছু নেই। আমিও দুনিয়ার কোন খবর রাখি না। এই ঘরের কোণে পড়ে আছি। বাবুজী, গান আমি আর গাই না। বাদশা বাহাদুর শাহ্ মারা যাবার পর থেকে গানের দিল্ আমার চলে গেছে। ওই দেখো, ও-কোণে তানপুরাটা পড়ে আছে। কিন্তু একটাও তার নেই। বাহাদুর শাহ্ বেঁচে থাকলে কি আমার এ হাল হত!'

একটানা এতক্ষণ কথা বলে মুরাদ খাঁ একটু থামলেন।

জগদিন্দ্রনাথ দেখলেন তানপুরাটা। বহুকালের হাত-না-পড়া অবস্থা। জোয়ারিটা আছে বটে, তবে কোন তারই নেই।

তিনি হতাশ বোধ করলেন। বৃথা হল এত কষ্ট করে আসা। বৃদ্ধের এই অশক্ত শরীরে, এই পরিস্থিতিতে কি করে গানের অনুরোধ আর করবেন?

জগদিন্দ্রনাথ খানিক মৌন রইলেন এই ভেবে।

কিন্তু, না। ভাগ্য তাঁর প্রসন্ন।

মুরাদ খাঁ একটু যেন বিশ্রাম করে, বলে উঠলেন, 'লেকিন বাবুজী, আজ আমি গাইব। আপনি বাংলা মুলুক থেকে আমার কথা মনে করে এসেছেন। আমার গান আপনি শুনতে চান। আপনাকে আমি ফেরাতে পারব না, বাবুজী। তবে আপনাকে তানপুরার তার কিনে আনতে হবে।'

আশা পূরণের আশ্বাসে প্রফুল্ল জগদিন্দ্রনাথ। তখনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'আমি তার কিনতে যাচ্ছি, খাঁ সাব।'

'আর একটা কথা বাবুজী,' একটু ইতস্তত করে বললেন—বলতে গিয়ে আবার কাঁদলেন মুরাদ খাঁ, 'আজ তিন দিন আমি অনাহারে আছি। পেটে একটা দানা পড়েনি। খাওয়ানো দূরের কথা, বেঁচে আছি কিনা তালাস করতে আসেনি কেউ...'

নাটোর আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন রাস্তায়।

একটু পরেই পুরী মিঠাই নিয়ে ফিরলেন। আর ষ্টীল ও পেতলের তার।

মুরাদ খাঁ তৃপ্তি করে নাস্তা করলেন। তারপর তানপুরায় নতুন তার চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সঙ্গত কে করবে? সঙ্গে কাকেও এনেছ?'

'না। আমি একাই এসেছি।' জগদিন্দ্র সবিনয়ে জানালেন, 'তবে যদি অনুমতি দেন, সমের সঙ্গে ধা মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করব।'

ঘরের পাখোয়াজটার অবস্থাও প্রায় তানপুরার মতন। নাটোর সেটিকে সাফ-সুতরো করলেন কাজ-চলা গোছের।

বৃদ্ধের সেই বিশীর্ণ মুখেও আনন্দের উদ্ভাসন হল। ঈষৎ হাসির রেখা ফুটল যেন। তিনি গুন্‌গুন্ করে একটু সুর ভাঁজলেন। তারপর তানপুরায় সুর মেলালেন বেশ মনের মতন করে। তানপুরা বেঁধে, দুই নিপুণ আঙুলে খানিকক্ষণ সুর ছাড়তে লাগলেন। সুর মধ্যম সুর পঞ্চম। সুর মধ্যম সুর পঞ্চম। সা পা সা মা। সা পা সা মা। সুরের ভ্রমর-গুঞ্জন আরম্ভ হল ঘরের মধ্যে। বেশ আওয়াজী যন্ত্রটি।

এইবার বুঝি মুরাদ খাঁ গান ধরবেন—ভাবলেন জগদিন্দ্রনাথ।

কিন্তু খাঁ সাহেব যেন সুরটি পরখ করে তানপুরা নামিয়ে রাখলেন। একটা বাক্স ছিল ওদিকে। তার মধ্যে থেকে বার করলেন প্যাঁচদার পাগড়ির আলগা খোলা জট। কতকাল তাতে হাত পড়েনি, পাগড়ির আকারে মাথায় চড়েনি সেটি! মলিন বিবর্ণ হয়ে গেছে। কি যে তার আসল রঙ ছিল, বোঝা যায় না এখন।

সেই নেকড়াগুলো তুলে নিয়ে মুরাদ খাঁ পাগড়ি বাঁধতে বসলেন।

কবে ফতে হয়ে গেছে বাহাদুর শার দরবার। কিন্তু তাতে কি? তাঁর দরবারী ওস্তাদ না মুরাদ খাঁ? দরবারী কেতা সহবৎ তিনি

ভুলবেন নাকি ? সে সব যে গানের স্বরের মতন তাঁর সত্তার সঙ্গে মিশে আছে।

ছোট ঘরটির সর্বাঙ্গে প্রকট দৈন্যদশা। শ্রোতা মাত্র একজন। তা হোক। বাহাদুর শার দরবারী ধ্রুপদীকে পাগড়ি বাঁধতে হবে রেওয়াজ মাফিক! কত দূরের সেই বাংলা মুলুক থেকে তাঁর গান শুনতে এসেছেন রইস লোক! খানদানের সমঝদার! বিনা পাগড়িতে কি আসর করা যায় মেহমানের সামনে ?

পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সেই পাগড়ি বাঁধতে লাগলেন মুরাদ খাঁ। ঝুলে পড়া ভ্রূজোড়ায় চোখ প্রায় ঢেকে ফেলেছিল। ভ্রূর সঙ্গে যেন ঝুলে পড়েছিল চোখ দুটোও। পাগড়ি বাঁধার সঙ্গে সেই ঝুলন্ত ভ্রূ, চোখ তিনি টেনে তুললেন। প্যাঁচদার পাগড়ি যখন মাথায় ঠিক বসে গেল, চোখ ভ্রূ ও উঠল স্বস্থানে। মুখাবয়বের লোলচর্ম একটু টান টান দেখাল।

এবার তানপুরাটি কোলে উঠিয়ে নিলেন মুরাদ খাঁ।

নাটোরকে পাখোয়াজ নিতে দেখে কোমল স্বরে বললেন, 'তুমি ছেলেমানুষ, পারবে কি ? তা বেশ, এস। দুজনে মিলে একটু গানালাপ করি।'

গান আরম্ভ করবার আগে তাঁর আঁখিপট আর একবার চিক-চিক করে উঠল। কিন্তু এবার আনন্দের সজলতা।

'কতদিন, কতদিন পরে আজ গাইতে বসেছি।'

গান একেবারেই ধরলেন না মুরাদ খাঁ। দরবারী কানাড়ায় রীতিমত আলাপ আরম্ভ করলেন। আর তাঁর স্বর একটু শুনেই জগদিন্দ্র বুঝলেন—হ্যাঁ, কানাড়া গাইবারই উপযুক্ত কণ্ঠ। ধীর গম্ভীর দরাজ। মনোহারী মীড়ের স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ। আলাপচারীর অগ্রগতির সঙ্গে দীন কুঠুরির পরিবেশ পরিবর্তিত হতে লাগল। তাঁর মলিন পায়জামা পিরান পাগড়ি আবৃত করে সুর ভরপুর হয়ে উঠল চার দেওয়ালের মধ্যে।

সেই লোলচর্ম, স্খলিতপ্রায়-চক্ষু জীর্ণ-দেহীর এই সঙ্গীত-কণ্ঠ! প্রত্যক্ষ না করলে সে শ্রোতা বিশ্বাস করতে পারতেন না।

সেদিনের গানের বর্ণনায় জগদিন্দ্রনাথ পরে বলতেন, 'মুরাদ খাঁর গলা অত বয়সে খরজেও যেমন মোটা ভরাট ছিল, চড়ার দিকেও আওয়াজ ছিল যুবক তুন্নি খাঁর মতন।'

আলাপের পর চৌতালে দরবারী কানাড়ায় গানও তিনি শোনালেন। গাইলেন মোট প্রায় এক ঘণ্টা। তারপর শ্রান্ত হয়ে গান বন্ধ করলেন।

দরদী শ্রোতা আশার অতীত লাভ করেছেন স্থবির শিল্পীর কাছে। চমৎকৃত, পরিতৃপ্ত তিনি।

সেলাম করে বললেন, 'ওস্তাদজী, যে সুধা কানে ঢাললেন জীবনে তা ভুলব না। কাল আমি লাহোর যাচ্ছি। সেখান থেকে ফিরে আসতে এক সপ্তা হবে। তখন আবার আপনার কাছে আসব। গানের জন্যে বিরক্ত করব আপনাকে।'

বলতে বলতে একখানি একশো টাকার নোট কলাবতের হাতে গুঁজে দিলেন।

কৃতজ্ঞতার কোন ভাষা ফুটল না মুরাদ খাঁর মুখে। নীরবে তিনি অশ্রুমোচন করতে লাগলেন।

বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন জগদিন্দ্রনাথ।

মুরাদ খাঁ তখন অন্তরের স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করলেন, 'খোদা তোমার মঙ্গল করুন, বাবুজী।'

সে-যাত্রায় লাহোর দেখতে গেলেন জগদিন্দ্রনাথ। সেখান থেকে আবার দিল্লীতে এলেন। কিন্তু ফিরতে দেরি হয়ে গেল একদিন। দিল্লী পৌঁছেই মুরাদ খাঁর কথা তাঁর মনে হল।

ওস্তাদের উদ্দেশে বেরিয়ে প্রথমে চৌকে এলেন। তারপর সেইসব রাস্তা ধরে এসে গলির মধ্যে সেই নীচু দোতলা বাড়ি। তার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরটির সামনে দাঁড়ালেন।

দরজা ভেজানো ছিল।

বাইরে থেকে ডাকলেন একবার। সাড়া মিলল না।

ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল। ভেতরে এসে জগদিন্দ্রনাথ বললেন, 'খাঁ সাব, আমি এসেছি।'

কোন সাড়া শব্দ নেই। প্রথম নজরে কাউকে দেখতে পেলেন না আবছায়ায়।

তবু আরো একবার ডাকলেন, 'খাঁ সাব।'

জনহীন কামরায় শুধু একটা প্রতিধ্বনি গুমরে উঠল। কেউ নেই দেখে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন নীচে। পাশের বাড়িতে একজনকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'ও ঘরের মুরাদ খাঁ কোথায়?'

লোকটি তাঁর মুখের দিকে একটু তাকিয়ে সংবাদ দিলে, 'তিনি মারা গেছেন কাল। গোরও হয়ে গেছে।'

স্তব্ধ হয়ে শুনলেন জগদিন্দ্রনাথ। আর কিছু জানতে চাইলেন না। ক' বিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ল তাঁর চোখ দিয়ে।

বাহাদুর শার দরবারী কলাবতের উদ্দেশে নাটোরের স্মৃতিতর্পণ।...

সেদিনই তিনি দিল্লী ত্যাগ করলেন।

তানসেনের এক বংশধর

॥ তাজ খাঁ ॥

সেদিন তাজ খাঁকেও বামারচণ প্রথম দেখলেন। আর তাঁর পরিচয়ও পেলেন সেখানে। এমন দরবারী আসরে তাঁর গান শোনারও সুযোগ হল নাটকীয় পরিবেশে।

মেটিয়াবুরুজ দরবারে বামাচরণ সেই প্রথম এলেন। আর সেদিনই এত সব আশ্চর্য ঘটনা একটি আসরেই ঘটে গেল পর পর। ক' ঘণ্টার মধ্যে কত রকমের মানুষ তিনি দেখলেন। আর সঙ্গীত-জগতের ক'জন স্বনামধন্য ব্যক্তিকে।

তাই সেই নবাব দরবারের স্মৃতি বামাচরণের মনে সারাজীবন অক্ষয় হয়ে রইল। নবাব ওয়াজিদ আলীর সামনে তাঁর সেই প্রথম আসরের কথাও।

বেহালার বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে তিনি বাংলার এক সেরা খেয়াল-গুণী হয়েছিলেন। আর বামাচরণের সময় ক'জনই বা খেয়াল-গায়ক ছিলেন বাঙালীদের মধ্যে। তাই তাঁর বিশিষ্ট স্থান ছিল বাংলার সঙ্গীত-সমাজে। আর তিনি খেয়ালগানের একজন আচার্য-স্থানীয় হয়েছিলেন। কিন্তু সেদিনকার আসরের অনেক পরের কথা সেসব।

মেটিয়াবুরুজ দরবারে যখন বামাচরণ সেই প্রথম যান, তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ-তেইশ বছর। গানের দিকে ঝোঁক তাঁর আরো অনেক কম বয়স থেকে। দস্তুরমত শিখেছেনও ক' বছর।

এই দরবারেরই বিখ্যাত ওস্তাদের কাছে বামাচরণ তখন তালিম নিচ্ছেন। সাধছেন খুব পরিশ্রম করে। বেহালা থেকে মেটিয়াবুরুজে হাঁটাহাঁটি করে তালিম নিতে যান। বাড়িতে রিয়াজ করেন ঘণ্টার

পর ঘণ্টা। গলাও বেশ খানিক তৈরি হয়েছে বটে। কিন্তু গায়ক বলে তখনো বাইরের কেউ তাঁকে চেনে না।

সে হল ১৮৮৪ সালের কথা। তারও দু-তিন বছর আগে থেকে তিনি মেটিয়াবুরুজে গান শিখতে যেতেন। নবাব দরবারের নাম-করা খেয়াল-গায়ক আলী বখ্‌স্‌ বামাচরণের ওস্তাদ। গোয়ালিয়র থেকে এসে আলী বখ্‌স্‌ এখানে রয়েছেন।

তাঁর কাছে শেখবার সময় থেকেই বামাচরণের নবাব ওয়াজিদ আলীর দরবার দেখবার সাধ। আলী বখ্‌স্‌কে বলতেনও মাঝে মাঝে। কিন্তু এতদিন সুবিধা হয়নি। ইচ্ছা হলেই দরবারে যাওয়া যায় না। সেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। ওস্তাদ আলী বখ্‌স্‌ এতদিন পরে সে সুযোগ করে দিলেন। আর তাঁরই সঙ্গে সেদিন দরবারে হাজির হলেন বামাচরণ।

বাইশ-তেইশ বছরের সুদর্শন তরুণ। গৌরবর্ণ সুগঠিত শরীর। দীর্ঘকায়, ব্যায়ামবলিষ্ঠ অবয়ব। বাল্যকাল থেকে বামাচরণের পশ্চিমাঞ্চলে বাস ছিল। সেজন্যেই এমন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা। তখন তাঁর বেশভূষাও পশ্চিমাদের মতন। পরনে ঢিলে পায়জামা আর পাঞ্জাবি। আর মুখে সৌখীন ছাঁটের দাড়ি। হঠাৎ দেখলে বাঙালী বলে বোধ হয় না। পোশাক-পরিচ্ছদ আকার-প্রকার সবই বামাচরণের তখন ছিল এমনি-ধারা।...

মেটিয়াবুরুজের গঙ্গার দিকে সেই নবাবী কোঠি। তারই মধ্যে দরবার-কক্ষ। নবাব ওয়াজিদ আলীর সেই ভারত-প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-দরবার। উত্তর ভারতের কত স্বনামধন্য কলাকারকে নবাব নিযুক্ত রেখেছেন এখানে। যখনকার কথা হচ্ছে ওয়াজিদ আলী সে-সময় ষাট বছর পার হয়ে গেছেন। (তাঁর জন্ম ১৮২৩ সালে।)

আলী বখ্‌স্‌ সেদিন যখন বামাচরণকে নিয়ে নবাববাড়িতে এলেন, তখন সবে সন্ধ্যে হয়েছে। দরবারের মধ্যে এসে দেখলেন আর বিশেষ কেউ আসেননি তখনো। তাঁরা সামনের দিকে বসলেন।

আর বামাচরণ চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন—লক্ষ্ণৌ থেকে নির্বাসিত হয়ে আসা নবাবের এই মেটিয়াবুরুজ দরবার।

প্রথমেই আশ্চর্য হলেন, একসঙ্গে চারজনকে তানপুরা ছাড়তে দেখে। শ্রোতারা কেউ আসেনি তখন। আর আসরও তো আরম্ভ হয়নি।

অথচ চারজন বসে সুর ছাড়ছেন তানপুরায়। একটু ধীর ছন্দে, একটানা সুরের গুঞ্জন ভেসে উঠছে। শুধু তানপুরা নয়। এক তবলচী রয়েছেন প্রকাণ্ড একটি বাঁয়া নিয়ে। কেবলমাত্র সেই বাঁয়ায় বোলের মতন বাজিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কোন ঠেকার বোল নয়। আর তবলাও নেই তাঁর ডান হাতে। শুধু বিরাট বাঁয়াটি থেকে প্রায় একটানা সুর বেজে চলেছে। তার বেশ সঙ্গতি আছে তানপুরার ঢিমে ছন্দের সঙ্গে!

বাঁয়ার আওয়াজের সঙ্গে চারটি তানপুরার ভ্রমর গুঞ্জরণের সুরে ভরপুর আসর।

বামাচরণ আলী বখ্‌স্‌কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আসরে আর কেউ নেই। কিন্তু এঁরা তানপুরা ছাড়ছেন, বাঁয়ায় সুর রাখছেন কেন?'

দরবারী ওস্তাদ আলী বখ্‌স্‌ বুঝিয়ে বললেন, 'নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ দরবারে এই রকমই বন্দোবস্ত করেছেন। বরাবরের রেওয়াজ এটা। নবাব চান আসরে সব সময় ভরে থাকবে সুর। যখনই এখানে গান-বাজনা শুরু হবে, কালোয়াতরা সুর ধরে নিতে পারবেন। আসরে তখনি জমে যাবে সুর। তা ছাড়া, নবাব নিজেও যখনি এখানে আসবেন, তিনি যেন সুর শুনতে পান। বিনা সুরে থাকতে পারেন না নবাব। যেদিন গান-বাজনার আসর বসে না, সেদিনও অন্তত একজন তানপুরা ছাড়ে।'

বামাচরণ চমৎকৃত হলেন। এমন আসরের কথা তিনি আর শোনেননি কখনো।

তানপুরা-বাদকদের দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন তাঁদের সুর

ছাড়বার কায়দা। আঙুলের একেবারে কোণ দিয়ে তারের ওপর তাঁরা টিপ দিয়ে যাচ্ছেন। এ-দরবারী তানপুরা ছাড়বারও এই বৈশিষ্ট্য। ওস্তাদ আলী বখ্‌স্‌ও বামাচরণকে আঙুলের এমন কোণ দিয়ে তানপুরা ছাড়তে বলতেন। এখন সেই জিনিস বামাচরণ চাক্ষুষ করলেন দরবারে। এদিকে ধীর একটানা চলছিল চারটি তানপুরার ধ্বনিছন্দ। বাঁয়ার ঢিমা লয়ের সঙ্গত তার সঙ্গে বেশ সুরের রেশ জমিয়ে তুলছিল।

সামনে বসে চারটি তানপুরা আর সেই প্রকাণ্ড বাঁয়ার একটানা সুর শুনতে লাগলেন বামাচরণ। আর দরবারের সজ্জার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। মেঝের কার্পেট থেকে কড়ির ঝাড়-লণ্ঠন পর্যন্ত। আলোর ঝাড় ছাড়াও নানা রঙীন ফানুস ওপর থেকে ঝোলানো রয়েছে। প্রত্যেক ফানুসের মধ্যে জ্বলছে আলো। রঙীন আলোর সেইসব ফানুস আলোর ঝাড়ের চেয়ে অনেক নীচে নেমে এসেছে। নানা রঙের বাহারে ফানুস।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আসতে আরম্ভ করলেন দরবারের সব রইস লোক। বামাচরণের দৃষ্টি এবার তাঁদের দিকে আকৃষ্ট হল।

প্রায় সকলেরই দেখবার মতন চেহারা। পশ্চিম অঞ্চলের স্বাস্থ্য-বান মানুষ। তার ওপর যেমন সুপুরুষ তেমনি তাঁদের বেশভূষার পারিপাট্য। তাঁরা বসবার পর আতরের খসবুতে জায়গাটা মাতোয়ারা হয়ে উঠল। বামাচরণ বসে দেখতে লাগলেন এই সব সৌখীন অমীর তুল্য ব্যক্তিদের গায়ের রঙ মুখ চোখ পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে টুপির বাহার পর্যন্ত।

এমন সময় আর একজন এলেন। তাঁকে আবার আরো দেখবার মতন। বিশাল শরীর তাঁর, কিন্তু স্থূলকায় নন। আর তেমনি আভাযুক্ত গৌরকান্তি। তিনি অন্যান্যদের মধ্যে এসে বসবার পর তাঁরা যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন।

অথচ নবাগতের বেশভূষা আদৌ মূল্যবান নয়। একটি আলখাল্লা

ধরনের ঝোলা পিরাণ আর পায়জামা তিনি পরেছেন। সবই মলিন। কিন্তু সে দৈন্যে ম্লান হয়নি তাঁর বলিষ্ঠ দেহরূপ। সেই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বও লক্ষ্য করবার মতো। সেই ব্যক্তিত্ব তাঁর সব কিছুর মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য করে নিয়েছে। তাঁর মুখের গোলাপী বর্ণের সঙ্গে শ্মশ্রুর মেহেদী রঙও হয়েছে দিব্য মানানসই। সবসুদ্ধ মিলে বামাচরণ সেই আগন্তুকের প্রতি বিচিত্র আকর্ষণ বোধ করলেন। আর তিনি এসে বসলেনও তাঁদের কাছে, আলী বখ্‌সের পাশেই।

দীর্ঘদেহী পুরুষটির আলী বখ্‌সের সঙ্গে যেন কি কুশল বিনিময়ও হল। হাতের মুদ্রায় আর শির সঞ্চালনের কায়দায়। বামাচরণ দেখলেন তাঁর ধরন-ধারণেও বেশ আভিজাত্য আছে। এত অভিজাত ব্যক্তিদের মধ্যেও তিনি একজন বিশিষ্ট।...

খানিক পরেই নবাব ওয়াজিদ আলী দরবারে এলেন। আর আসন নিলেন তাঁর তখ্‌তে। তাঁর মাথার মুকুট, গলার হার থেকে আঙুলের আঙটিতে পর্যন্ত হীরে-মুক্তোর জৌলুষ।

কিন্তু বামাচরণ তাঁর দিকে ভাল করে লক্ষ্য করবার আগেই নবাব বললেন, 'আজ মেরা বেগমকি গানা হোগি।'

নবাবের কথায় অবাক হয়ে গেলেন বামাচরণ। বেগমের গান এই প্রকাশ্য দরবারে হবে? তাও কি সম্ভব? নবাব-বেগমের মতন পর্দানসীনা এখানে এত পরপুরুষদের মধ্যে আসবেন?

কিন্তু বামাচরণের তখন জানা ছিল না নবাবের গায়িকা বেগমদের কথা। একজন দুজন নন। ওয়াজিদ আলীর অনেক বেগমই পেশাদার গায়িকা থেকে পদোন্নীতা হয়েছিলেন। পরী থেকে তাঁরা বেগম। নাচওয়ালী গানওয়ালী সুন্দরীদের তিনি পছন্দ করে আনতেন। রাখতেন তাঁর 'পরীখানা'য়। তারপর তাঁদের অনেকেই তাঁর বেগম বনে যেতেন। মেটিয়াবুরুজের এই শেষজীবনে যেমন, তেমনি লক্ষ্ণৌতে স্বাধীন নবাবীর প্রথম আমলেও।

লক্ষ্ণৌতেই অবশ্য বেশি। তখন তো পুরোদস্তুর স্বাধীনতা ভোগ

করছেন। ওয়াজিদ আলী সেই যৌবনকাল থেকে নর্তকী গায়িকা রমণী-বিলাসী। লক্ষ্ণৌয়ের নৃত্যগীতপটিয়সীদের নিয়ে অহোরাত্র ঝঙ্কৃত থাকত তাঁর হারেম। তাঁর সঙ্গীত-দরবার। রূপসী বাইজীদের তিনি সাদরে 'পরী' বলে উল্লেখ করতেন। আর সেই পরীদের যাঁকে পছন্দ হত তাঁকেই নিকা করে নিতেন। এ-বিষয়ে তিনি পরম উদার। তাঁর নিজের লেখা আত্মকাহিনীতে এসব প্রসঙ্গ তিনি সরল মনে বর্ণনা করে গেছেন।

বিশেষ তাঁর 'তারিখ-এ-পরীখানা' (অর্থাৎ হারেমের ইতিবৃত্ত) কেতাবে। তাঁর প্রথম যৌবনের এই আত্মকথার শেষের অধ্যায়ের শিরোনামাই আছে—'একশ পরীকে বেগম করে নেওয়া হল।'

লক্ষ্ণৌতে নবাবী খোয়াবার আগে এসব নিয়েই মত্ত থাকতেন তিনি। বাইজী বেগম নাচ গান আর অপেরা। তাঁর সকল বেগমদের ইষ্টকোষ্ঠী জানা যায়নি। তবে কয়েকজনের পরিচয় পাওয়া গেছে বিশেষভাবে। যেমন বেগম হজরত মহল।

নবাব ওয়াজিদ আলী ১৮৫৬ সালে লক্ষ্ণৌ থেকে নির্বাসিত হয়ে মেটিয়াবুরুজে আসেন। তারপর ইংরেজদের বন্দী হয়ে ফোর্ট উইলিয়মে থাকেন। ১৮৫৭-৫৮ সালের সেই সময়, যখন লক্ষ্ণৌতে ছড়িয়ে পড়ে সিপাহী বিদ্রোহ। সেই বিদ্রোহের চূড়ান্ত পর্যায়ে নবাবের যে বেগম সিপাহীদের পক্ষে যোগ দেন, তিনিই হজরত মহল। তাঁর নাবালক পুত্র বির্জিস কাদরকে তখন বিদ্রোহী সিপাহীরা লক্ষ্ণৌর সিংহাসনেবসিয়েছিলেন। আর বির্জিস কাদরের অভিভাবিকা হয়েছিলেন তাঁর জননী হজরত মহল। নবাব ওয়াজিদ আলীর এই বেগম হারেমে আসবার আগে লক্ষ্ণৌর এক পেশাদার বাইজী ছিলেন। একথা জানা যায় নবাবের 'তারিখ-এ-পরীখানা' থেকে।

তাছাড়া নবাবের আর এক বেগম—রাজিয়া বেগমও ছিলেন লক্ষ্ণৌর এক প্রসিদ্ধা গায়িকা। নবাব লক্ষ্ণৌ থেকে নির্বাসিত হলে, রাজিয়া বেগম তাঁর ভাই ওস্তাদ ছুন্দে খাঁর সঙ্গে নেপালে আশ্রয় নেন।

সিপাহী বিদ্রোহ পর্বের পরেও তাঁরা থেকে যান নেপালে। ওয়াজিদ আলীর কাছে আর রাজিয়া বেগম ফিরে আসেননি।

নবাব ওয়াজিদ আলীর এমনি আরো বেগম ছিলেন, যাঁরা বাইজী থেকে উন্নীতা হন। সেদিন মেটিয়াবুরুজে যাঁর গাইবার কথা হল তিনিও সম্ভবত তেমনি একজন।

কিন্তু বামাচরণ এসব জানতেন না। তিনি বিস্মিত হয়ে ভাবছিলেন—এ কি করে সম্ভব। তবে বেশিক্ষণ তাঁকে ভাবতে হল না।

তিনি দেখলেন, দরবারের সকলের দৃষ্টি পড়েছে একদিকের দেয়ালে। সেখানে একটি দরজার মতন অংশ রেশমী পর্দায় ঢাকা। সেই পর্দার ওদিকে নিশ্চয় ঘর আছে, বামাচরণের মনে হল।

তখনই রেশমী পর্দার অন্তরাল থেকে ভেসে এল তানপুরার গুঞ্জন। আর সেই সঙ্গে তবলার নিক্কণ।

আর অনুমানের অবকাশ নেই। সেখান থেকেই অন্তরালবর্তিনী জেনানা কণ্ঠের গান শুরু হয়ে গেল।

দরবারে নবাব থেকে আরম্ভ করে সকলেই শুনতে লাগলেন অদর্শনা বেগমের গান।

গায়িকার কণ্ঠ শুনেই বামাচরণ বুঝলেন, তাঁর বয়স বেশি নয়। আর তাঁর বেশ সুরেলা সুমিষ্ট কণ্ঠ—যেন পাপিয়া। নিটোল মধুর স্বর-ধ্বনি, বয়সের কোন ভঙ্গুরতা সে কণ্ঠে নেই। অবশ্যই তিনি নবীনা বয়সী। আর বেগমও হয়েছেন হয়তো সম্প্রতি।

অন্তত বামাচরণের তাই মনে হল। তিনি মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন নবাব-বেগমের গান।

সুদৃশ্য রেশমী পর্দার আড়াল থেকে বেগম দরবারে গাইতে লাগলেন।

বিশেষ করে মিষ্টত্বের জন্যেই চমৎকার হল তাঁর গান।

আসরের সকলেই অদৃষ্টা বেগমের গানের তারিফ করতে লাগলেন।

তারপরেই হল সেই পরিস্থিতি যা বামাচরণের পক্ষে নাটকীয় দাঁড়াল।

নবাব আলী বখ্‌সের দিকে চেয়ে হঠাৎ ফরমায়েস করলেন,'আভি আপ গানা শুনাইয়ে।'

এই অল্পবয়সী গায়িকার পরেই গাইতে হবে শুনে আলী বখ্‌স্‌ অস্বস্তি বোধ করলেন। তাঁর তখন পরিণত বয়স। তাহলেও নবাব দরবারে তিনি গেয়ে থাকেন মাঝে মাঝেই।

কিন্তু এমন সতেজ কণ্ঠ তরুণীর গানের পরই গাইবার মেজাজ তাঁর হয়নি। বার্ধক্যের স্বর এখন আসরে ছাপ দিতে পারবে না হয়তো। এই রকমের আশঙ্কা তাঁর মনে জাগছিল। তা ছাড়া মহ্‌ফিলের এমন গোড়ার দিকে, এই কমবয়সী গায়িকার পরেই গাইতে ইচ্ছা হয়নি আলী বখ্‌সের। কেমন যেন বেখাতির মনে করছিলেন। কিন্তু দরবারে নিযুক্ত কলাবত তিনি। সেজন্যে প্রস্তুতও হলেন অগত্যা। নবাবের ফরমায়েস মান্য করতেই হবে।

বামাচরণও বুঝতে পেরেছিলেন ওস্তাদজীর মনের অবস্থা।

নবাবের আদেশ শুনেই তাঁর মনে হয়েছিল, এখন আলী বখ্‌সের গান না হওয়াই ভাল। এত বয়সের গলায় এ আসরে গেয়ে জমানো মুশকিল হতে পারে। কি করা যায় এখন। তাঁর মনে হল ওস্তাদজীর জন্যে একটা কিছু এখনই করা দরকার। তখনি ভেবে তিনি এক উপায় ঠিক করলেন। আর ওস্তাদকে জানালেন সেকথা।

আলী বখ্‌সের সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে শুনে সেই বিরাট চেহারার মানুষ জিজ্ঞেস করলেন, 'এ লৌণ্ডে কেয়া কহ্‌তা হ্যায়?'

অমন সুপুরুষ দর্শনধারী। কিন্তু গলার আওয়াজ তাঁর কিরকম নীরস ঝরঝরে মতন। তার ওপর 'লৌণ্ডে' শুনে বামাচরণের অতি খারাপ লাগল। ছেলেবেলায় পশ্চিমে বাস করার জন্যে তিনি ভালই বুঝতেন হিন্দুস্থানী। 'লৌণ্ডে' চলতি কথায় যাকে বলে 'ছোঁড়া'।

আলী বখ্‌স্‌ কিন্তু তাঁর ওই কথায় দোষ ধরেননি। তিনি তো

বক্তাকে জানতেন। বুঝেছিলেন, তিনি সাধারণভাবেই বলেছিলেন কথাটা।

আলী বখ্‌স্‌ তাঁকে বামাচরণের প্রস্তাবের কথাটা বললেন, 'এ ছেলেটি আমার ছাত্র। এ বলছে, আমার বদলে ও গান গাইবে কি? নবাবকে কি অনুমতির জন্যে বলা হবে? আপনি কি বলেন?'

তিনি শুনেই 'হাঁ হাঁ ইয়ে ত বহোৎ আচ্ছি বাৎ হ্যায়। কেঁও নহি?' বলে সেই ধরা ধরা গলায় খুবই উৎসাহ দিলেন। তারপর তিনিই নবাবেরও অনুমতি নিলেন বামাচরণের গান গাইবার।

দরবারে গানের সরঞ্জাম তো সদা প্রস্তুত। তখনই যন্ত্র ও যন্ত্রীদের সামনে আনা হল। তবলা বাঁয়া তানপুরা। তবলচী আর তানপুরা ছাড়বার লোক বসে গেলেন তাঁর পাশে। আর গলায় সুর ধরলেন বামাচরণ। তাঁর প্রথম যৌবনের সেই দরাজ সুরেলা কণ্ঠ। বেশ ভালভাবেই তাঁর গান আরম্ভ হল।

তখনকার সব বর্ণনা পরে নিজেই করতেন বামাচরণ। নিজের পরিণত বয়সে সেদিনের মেটিয়াবুরুজ দরবারের কথা তিনি এইভাবে বলতেন—

'আমার মনে তখন সুরের মেজাজ এসে গেছে। এ যে নবাব ওয়াজিদ আলীর দরবার, স্বয়ং নবাব সামনে বসে আছেন, আলী বখ্‌সের কাছে, আমার না-জানা আরো ওস্তাদ রয়েছেন—এসব ভয়-সঙ্কোচ কিছুই আমার হল না। একে তো জোয়ান বয়েস। ওস্তাদের তালিমও পাচ্ছি তিন-চার বছর। ওস্তাদের ইজ্জতের জন্যে মনে এসেছে একটা বেপরোয়া ভাব। গান গাওয়া তখন আমার কাছে অতি সহজ মনে হচ্ছে। দরবারে এসেই শুনেছি চারটি তানপুরা আর প্রকাণ্ড বাঁয়ার টানা সুর। তারপর এই পাপিয়ার গলায় গান। তাই সুর ধরবার জন্যে আর আমায় চেষ্টা করতে হল না। অনুমতি পেয়েই আমার গলায় এসে গেল ভূপালী। কিছুদিন আগেই আলি বখ্‌সের কাছে শিখেছিলুম—'সুঘর বনায়ে গায়ে বজায়ে…'

অনেক কাল পরেও বামাচরণ সেদিনের স্মৃতিচারণ ওইভাবে করতেন।'

ত্রিতালে সেই ভূপালি তিনি ধরতেই সুর জমে গেল—

'সুঘর বনায়ে গায়ে বজায়ে
রিঝয়ে সবন কো
মত্ গত্ সোঁ।'

বামাচরণের গান শুরু হতে ভারি খুশি হলেন আলী বখ্স্। মাথা হেলিয়ে ছাত্রকে ইশারায় জানালেন, ঠিক হচ্ছে।

আর সেই সম্ভ্রান্ত চেহারার ব্যক্তি সোৎসাহে সাবাস দিয়ে উঠলেন।

আলী বখ্সের তালিমের গোয়ালিয়রী চালের খেয়াল। বামাচরণ সেই ভারি চালে, তান কর্তব করে অন্তরা শোনাতে লাগলেন—

'তান তার বোল্ কি পটেরি বিধায়ত
গাওয়ত অলঙ্কার সোঁ'

গান তাঁর বেশ উৎরে গেল। আর ভাল লাগল সকলেরই। অনেকে বামাচরণকে প্রশংসা জানালেন।

তবে তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে তারিফ করলেন সেই বিশাল শরীর-ধারী। মুখে শুধু সাবাস দেওয়া নয়। মহা উৎসাহে তিনি নিজের আলখাল্লার ঢোলা পকেটে হাত পুরে দিলেন।

তারপর বামাচরণের হাতে উপুড়-হস্ত করে বললেন,'ইয়ে বখ্শিষ লেও।'

বামাচরণ অবাক হয়ে দেখলেন, তামার কটা পয়সা আর ডবল পয়সা।

তাঁর মন ছোট হয়ে গেল। তিনি বখ্শিষই বা নেবেন কেন, আর তাও এই ভিখারির মতন দান!

তিনি ইতস্তত করলেন। মৌন হয়ে রইলেন হাত গুটিয়ে।

আলী বখ্স্ ছাত্রের মনের কথা বুঝতে পারলেন। তার কানের

কাছে বলে দিলেন, 'লে লেও। এঁর এই কটা পয়সার অনেক দাম। এখানে এঁর চেয়ে বড় গুণী কেউ নেই।'

বামাচরণ ওস্তাদের কথায় সবিনয়ে গ্রহণ করলেন তামার পয়সা কটি। আর আলি বখ্‌স্‌কে তেমনি জনান্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে ইনি?'

আলী বখ্‌স্‌ তেমনিভাবে বামাচরণের কানের পাশে মুখ এনে সসম্ভ্রমে বললেন, 'তাজ খাঁ।'

বামাচরণ সে সময় তাঁর নাম বা পরিচয় কিছুই জানতেন না। সে সব জেনেছিলেন পরে। কিন্তু তখন আলী বখ্‌সের কথায় বড় আশ্চর্য বোধ করেছিলেন। এঁর গলায় তো রসকষ কিছুই নেই—অথচ এঁকেই ওস্তাদ বললেন সবচেয়ে বড় কলাবত।

এদিকে তাজ খাঁও আলী বখ্‌স্‌কে এই ছোকরা গায়কের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন।

'এক বাঙ্গালী। মেরা শগীরদ্‌।' আলি বখ্‌স্‌ জানালেন।

বাঙালী শুনে তাজ্জব বনে গেলেন তাজ খাঁ। তাঁর চোখে মুখে মহা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল। কেয়া? এমন গায়কী, এমন চুস্ত হিন্দুস্থানী উচ্চারণ। আর এমন চমৎকার স্বাস্থ্য। অথচ বাঙ্গালী? সেই ঝরঝরে আওয়াজে তিনি কয়েকবার জানিয়েও দিলেন তাঁর আশ্চর্য হওয়ার কথা।

তাজ খাঁ তখন বেশ কিছুকাল মেটিয়াবুরুজ নিবাসী ছিলেন। সুতরাং বাঙালীদের গড়পড়তা স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁর একটি ধারণা গড়ে উঠেছিল। আর বাংলার লোকের হিন্দুস্থানী উচ্চারণের বিষয়েও।

যা হোক বিস্তর বিস্ময় প্রকাশ করে তাজ খাঁ সাবাসও জানালেন ভালরকম।

তারপরই দরবারে বা নবাবের কাছে পেশ করলেন—তাঁর গানের মেজাজ এসে গেছে। এখন তিনি গাইতে চান।

বামাচরণ দেখলেন তাজ খাঁর গান গাইবার প্রস্তাবে দরবারে

বেশ চাঞ্চল্য জাগল। সকলেই যেন উৎসাহ বোধ করলেন তাঁর গান শোনবার আশায়। এঁর প্রতি সমাদরের ভাব বামাচরণ অনেকের মধ্যেই প্রথম থেকে লক্ষ্য করেছিলেন। এখন যেন তা আরো বেশি দেখা গেল তাঁর গান গাইবার কথায়।

গানের সরঞ্জাম তখনি প্রস্তুত হল। গান আরম্ভ করলেন তাজ খাঁ।

সামান্য 'তোম্ তায় নোম' করেই কাওয়ালীতে মালকোশের খেয়াল তিনি ধরলেন—

'মদৎ করো মোহে আল্লাহ্'

এবার বামাচরণের বিস্মিত হবার পালা। তাজ খাঁর এ কি কণ্ঠ! এতক্ষণ তাঁর কথা কতবার শুনেছিলেন—কি ঝরঝরে, ধরা ধরা আওয়াজ তাঁর। কেমন নীরস-কণ্ঠ শোনাচ্ছিল কথাবার্তায়।

কিন্তু এখন গান আরম্ভ করতেই একেবারে অন্যরকম। দস্তুর মতন সুরে ভরাট হয়ে উঠল তাজ খাঁর গলা। আর কি দাপটের সঙ্গে তিনি মালকোশ গাইতে লাগলেন।

মদৎ করো মোহে আল্লাহ
নিশি বাসর তেরো হি নাম
জপত হুঁ আল্লাহ্
নবীকে হোকে মেহেরবানি ॥

বামাচরণ সাগ্রহে শুনতে লাগলেন তাজ খাঁর অসাধারণ গান। শুধু দাপট নয়। সবই আছে। সুরে তো ভরপুর। এক এক সময় এমন মোলায়েম আওয়াজ দিচ্ছেন—বিশেষ মিড়ের কাজে। প্রথম মুখের 'আল্লাহ্' কথায় কি চমৎকার মিড় দিলেন। সে কি সূক্ষ্ম সুরের ওজন। আর সে কোমল গান্ধারের শ্রুতিও শোনবার মতন সুরেলা।

বামাচরণের বিশেষ করে ভাল লাগছিল এই জন্যে যে, তাজ খাঁর খেয়াল গাম্ভীর্যে ভরা। আলি বখ্‌সের গম্ভীর চালেরই মতন অনেকখানি—বামাচরণ যার তালিম পান। তাজ খাঁর এই খেয়ালেও

তেমনি কোন হাল্‌কা তান নেই। ধ্রুপদ-ছোঁয়া কি ভারি চালের খেয়াল। কোন খুচরো কাজ দেখালেন না তাজ খাঁ। বড় বড় তানের সঙ্গে খুব সুর আর মিড়ের কারুকর্ম। আর গমকের ধরনে কত তানকারি। স্থায়ীর দ্বিতীয় 'আল্লাহ্'তে এমন দাপটে একটি গমক দিলেন যে চমকে ওঠবার মতন। খরজের সা থেকে একেবারে তারার সা পর্যন্ত যেন বিজলি হেনে গেল। আর সেই গমকের দাপটে দপ করে নিভে গেল তাজ খাঁর সামনেকার একটা রঙীন ফানুস।

দরবারে রীতিমত একটা চমক সৃষ্টি হল। তারপর অন্তরা আরম্ভ করলেন তাজ খাঁ—

নূর বখস পর করম করো আপনা,
দিজে মোরাদ হোয়ে আকদানী ॥

তাঁর এই মালকোশ আরম্ভ হবার পরই দরবারে আগেকার গানের ছাপ মুছে গিয়েছিল। বামাচরণের নিজের গান কিংবা নবাবের সেই নতুন বেগমের গান আর কারুর মনে ছিল না তখন। তাজ খাঁর সুর, গানের চাল, গায়ন-ভঙ্গিমা আর ব্যক্তিত্ব। এ সবের সম্মিলনে দরবারে এক অপরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেল। আসর মাত করে দিয়ে এক সময়ে গান শেষ করলেন তাজ খাঁ।

আলী বখ্স্ আর অনেকেই তাঁকে সাবাস দিলেন। তারিফ করলেন নবাব।

বামাচরণ তো প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলেন। তাঁর মন ভরে গিয়েছিল সেই অসাধারণ মালকোশের খেয়ালে।

মেটিয়াবুরুজ দরবারে তাজ খাঁর গান বামাচরণের সেই একদিনই শোনবার সুযোগ হয়। কিন্তু তার স্মৃতি তাঁর সারা সঙ্গীতজীবনের এক বহুমূল্য সঞ্চয় হয়ে থাকে।

তাজ খাঁর গানের পরে আর কোন গান সেদিন হয়নি দরবারে। খানিক পরে আলী বখ্সের সঙ্গেই বামাচরণ উঠে আসেন। কিন্তু ফেরবার আগে আর এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল তাঁর জীবনে।

তাজ খাঁর কি দুর্লভ মেজাজ ছিল সেদিন। আর বামাচরণেরও কি ভাগ্যের যোগাযোগ।

দরবার থেকে বেরুবার আগেই তাজ খাঁ হঠাৎ বামাচরণকে বললেন, 'হাম্ সে কুছ তালিম লেও।'

কথাটি এমন অপ্রত্যাশিত যে তিনি কি জবাব দেবেন স্থির করতে পারলেন না। বিশেষত সঙ্গেই রয়েছেন তাঁর ওস্তাদ আলী বখ্স্। তাঁর কাছে তখন তিন-চার বছর গান শিখছেন।

তখন আলী বখ্সই তাঁর হয়ে তাজ খাঁকে বললেন, 'হাঁ হাঁ। নিশ্চয়ই শিখবে। এ তো ওর সৌভাগ্য। আপনি তালিম দেবেন আপনার ফুরসুৎ মতন। খুবই ভাল হবে।'

তাজ খাঁ যাবার সময় আলি বখ্স্কে বলে গেলেন, 'লেড়কাকো মেরা পাস ভেজ দেগা।'

'হাঁ, জরুর।'

তিনি চলে গেলে আলী বখ্স্ বামাচরণকে বললেন, 'যা পারো নিয়ে নাও ওঁর কাছে। উনি কাকেও শেখান না। আজ কি মেজাজ আছে তাই তোমায় শেখাতে চাইলেন। তোমারও বরাত। মেটিয়া-বুরুজে এখন তাজ খাঁর চেয়ে বড় গুণী আর কেউ নেই। আমাদের চেয়ে উনি অনেক বেশি জানেন।'

সেদিন যেন স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে বাড়ি ফিরছিলেন বামাচরণ।

মেটিয়াবুরুজ থেকে হাঁটাপথে বেহালায় আসতে আসতে এইসব কথাই শুধু ভেবেছিলেন। সেদিন এত রকমের অভিজ্ঞতা হয়েছিল দরবারে। পর্দানশিনা বেগমের গান শুনলেন আসরে। তারপর নিজেই গান গাইলেন নবাব আর এত গুণীজনের সামনে। তাজ খাঁর এমন গান শোনবার সৌভাগ্য হল। আবার, তালিম দিতে চাইলেন তাজ খাঁ স্বয়ং। এই সমস্ত স্মরণীয় ঘটনা পর পর একই আসরে ঘটে গেল। যে নবাব দরবারের কথা এতদিন শোনা ছিল,

সেখানে আসবার প্রথম দিনেই এত সব কাণ্ড। আর সেই সঙ্গে নবাবকেও এমন কাছে থেকে দেখা।

তারপরই বামাচরণ যাতায়াত আরম্ভ করলেন তাজ খাঁর কাছে। মেটিয়াবুরুজের ওস্তাদপাড়াতেই তাঁর আস্তানা ছিল। সেখানে একা থাকতেন তাজ খাঁ। তাঁর কাছে বামাচরণের শেখা চলতে লাগল। আলী বখ্‌সের কাছে আগে যেমন নিয়মিত শিখতেন তাও বন্ধ হল না। তাজ খাঁর তালিম পেতে লাগলেন উপরন্তু।

কি দিলদরিয়া মেজাজ তাজ খাঁর—সে-সময় বামাচরণ দেখতেন। মেটিয়াবুরুজ দরবারে তাঁরই তলব ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সে টাকার মধ্যে কিছুই সঞ্চয় করতেন না তাজ খাঁ। পরের মাসের তলব নেবার সময় তাঁর একেবারে ফতুর অবস্থা দেখা যেত।

বামাচরণকে যে ক' মাস গান শেখাতেন, উৎকৃষ্ট খেয়াল গান দিতেন—কখনো সেজন্যে টাকা নেননি। অথচ এক-একদিন কপর্দক-শূন্য অবস্থায় দিন কাটত তাঁর।

দরবারেও তাজ খাঁ নিয়মিত যেতেন না। যেদিন যেতেন সেদিনও যে গাইতেন, তাও না। তালিমের ব্যাপারেও মেজাজ হলে তবে গান শেখাতেন। আর সে মেজাজের মাহেন্দ্রক্ষণ ছিল বড়ই দুর্লভ।

তাজ খাঁ যে কি পরিমাণ মেজাজী ছিলেন তার পরিচয় বামাচরণ একেবারে শেষে পেয়েছিলেন। তাজ খাঁর কাছে তালিম নেবার প্রায় সমাপ্তি পর্বে। আর সে শেষের দিন অতি অকস্মাৎ এসেছিল।

তাঁর ওস্তাদ-পাড়ার ডেরায় বামাচরণ গেছেন কয়েক মাস। বার-চোদ্দখানি গান শিখেছেন। এমন সময় একদিন গিয়ে দেখেন তাজ খাঁর ঘর একেবারে ফাঁকা। জিনিসপত্র কিছুই নেই। তিনিও গরহাজির। আশপাশে খবর নিতে শুনলেন—তাজ খাঁ চলে গেছেন।

মেটিয়াবুরুজ ছেড়ে দরবারের নোকরিতে তুড়ি দিয়ে চলে গেছেন তিনি।

কোথয়ে গেলেন তাজ খাঁ? বামাচরণ জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কিন্তু কেউ তা জানে না।

কেন হঠাৎ ছেড়ে দিলেন দরবারের কাজ, মেটিয়াবুরুজের বাস?

হ্যাঁ, তার উত্তর পাওয়া গেল।

মেটিয়াবুরুজ দরবারে চাকরি নেবার সময় নাকি এক সর্ত করেছিলেন তাজ খাঁ। যখন তাঁর গানের মেজাজ হবে তখনই মাত্র তিনি দরবারে গাইবেন। কিন্তু নবাব যদি কোনদিন তাজ খাঁর বেমেজাজে, অনিচ্ছায় গানের ফরমায়েস করেন, তাহলেই দরবার ছেড়ে চলে যাবেন তিনি। নবাব ওয়াজিদ আলি রাজি হয়েছিলেন তাজ খাঁর সর্তে।

কিন্তু নবাব সেদিন তাজ খাঁকে দরবারে গাইবার জন্যে তলব করেছিলেন। অথচ তাঁর গানের মেজাজ ছিল না।

তখন তাজ খাঁ নবাবের কাছে গিয়েছিলেন ঠিকই। তবে একেবারে তলপি বেঁধে নবাবকে আদাব জানিয়ে বলেছিলেন, 'বাৎ কেয়া থা? এই রইল আপনার চাকরি। আমি যাচ্ছি।'

এমনি নাকি ঘটেছিল। আর সেই থেকে তাজ খাঁ নিখোঁজ। অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর কথা এখানে শোনা যায়নি। বামাচরণ তাঁর বহু অনুসন্ধান করেন কলকাতায়। খাঁ সাহেবের কাছে আরো অনেক নেবার জিনিস ছিল। কিন্তু তাঁর সাক্ষাৎ আর পাননি জীবনে।

কলকাতা থেকেই তাজ খাঁ নেপালে চলে গিয়েছিলেন। কিংবা প্রথমে ফিরে যান লক্ষ্ণৌতে। তারপর নেপাল রাজ্যে যান। সেখানে নিযুক্ত হন দরবারে। অর্থাৎ নেপালের আগে লক্ষ্ণৌতে কিছুদিন ছিলেন কিনা এসব কথা জানা যায়নি। তবে তাঁর পেশাদার জীবনে কলকাতার পরেই নেপাল দরবারের পর্ব। আর নেপালে তিনি

সপরিবারে বাস করেছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ও কাটে সেখানে।

কিন্তু তাজ খাঁর নেপাল-জীবনের আগে অন্য কথাও কিছু আছে। তাঁর প্রথম জীবনের লক্ষ্ণৌ প্রসঙ্গ। আর তাঁর ব্যক্তি-পরিচয় ও বংশপরিচয়ের কথা।

তাজ খাঁর ভাগিনা ছিলেন তসদ্দুক হোসেন। খেয়াল গানে তসদ্দুক হোসেনও একজন বিখ্যাত কলাবত হয়েছিলেন। তিনি নেপালে যেমন থাকেন, তেমনি বাংলার একাধিক স্থানেও। বিশেষ করে মেদিনীপুরের পঞ্চেৎগড় এবং তমলুকে তসদ্দুক হোসেনের বাসের কথা জানা যায়। আর তাজ খাঁর বংশপরিচয় প্রকাশ পায় তসদ্দুক হোসেনের সূত্রে।

তসদ্দুক হোসেন তাজ খাঁর কেবল ভাগিনেয় নন, তাঁর সঙ্গীত-শিষ্যও। তাজ খাঁর তালিম তসদ্দুক বোধহয় নেপালে পান। কারণ নেপালে তিনি ছিলেন তাজ খাঁরই সমকালে।

তসদ্দুক হোসেনের সঙ্গে বাংলার একাধিক গুণীর সাঙ্গীতিক যোগাযোগ ঘটে। তাঁদের অন্যতম হলেন ধ্রুপদী কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়। কিশোরীলালের প্রধান ওস্তাদ ছিলেন উনিশ শতকের এক শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদগুণী মুরাদ আলি খাঁ। মুরাদ আলীর সংগীতজীবন বাংলাদেশেই প্রায় অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুও হয় কলকাতায়। মুরাদ আলী কলকাতায় প্রথমে মেটিয়াবুরুজ দরবারের শিল্পী ছিলেন, সেখানে তাজ খাঁ নিযুক্ত হবার আগে। মুরাদ আলীও মেজাজের জন্যে মেটিয়াবুরুজের দরবার ছেড়েছিলেন এবং কলকাতাতেই তারপর শেষ পর্যন্ত থাকেন। তাছাড়া কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে তমলুকেও। কিশোরীলাল আহিরিটোলার বেনিয়াপুকুর স্ট্রীটের মুখোপাধ্যায় পরিবারের সন্তান হলেও আইন বৃত্তির জন্যে তমলুক নিবাসী ছিলেন।

তমলুকের সুপরিচিত উকিল কিশোরীলালের বাড়ি সেখানকার

একটি সংগীত-কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। সেখানে তাজ খাঁর ভাগিনেয় তসদ্দুক হোসেনও থাকেন কখনো কখনো। সেই সূত্রে তসদ্দুক হোসেনের মাতুল তাজ খাঁর বংশপরিচয় পাওয়া যায় কিশোরীলালের এক পুত্রের স্মৃতিকথায়।

সে বিবরণ উল্লেখ করবার আগে, ঈষৎ অবান্তর হলেও কিশোরী-লাল-পুত্রদের পরিচিতি দেওয়া দরকার। তাঁর পুত্রেরা সংগীত-জগতের নন, কিন্তু স্বদেশের মুক্তিসংগ্রামে এবং সাহিত্য-জগতে প্রসিদ্ধনামা। কিশোরীলালের তৃতীয় পুত্র ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম সংগঠন যুগান্তর দলের অন্যতম নেতা। স্মরণীয় বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম সহকর্মী তিনি। যাদুগোপালের 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' গ্রন্থেই তসদ্দুক হোসেন ও তাজ খাঁর প্রয়োজনীয় কিছু কথা পাওয়া যায়। যাদুগোপালের পরবর্তী অনুজ ক্ষীরোদগোপালও যুগান্তর দলের কর্মীরূপেই বর্মায় প্রেরিত হন, সেখান থেকে ভারতের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে সহায়তা করবার জন্যে। যাদুগোপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধনগোপালও বিপ্লবী সংগঠনের উদ্দেশে গৃহত্যাগ করে প্রথমে জাপান ও পরে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে ও স্বভাবের প্রেরণায় তিনি পরে আত্ম-প্রকাশ করেন সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে। সমগ্র গ্রন্থাবলী ইংরেজীতে রচনা করে আমেরিকা-প্রবাসী ধনগোপাল বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন।

ডাক্তার যাদুগোপাল তাঁর বিপ্লবী জীবনের স্মৃতিচারণে কিশোরী-লালের এবং তসদ্দুক হোসেন, তাজ খাঁ প্রমুখের যে উল্লেখ করেছেন এখানে তা উদ্ধৃত করা হল :

'সুবিখ্যাত গায়ক ভাগলপুরের বাবু সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি তমলুক এবং মেদিনীপুরে বাবার কাছে গান শিখতেন। অবশ্য তাঁর ওস্তাদ অন্য লোক ছিলেন।' কিশোরী-লালের তমলুকের বাড়িতে অনেকদিন ছিলেন 'তসদ্দুক হোসেন, তাজ খাঁ নামক তানসেন বংশের সুবিখ্যাত গায়কের ভাগ্নে।... নবাব

ওয়াজেদ আলির মেটিয়াবুরুজ দরবারের ওস্তাদদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বমান্য গায়ক তাজ খাঁ এঁদের মধ্যে ছিলেন। তিনি সভায় এলে অন্য গুণীরা 'ওস্তাদকা আওলাদ' (গুরুবংশ) বলে উঠে দাঁড়াতেন। নবাবের মৃত্যুর পর ইনি নেপাল দরবারে গায়ক হয়ে সেদেশে চলে যান। তসদিক হোসেনকে তিনি গান শিখিয়েছিলেন। এঁদের গানের ঢঙকে বলত 'সেনী ঘরানা।' (বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, পৃঃ ১৫৫-১৫৬, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়)।

যাদুগোপাল সঙ্গীত-জগতের মানুষ না হলেও এসব তথ্য পান তাঁর পিতা কিশোরীলালের কাছে। কিশোরীলাল যেমন তসদ্দুক হোসেনের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন, তেমনি মেটিয়াবুরুজের এক-কালীন দরবারী ধ্রুপদী মুরাদ আলী খাঁর শিষ্যও। তাছাড়া তাজ খাঁ ও কিশোরীলাল সমকালীন ব্যক্তি।

উনিশ শতকের শেষে তাজ খাঁর ভাগিনেয়-শিষ্য তসদ্দুক হোসেনের সঙ্গে কিশোরীলালের যোগাযোগ দেখা যায়। তার বেশ কয়েক বছর পরেও জীবিত ছিলেন তাজ খাঁ। এইসব কারণে তাজ খাঁর তানসেন-বংশধর হবার কথা কিশোরীলাল জেনেছিলেন তসদ্দুক হোসেনের কাছে ঘনিষ্ঠভাবে। এ সম্পর্কে তাজ খাঁর নেপাল-জীবনের কথায় আরো আলোচনা থাকবে।

তাজ খাঁ নিজেও বলতেন যে তিনি তানসেন-বংশীয়। যাদু-গোপালের বিবৃতির মধ্যে একটি তথ্য কেবল সঠিক নয়। 'নবাবের মৃত্যুর পর' নয়, নবাবের জীবিতকালেই নেপালে যান তাজ খাঁ। এ-জন্যে তাজ খাঁর একমাত্র বাঙালী শিষ্য বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত ধ... [illegible]

তমলুকেও। কি... [illegible] পূর্ব-বৃত্তান্ত।

মুখোপাধ্যায় পরিবারক্রজ ত্যাগ করবার পর নেপালের রাণা দরবারে নিবাসী ছিলেন। [illegible] র মেটিয়াবুরুজ দরবারে যোগ দেবার আগে

তমলুকের সুপরিচিত [illegible]

শোনা যায় লক্ষ্ণৌ থেকে তাজ খাঁ প্রথমে কলকাতায় এসেছিলেন। নবাব ওয়াজিদ আলীর জীবনের তা প্রায় শেষ দিকে। লক্ষ্ণৌতে তাজ খাঁ খুবই আর্থিক অনটনে দিন কাটাচ্ছিলেন। সেকথা শুনে ওয়াজিদ আলী তাঁকে আহ্বান করে আনেন মেটিয়াবুরুজে। তাঁকে দরবারে নিযুক্তও করেন। সেই অবস্থায়ও ওই শর্তে দরবারে যোগ দেন তাজ খাঁ। আবার মেজাজের জন্যে সেই লোভনীয় চাকুরিও এককথায় ছেড়ে চলে যান।

বামাচরণ যেদিন দরবারে তাঁর গান শোনেন, তার হয়তো তিন-চার বছর আগে মেটিয়াবুরুজে আসেন তাজ খাঁ। তার বেশী নয়। কারণ মেটিয়াবুরুজে অধিককাল থাকেননি তাজ খাঁ।

মেটিয়াবুরুজ দরবারে তাজ খাঁর যোগ দেয়ার ব্যাপারে আরেক রকমের কথাও শোনা গেছে। তিনি নাকি ভাগ্যান্বেষণে এসেছিলেন কলকাতায়। তখন ওয়াজিদ আলী খবর পেয়ে তাঁকে দরবারে আমন্ত্রণ জানান।

মোট কথা, মেটিয়াবুরুজে নিযুক্ত হবার আগে তাজ খাঁর জীবন কেটেছিল লক্ষ্ণৌতে। তবে সে সময়কার সবিশেষ তথ্য তাঁর সম্পর্কে পাওয়া যায় না। তাঁর বাল্যজীবনের কথা কিংবা পিতৃপিতামহের নামও অপ্রকাশিত আছে। জানা গেছে শুধু তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষার কথা।

লক্ষ্ণৌর হায়দার খাঁর তালিমে তাজ খাঁর সঙ্গীত-জীবন গঠিত হয়েছিল এই পর্যন্ত জানা যায়। হায়দার খাঁ ছিলেন তানসেনের পুত্র-বংশীয় এক দিকপাল কলাবত। তানসেনের যে পুত্রবংশে জাফর খাঁ প্যার খাঁ বাসৎ খাঁ ছিলেন, হায়দার খাঁও সেই ধারার। হায়দার খাঁ হলেন জাফর-প্যার-বাসতের কাকা জীবন খাঁর দ্বিতীয় পুত্র। হায়দার খাঁর দীর্ঘকালীন ও সুপরিচিত শিষ্য হলেন সাদিক আলি খাঁ। লক্ষ্ণৌতে সাদিক আলি আচার্যের সম্মানে বিদ্যমান ছিলেন শতাধিক বর্ষের আয়ু নিয়ে।

কেউ কেউ বলেন, তাজ খাঁ হলেন সাদিক আলীর শিষ্য। কিন্তু তা সঠিক কিনা বলা কঠিন। সাদিক আলী নামে দুজন বিখ্যাত কলাকার ছিলেন। একজন তো লক্ষ্ণৌ-নিবাসী এবং হায়দার খাঁর শিষ্য। অন্যজনও তানসেন বংশেরই স্বনামধন্য রবাবী-বীণকার। তিনি জাফর খাঁর পুত্র এবং কাশী-নরেশ দরবারে বহুদিন নিযুক্ত থাকেন। এমনও হওয়া সম্ভব যে, তাজ খাঁ উক্ত দুজনেরই শিষ্য। কারণ বারাণসী-নিবাসী সাদিক আলী এবং লক্ষ্ণৌর হায়দার দুজনেই তানসেনের বংশধর ও জ্ঞাতিভাই।

তাজ খাঁর পিতার কথাও তালিমের বিষয়ে অজ্ঞাত আছে। তাজ খাঁর প্রথম জীবন সম্বন্ধে এই সব তথ্য উদ্ধার হয়নি এ যাবৎ। শুধু এইমাত্র জানা যায় যে তাজ খাঁ প্রথম জীবনে লক্ষ্ণৌ-নিবাসী ছিলেন।

তাজ খাঁ ধ্রুপদ গানেও অভিজ্ঞ ছিলেন অবশ্যই। কিন্তু খেয়ালের কলাবৎরূপে তাঁর পরিচয় মেটিয়াবুরুজ ও নেপাল এই দুই দরবারেই পাওয়া যায়। বামাচরণকে তিনি খেয়াল অঙ্গে তালিম দেন একথাও সন্দেহাতীত।

তাজ খাঁর খেয়াল গানের কথা বিশেষ উল্লেখের কারণ এই যে—তানসেনের পুত্রবংশে কখনো খেয়াল চর্চা হয়নি বলে প্রসিদ্ধি আছে। তাঁর পুত্রবংশীয়রা আসরেও ধ্রুপদ গেয়েছেন। খেয়াল নয়। তানসেনের কন্যাবংশে প্রথম খেয়াল চর্চা আরম্ভ করেন সদারঙ্গ। কিন্তু তিনিও দরবারে খেয়াল গাইতেন না। কোন কোন শিষ্যকে তালিম দেন কেবল। তবে ঘরে খেয়ালের যথেষ্ট চর্চা করেন এবং খেয়াল গান রচনাও করেছিলেন সদারঙ্গ।

কিন্তু তাজ খাঁ ভিন্ন তানসেনের পুত্রবংশে আর কোন গুণী প্রকাশ্য আসরে বা দরবারে খেয়াল শোনাননি। এই সূত্র ধরে কোন সমালোচক এমন অভিযোগও করতে পারেন যে তাজ খাঁ তানসেনের বংশধর নন।

সেনীয়া তাজ খাঁর খেয়াল গানের চর্চা বাস্তবিকই এক গুরুত্বপূর্ণ

প্রশ্ন। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রমাণ বাস্তব সত্য। তাজ খাঁ আসরে দরবারে খেয়াল গাইতেন একথাও যেমন সত্য, তেমনি তাঁর জন্মও হয়েছিল তানসেনের বংশে। এ বিষয়ে একটি নজির আগেই দেওয়া হয়েছে। পরেও আলোচনা করা হবে নেপাল দরবারের কথায়।

তবে এখানে একটি কথাও উল্লেখ্য। তাজ খাঁ যে তানসেনের কোন্ পুত্রের উত্তরপুরুষ সেকথা এবং তাজ খাঁর ঊর্ধ্বতন পর্যায়ের বিবরণী জানা যায় না। বড়কু মিঞা, মহম্মদ আলীরা যেমন বিলাস খাঁর বংশধর বলে পরিচিত, তাজ খাঁ সম্পর্কে তেমন তথ্য অপ্রাপ্য। জয়পুর-নিবাসী অমৃতসেন প্রমুখ তানসেন বংশধরদের কয়েক পুরুষের নাম পাওয়া যায়। তাজ খাঁর বিষয়ে তাও অজ্ঞাত। তানসেনের সব পুত্রদের বংশতালিকা এযাবৎ উদ্ধার হয়নি। তাজ খাঁর পূর্বপুরুষদের বৃত্তান্তও তার অন্যতম।

লক্ষ্ণৌতে তাজ খাঁ পরিণত যৌবনকাল পর্যন্ত ছিলেন। তার মধ্যে একবার কাশী-নরেশের দরবারে যোগ দেন বটে, কিন্তু সে বেশী দিনের জন্যে নয়। কলকাতায় আসবার আগে লক্ষ্ণৌতেই তিনি বরাবর বাস করেন। তবে লক্ষ্ণৌতে তাঁর বাসের শেষ পর্ব ছিল অতি কষ্টের।

যতদূর জানা যায়, তাজ খাঁর পেশাদার সঙ্গীত-জীবনের শুরু হয় নবাব ওয়াজিদ আলির লক্ষ্ণৌ দরবার ভেঙে যাবার পরে। দরবারী দাক্ষিণ্য তিনি লক্ষ্ণৌতে কোনদিন পাননি। অন্য আনুকূল্যও লাভ করতে পারেননি সেখানকার সঙ্গীত-জীবনে। অথচ লক্ষ্ণৌ-জীবনের অন্তত শেষ দিকে তিনি বিবাহিত ছিলেন; সন্তানও জন্মেছিল। কারণ মেটিয়াবুরুজে তিনি আসেন প্রৌঢ় বয়সে। মেটিয়াবুরুজের ওস্তাদ মহল্লায় তাজ খাঁ একক জীবন যাপন করতেন। কিন্তু নেপালে তাঁর সংসারযাত্রা ছিল দুই পুত্র, এক কন্যা ও পত্নীকে নিয়ে। সেই সংসার-জীবন তাজ খাঁর লক্ষ্ণৌতেই আরম্ভ হয়েছিল।

এমন গুণী হয়েও তাজ খাঁর অতি দুর্দিন ছিল লক্ষ্ণৌতে। নবাব-

দরবারে থাকলে হয়তো তিনি স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতেন। কিন্তু সঙ্গীতের পীঠস্থান লক্ষ্ণৌতে, যে কারণেই হোক, তাজ খাঁ ব্যর্থ ছিলেন পেশাদার জীবনে। আর সেকালের অনেক কলাবতের মতন ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় উপস্থিত হন। হয়তো নবাবের মেটিয়াবুরুজ দরবারের-আশাতেও আসতে পারেন কলকাতায়। সে বিষয়ে সঠিক জানা যায় না।

লক্ষ্ণৌতে অতি দুর্গতির অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তাজ খাঁ অমন সর্ত করেছিলেন মেটিয়াবুরুজ দরবারে। তাঁর তখনকার মেজাজ ওই রকমই ছিল। কিংবা হয়তো বলা যায়, শিল্পী-চিত্তের এক অদ্ভুত খেয়াল অথবা শিল্পীজনোচিত আত্মমর্যাদাবোধেরই আতিশয্য। আর লক্ষ্ণৌতে অত অর্থকষ্ট ভোগ করলেও মেটিয়াবুরুজে সর্বস্ব ব্যয় করে ফেলতেন। এও এক আশ্চর্য স্বভাব তাঁর। লেশমাত্র সঞ্চয়ের দায়িত্বজ্ঞান তাঁর জীবনের এই পর্বে দেখা যায়নি।

কিন্তু নেপাল বাসের সময় তাজ খাঁর স্বভাবের বিলক্ষণ পরিবর্তন ঘটে যায়। হয়তো বয়সের অভিজ্ঞতায়। কিংবা সংসারী-জীবনের প্রভাবে। নেপাল দরবারে তিনি যেমন প্রচুর উপার্জন করতেন তেমনি সঞ্চয়ও। সে যেন আর এক তাজ খাঁ।

নেপাল দরবারের সঙ্গে তাঁর কিভাবে যোগাযোগ ঘটে, কোন্ সময় তিনি নেপালে যান, সে বিবরণ জানা যায়নি। কলকাতায় বামাচরণ তাঁর সন্ধান করবার সময় হঠাৎ শোনেন, তিনি এখন নেপাল-প্রবাসী।

তাজ খাঁ সম্ভবত ১৮৯০ সালের কিছু আগে নেপালে গিয়েছিলেন ও সেখানকার সঙ্গীত দরবারে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

রাজনৈতিক হিসেবে বিদেশ হলেও নিকটতম প্রতিবেশী রাজ্য নেপাল আত্মিক ও ধর্ম-সংস্কৃতির সূত্রে ভারতের প্রায় অঙ্গাঙ্গী। তেমনি সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও। ভারতীয় সঙ্গীতের নানা ধারা সেখানে বহুকাল থেকে প্রচলিত আছে। আর আঠারো শতক থেকে নেপালে

ভারতীয় পেশাদার কলাবতদের যাতায়াত। পরে নেপালের রাজ-দরবার—বিশেষ রাণা-দরবার—হিন্দুস্থানের গুণীদের নিয়েই গড়ে ওঠে। আর সমৃদ্ধি লাভ করে একটি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-দরবার বলে।

তাজ খাঁ যখন নেপালে উপস্থিত হলেন তখন রাজার দরবার ও প্রধানমন্ত্রী রাণার দরবারে ভারতীয় কলাবতদের বিশেষ সমাদর।

সেকালের নেপালে রাজার চেয়ে মন্ত্রীর কর্তৃত্ব ছিল বেশী। রাষ্ট্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে আসল ক্ষমতা নেপাল মহারাজার নয়, প্রধান-মন্ত্রী রাণার হাতেই থাকত। তেমনি সঙ্গীত-দরবারও গোর্খালী রাজার চেয়ে রাণাদেরই ছিল বৃহত্তর। নানা বিখ্যাত কলাবতদের অবস্থান সেখানে হত। গুণে এবং পরিমাণে রাণা-দরবারেরই সঙ্গীত-চর্চার বেশী প্রসিদ্ধি।

তাজ খাঁ যে সময়ে নেপালে আসেন তখন প্রধানমন্ত্রী রাণা বীর শমসেরের আমল।

বিশ্বরাষ্ট্রনীতিতে ঘুমন্ত রাজ্য নেপাল। কিন্তু মুখরিত তার সঙ্গীত-দরবার। বিশেষ প্রধানমন্ত্রী বীর শমসেরের দরবার। তিনি সঙ্গীতের শুধু দরাজ পৃষ্ঠপোষক নন।' নিজেও সঙ্গীতজ্ঞ। উনিশ শতকের সেই শেষ দিকেই ছিল রাণা সঙ্গীত-দরবারের সবচেয়ে গৌরবের যুগ। ঠিক সেই সময়েই তাজ খাঁ নেপালে এসেছিলেন। আর নিজ গুণে শোভা পান দরবারের এক উজ্জ্বল রত্ন হয়ে।

তাজ খাঁর অনেক আগে থেকে নেপালে আসেন ছুন্দে খাঁ। নবাব ওয়াজেদ আলির এক শ্যালক তিনি। তাঁর সঙ্গে নবাবের সেই গায়িকা-বেগম রাজিয়াও নেপালে এসেছিলেন। তাঁরা প্রথমে অনেক বছর নেপালের পশ্চিমাংশে ভূতোলে ছিলেন। তারপর ছুন্দে খাঁ যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী রাণা বীর সমশেরের সঙ্গীত-দরবারে।

তাজ খাঁর যেমন নেপালে মৃত্যু হয়, তেমনি ছুন্দে খাঁরও। তাঁদের দুজনেরই কবর আছে স্বয়ম্ভুতে। নেপাল রাজ্যে এই বোধ-

হয় প্রথম গোরস্থান। তার আগে কোন মুসলমানের নেপালে আমৃত্যু কিংবা স্থায়ী বাস ছিল না।

ভারতের এই সব মুসলমান কলাবতদের জন্যে রাণারা প্রথম মসজিদও তৈরী করে দেন নেপালে। তার আগে এ রাজ্যে কোন মসজিদ দেখা যায়নি।

তাজ খাঁ যখন নেপালে এলেন তখনো দরবারে ছিলেন অশীতি-পর কলাবত লছমনদাস। তানসেনের মাতুল গদাধর মিশ্রের বংশধর তিনি এবং অতিগুণী খেয়াল-গায়ক। লছমনদাস বার্ধক্যের জন্যে দরবারে আর অনুষ্ঠান করতেন না। কিন্তু সঙ্গীতে অক্ষম হননি একেবারে। তাজ খাঁর সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সঙ্গীত-প্রবীণ লছমনদাসকে যথেষ্ট মান্য করতেন তাজ খাঁ।

লছমনদাস ও তাজ খাঁ ভিন্ন ভারতের আরো নানা গুণী তাজ খাঁর সময় নেপালে ছিলেন। তাঁরাও তাজ খাঁর তুল্য দরবারী শিল্পী হয়েই থাকেন এ রাজ্যে। যেমন—বেরিলীর বিখ্যাত টপ-খেয়াল ও খেয়াল-গায়ক এনায়েৎ হোসেন খাঁ (ইনি গোয়ালিয়ারের বিখ্যাত হদ্দু খাঁর জামাতা এবং ভারতে টপ-খেয়াল গানের প্রচারক বলে প্রসিদ্ধ)। বারাণসীর রামসেবক মিশ্র (বিখ্যাত প্রসদ্দুর পুত্র ও শিব, পশুপতির পিতা)। জয়পুরের খেয়াল-গুণী ঘগ্‌গে নাজির খাঁ। নিয়ামৎউল্লা খাঁ শরদী (করামৎউল্লা ও কৌকবের পিতা)। বারাণসীর তবলা-গুণী বলদেও সহায়। তানসেনের পুত্রবংশীয় স্বনামধন্য বড়কু মিঞা, বারাণসীর বহুমুখী সঙ্গীতপ্রতিভা জগদীপ মিশ্র (খেয়াল টপ্পা ঠুংরি গায়ক ও নৃত্যশিল্পী)। দাক্ষি-ণাত্যের বীণাবাদক বীণকার ভট্ট প্রভৃতি। আর তাঁদের সকলের মুকুটমণি অতিবৃদ্ধ লছমনদাস তখনো দরবারের বৃত্তিভোগী হয়ে বিরাজমান। সেই রত্নসভায় আর একটি মণি হলেন তাজ খাঁ।

দরবারে গুণপনা দেখিয়ে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা পেলেন তাজ খাঁ।

এখানেও তিনি ধ্রুপদ ধামারের সঙ্গে খেয়াল গানেরও গুণী হয়ে দেখা দেন। রাণা বীর সমশেরের একজন অতিপ্রিয় কলাবত হন তিনি।

এইভাবে তাজ খাঁ নেপালের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি ছিলেন নেপালবাসী। আর লছমনদাস দরবারী-জীবন থেকে অবসর নিলে তাজ খাঁই দরবারের মধ্যমণি হয়ে থাকেন।

দরবার থেকে শুধু মাহিয়ানা পেতেন না তিনি। কিছু ভূসম্পত্তিও লাভ করেছিলেন। তা ছাড়া দরবারে গানের জন্যে আলাদা পুরস্কারও পেতেন মাঝে মাঝে। দরবার-পতির ভাল লাগার জন্যে এক-একদিনের মেজাজী বখশিশ। এমনিভাবে তাজ খাঁর নেপালে ভাল উপার্জন হত।

তিনি সপরিবারে বাস করতেন এ রাজ্যে। আর এখানে তাঁর আগেকার সেই ব্যয়বহুল স্বভাব প্রকাশ পায়নি। সঞ্চয় করেছিলেন তিনি, পরিবার প্রতিপালন করেও।

তাজ খাঁর দুই পুত্র জাকির হোসেন ও আবেদ হোসেন। তাঁদের দুজনকেই নেপালে তিনি রীতিমত সঙ্গীত-শিক্ষা দেন। বিশেষ করে জাকির হোসেন ভাল খেয়াল-গায়ক হয়েছিলেন।

কিন্তু দুজনের কেউই সঙ্গীত-জীবন অবলম্বন করেননি কখনো। পিতার সঞ্চিত অর্থ ও বিষয় ভোগ করে গেছেন। উপার্জনের প্রয়োজন না থাকায় সঙ্গীত-চর্চায় নিবিষ্ট হননি তাঁরা।

তাজ খাঁ নেপালে আরো কজনকে তালিম দিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন—যুক্ত প্রদেশের দেওয়াসের দু ভাই আমীর খাঁ ও নাজির খাঁ (তাজ খাঁর সুপারিশে এঁরা দুজন নেপাল দরবারে চাকুরীও পান), বান্দার সিতাব খাঁ, বদায়ুনের হায়দার খাঁ (এঁর পৌত্র নিসার হোসেন বর্তমানে তরানা গানের বিখ্যাত কলাবত) প্রভৃতি।

আর কয়েকজন শিষ্যাও তাঁর হন নেপাল দরবারে। তাঁরা

নেপালী দরবারের: বিশেষ ধরনের নটী। তাঁদের পরিচয় 'তালিমে' নামে।

তালিমেরা দরবারপতির সঙ্গীতপটিয়সী রক্ষিতা। কিন্তু উত্তর-ভারতীয় বাইজীদের সঙ্গে তাঁদের প্রভেদ এই যে, তালিমেরা অন্যান্য আসরে মুজরো নিয়ে গান করেন না। দরবারে নিযুক্ত কলাবতদের কাছে তাঁরা রীতিমত শেখেন কণ্ঠসঙ্গীত বা যন্ত্রসঙ্গীত। তারপর দরবারেই সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

এই কলাবতীদেরও দরবারের বাইরে কোন সঙ্গীত-জীবন নেই নেপালে। সেজন্যে রীতিমত গুণশালিনী হলেও তালিমেদের পরিচয় প্রকাশ্য সঙ্গীত-জগতে অজ্ঞাত থেকে যায়। দরবারের অন্তরালে হারিয়ে যায় তালিমেদের সঙ্গীত-প্রতিভা।

যেমন, অসামান্য কলাবতী গায়িকা বড়ী হসন। লছমনদাসের শিক্ষায় ধ্রুপদ ও প্রবন্ধসঙ্গীতে বড়ী হসন ছিলেন একটি প্রতিভা।

এমনি চার-পাঁচজন তালিমে তাজ খাঁর কাছে গান শিখেছিলেন। তাঁরা সকলেই রাণা বীর সমশেরের দরবারভুক্তা। তাজ খাঁর সেই শিষ্যাদের মধ্যে সবচেয়ে কলাবতী খেয়াল-গায়িকা হন ছোটী হসন। বড়ী হসনের বয়োকনিষ্ঠা বলেই তাঁর ছোটী নামকরণ। আর অতি রূপবতী বলে হসন পরী নামেও তাঁর পরিচিতি ছিল। হসন পরীর কথাও বাইরের সঙ্গীত-জগৎ জানে না, বড়ী হসনের মতন।

নেপাল দরবারে তাজ খাঁর জীবন সুখে-স্বচ্ছন্দে পূর্ণ হয়েছিল। সঙ্গীত-জীবনের এই শেষ অধ্যায়ে তিনি লাভ করেন যশ, সম্মান, প্রতিপত্তি, আর্থিক নিরাপত্তা—সবই।

লছমনদাসের অবসর নেয়ার পর তাজ খাঁ-ই নেপাল দরবারের সর্বমান্য গুণী হয়েছিলেন। নেপালে তাঁর সেই সম্মান বজায় থাকে জীবনের শেষ পর্যন্ত।

উনিশ শতকের একেবারে শেষে বীর সমশের নেপালে এক বিরাট সঙ্গীত-সম্মেলন করেছিলেন। তরাই অঞ্চলে বীরগঞ্জের কাছে বগড়ি

নামে একটি জায়গায় তার অধিবেশন হয় এক মাস ব্যাপী। দরবারে নিযুক্ত গুণীরা ভিন্ন ভারতের আরো নানা শ্রেষ্ঠ কলাবত সেখানে আমন্ত্রিত হয়ে যোগ দেন। সঙ্গীত-অনুষ্ঠানের সঙ্গে ঔপপত্তিক বিষয়েও নানা আলোচনা ও মতামত বিনিময় হয় বগড়ির সম্মেলনে। তার ভিত্তিতে রাগগুলির বর্গীয়করণও নতুন করে হয়েছিল। এই সমস্ত বিষয়েই তাজ খাঁর ছিল একটি প্রধান ভূমিকা।

নেপালে তাজ খাঁর আরো পারিবারিক কথা জানা যায়। যেমন তাঁর একমাত্র কন্যার বিবাহ প্রসঙ্গ। নেপালেই এই নিকা হয়েছিল।

তাজ খাঁর সময়ে ছিলেন শরদী নিয়ামতুল্লা খাঁ। ভারতের প্রথম শরদ-বাদকদের মধ্যে একজন তিনি বিশিষ্ট। নিয়ামৎ এবং তাঁর দুই যোগ্য পুত্র করামৎউল্লা ও কৌকব খাঁ শরদ-বাদনের একটি ধারা প্রবর্তনের জন্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

নিয়ামতুল্লা খাঁ মেটিয়াবুরুজ দরবারেও নিযুক্ত থাকেন, তবে তাজ খাঁর কিছু বছর আগে। সে সময় তানসেনের পুত্রবংশীয় রবাবী-ধ্রুপদী বাসৎ খাঁও মেটিয়াবুরুজ দরবারে ছিলেন। আর তাঁর কাছে মেটিয়াবুরুজেই তালিম পেয়েছিলেন নিয়ামতুল্লা খাঁ।

মেটিয়াবুরুজ দরবার থেকে নিয়ামতুল্লা নেপাল দরবারে যোগ দেন। জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত (অন্তত দশ বছর) তিনি সপরিবারে নেপালে থাকেন। ১৮৯৯ সালে দিল্লীতে মৃত্যুর কিছুকাল আগেও। নেপাল দরবারের শিল্পী নিয়ামতুল্লাও সসম্মানে সেখানে অবস্থান করতেন। তাঁর দুই কৃতী পুত্রও উপযুক্ত হন নেপালে। নিয়ামতুল্লাও তাজ খাঁর মতন নেপাল দরবার থেকে ভাল উপার্জন ও বিষয়-সম্পত্তি করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রথম থেকেই ঘনিষ্ঠতা হয় তাজ খাঁর। পরে তা স্থায়ী আত্মীয়তায় পরিণত হয়েছিল।

নিয়ামতুল্লার নেপাল বাসের প্রায় শেষ দিকে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র কৌকব খাঁ বিপত্নীক হলেন। কৌকব খাঁর বয়স তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ

বছর। একটি বছরখানেকের কন্যা মাত্র বর্তমান। কৌকব তখনই উদীয়মান শরদী। আর শুধু প্রতিভাবান যন্ত্রী নন, শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ।

তাঁকে উপযুক্ত পাত্র হিসেবে তাজ খাঁ আপন কন্যার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করলেন নিয়ামতুল্লার কাছে। এ-ব্যাপারে নিয়ামতুল্লা বিবেচনা করেছিলেন তাজ খাঁর বংশ-পরিচয়। অর্থাৎ শুধু তাজ খাঁর তুল্য গুণীর সন্তান নয়। তানসেন বংশীয় বলে, সে কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দেন নিয়ামতুল্লা। তাজ খাঁ যে সঙ্গীত-জগতের মহাপুরুষ তানসেনের এক বংশধর সে-কথা নিয়ামতুল্লা বিলক্ষণ জানতেন। দুই বৈবাহিকই তখন নেপাল দরবারের নিযুক্ত শিল্পী আর পরস্পরের সুপরিচিত।

নিয়ামতুল্লার মৃত্যুর কিছু পরে করামৎ ও কৌকব খাঁ সস্ত্রীক ভারতে চলে আসেন। তারপর কৌকব খাঁর ১৯১৫ সালে মৃত্যু হয় কলকাতায়। বৈধব্যের অনেক বছর পরেও তাজ খাঁর কন্যা বাস করেন মেটিয়াবুরুজে। তাঁদের তিন পুত্র অর্থাৎ তাজ খাঁর দৌহিত্র— ওয়ালিউল্লা, সোনাউল্লা ও বাবু। তিনজনের মধ্যে সোনাউল্লা ভিন্ন অপর দুজনই সেতারবাদক হয়েছিলেন। বিশেষ ওয়ালিউল্লা হন কৃতী সেতারী।

ওদিকে নেপালে তাজ খাঁর মৃত্যু হয় বিশ শতকের প্রথম দিকে।

তারপর তাঁর দুই পুত্র জাকির হোসেন ও আবেদ হোসেন উত্তর ভারতের রামপুর রাজ্যে বাস করতে থাকেন। পিতার কাছে তালিম পেলেও গায়কের বৃত্তি গ্রহণ করেননি তাঁরা।

তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ জাকির হোসেন ১৯৬০ সালের পরে গতায়ু হন অতি বৃদ্ধ বয়সে। তাঁর পুত্র অর্থাৎ তাজ খাঁর একমাত্র পৌত্র একবাল এখনো রামপুরে বর্তমান আছেন। কিন্তু তিনিও সঙ্গীত-জীবনে নেই।

তাজ খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আবেদ হোসেনের মৃত্যু হয় নিঃসন্তান

অবস্থায়। এইভাবে তাজ খাঁর পুত্রের ধারায় সঙ্গীতচর্চা লুপ্ত হয়ে যায়।…

কিন্তু তাজ খাঁর নাম প্রসিদ্ধি যথেষ্ট থাকে নেপালের সঙ্গীত-সমাজে। দরবারের আসরে আসরে তাঁর নানা দিনের গানের প্রসঙ্গ শোনা যায়। তাজ খাঁর দরবারী সঙ্গীতচর্চার অন্তরঙ্গ সব কাহিনী। আলোচনার বিষয় হয় দরবারে তাঁর মধুর সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্বের কথা।

যেমন, একদিন গান হচ্ছে দরবারে। জয়পুরের প্রসিদ্ধ খেয়ালীয়া ঘগ্‌গে নাজির খাঁ গাইছেন। দরবারের প্রধান কলাবত তাজ খাঁ প্রমুখ আরো গায়ক-বাদক আছেন শ্রোতাদের মধ্যে।

নাজির খাঁ গানখানি ভাল গাইলেন বটে, তবে তান বিস্তার যথেষ্ট করলেন না। বিস্তারের কাজ দেখাবার উপযুক্ত হয়েও শোনালেন ছোট খেয়াল।

গান শেষ হতেই তাজ খাঁ গায়কের দিকে চেয়ে মন্তব্য করলেন, 'ইয়ে ত চাটনি হ্যায়।'

নাজির খাঁ ঠিক বুঝতে পারলেন না তাজ খাঁর একথা বলার উদ্দেশ্য। জিজ্ঞেস করলেন, 'মতলব?'

তাজ খাঁ ব্যাখ্যা করে দিলেন, 'থোড়া থোড়া মিঠা চীজ। লেকিন পেট ভরা নেহি।'

তখন নাজির খাঁ ফিরতি গান ধরলেন বড় করে। এবার বেশ খানিকক্ষণ ধরে তান বিস্তার যোগে গানটি গাইলেন।

তাজ খাঁর এবার ভাবান্তর। গান শেষ হতে দরাজ গলায় সাবাস জানালেন—'বহোৎ আচ্ছা।'

নাজির খাঁ কৃত্রিম অহঙ্কার দেখিয়ে বললেন, 'তব্‌?' (অর্থাৎ আমি কি গাইতে পারি না? অমন মন্তব্য করেছিলে কেন?)

'হম্‌ চাটনি নেহি বোলনেসে অ্যায়সা গানা হোতা?'

তখন দুজনেই হাসতে লাগলেন। আর সে হাসিতে যোগ দিলেন দরবারের অনেকেই।

রাণা বীর সমশেরের তৈরী লাল দরবারের আসর এটি। সেই লাল দরবারের জলসাঘরে তাজ খাঁর অনেক দিনের শ্রুতি-স্মৃতি জীবন্ত ছিল।

কিন্তু ভারতের সন্তান তাজ খাঁ বিস্মৃত থাকেন স্বদেশেই। তিনিও যে তানসেনের একজন যোগ্য বংশধর সে পরিচয় লুপ্ত হয়ে যায়।

সুরের সঙ্গতীয়া সারঙ্গী

গৌরীশঙ্কর মিশ্র

সুর কি সুন্দর সঞ্চরণ করে চলেছে। কি স্বচ্ছন্দ সাবলীল বিস্তার এই সারঙ্গ যন্ত্রে। মূল তারের বাজনার সঙ্গে ভ্রমর গুঞ্জরণ করছে তরফের সারি সারি তার। ছড়ের টানে আর আঙুলের ঘর্ষণে টানা টানা সুরঝঙ্কার তুলছে। সেই সঙ্গে ছত্রিশটি তরফের তারে প্রতিধ্বনির পালা। সারঙ্গীর সুরতরঙ্গে ভরে উঠেছে আসর।

গানের সঙ্গে সারঙ্গের শিঞ্জন একাত্ম হয়ে মিশে আছে। কণ্ঠ-শিল্পীর সঙ্গীতে অঙ্গাঙ্গী মিলে গেছে সারঙ্গীর সুরবিহার। তাল-লয়ের ছন্দকর্মে সঙ্গতকার যেমন তবলিয়া, সুরের ধারারক্ষী সহযোগী তেমনি সারঙ্গ-বাদক। গানের শুধু অনুসারী নন তিনি, সব যতি আর ছেদকে ভরে দিয়ে সুররণনে পরিপূর্ণ করে দিচ্ছেন।

কিন্তু অপরের সামনে থেকেও সারঙ্গী যেন নেপথ্যচারী। অথচ বাইজীর পাশে বসেই সুরে সঙ্গত করছেন তিনি। কখনো গীত-শিল্পীর দু-দিকেই দুজন সারঙ্গ-বাদক বাজিয়ে চলেন। বাইজীর গানের আসর তো সারঙ্গী বিনা অঙ্গহীন। বাইজীর খেয়াল টপ্পা ঠুংরির সঙ্গে সারঙ্গের সুর অপরিহার্য। তেমনি খেয়াল-গায়কের আসরেও।

তবু, এমন সুরের ভাণ্ডারী সারঙ্গ-বাদকেরও যেন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। তাঁর জন্যে যোগ্য মর্যাদা আর ধারণাও দেখা যায় না শ্রোতাদের মনে। গানের আসরে সারঙ্গী যেন উপেক্ষিত, গুণীর উপযুক্ত সম্মান স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত।

অথচ বিনা সারঙ্গে বাইজীর গান অপূর্ণ। গানের সঙ্গে সারঙ্গ যন্ত্রের সুরধারা নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমান। বিরাম নেই সারঙ্গের সুর-

লহরীতে। কণ্ঠের সাময়িক বিরতি থাকে। গায়িকা বা গায়ক বিশ্রাম নেন ইচ্ছা মতন। তানকারীর পর সমে এসেই তিনি নীরব হতে পারেন। পরে আবার গানের মুখ কিংবা নতুন বিস্তার ধরেন সুবিধা অনুযায়ী।

কিন্তু সারঙ্গ-বাদক মূল শিল্পীর ধারা অব্যাহত রেখে দেন। গানের প্রথম কলির মুখটি তাঁর যন্ত্রে অনুরণিত রাখেন কণ্ঠেরই হুবহু অনুকরণে। তিনি শুধু ধারাবাহক নন: কখনো আভাস দিয়ে চলেন নব নব সৌন্দর্যসৃষ্টির। কারণ সারঙ্গী নিজেই দস্তুরমত কলাকার। রাগ-সঙ্গীতের সিদ্ধ শিল্পী। তাঁদের অনেকে গান গাইতেও পটু, যদিও আসরে তার পরিচয় দেন না। বাইজী কিংবা খেয়ালীয়া যে গান শোনাচ্ছেন সেটি তাঁরও হয়তো সুজ্ঞাত। অভিজ্ঞতায়, পেশার প্রয়োজনে, অন্তরের প্রেরণাতেও সারঙ্গ-বাদকের গানের সঞ্চয় বিপুল। নচেৎ আসরের সফল শিল্পী হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। যন্ত্রে স্বয়ং রাগ রূপায়ণেও সুদক্ষ তিনি। কণ্ঠশিল্পীর যাবতীয় কারুকর্ম নিপুণভাবে প্রদর্শন করছেন। গানের অবকাশে কখনো যন্ত্রে দেখাচ্ছেন নতুন কোন তানকারী। আবার মূল শিল্পীর যে-কোন তান বা বিস্তারে রীতিমত সঙ্গত করেন। বাজিয়ে দেন তৎক্ষণাৎ। এমন কি গায়িকা বা গায়কের আবেগ পর্যন্ত ফুটিয়ে তোলেন ছড়ের টানে, আঙুলের কায়দায়।

আর এই যন্ত্রে সুরের কি রেশ! পুনর্ধ্বনির কি ঐশ্বর্য! মূল তারে তারে স্বর-পরিধি যেমন বিস্তৃত, তেমনি ছত্রিশ তরফে অনুরূপ সমারোহ। তিনটি তাঁতে সঞ্চরমান কুশলী অঙ্গুলী আর ছড়ের স্পর্শ। তারই অনুধ্বনিতে ছত্রিশটি তারের ঝঙ্কার। সুরের যন্ত্র হিসেবে অতিশয় উপযোগী, অত্যুন্নত সারঙ্গ। প্রাচীন ভারতীয় যন্ত্রের এক বিকশিত, অভিনব রূপ। বীণা বৈচিত্র্যের অন্যতম প্রকারভেদ।

সেই সুরযন্ত্রের কাণ্ডারী সারঙ্গী। কিন্তু প্রতিভার যথোচিত

মান্যতা অনেক সময় তিনি পাননি। সেকালের এমনি কত গুণী হারিয়ে গেছেন অপরিচিতির অন্তরালে। অনেকের নাম পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছে পরবর্তী যুগ।

অতি কৃতী সারঙ্গী শুধু সহযোগীও নন; গানকে প্রাণবন্ত, অবিশ্রান্ত রাখবার যন্ত্রী নন কেবল; অনেক সময় আরো বড় ভূমিকায় তাঁকে দেখা যায়। তখন তিনি আসরের নায়ক, মূল শিল্পী। স্বতন্ত্র কলাকার। তবলচী থাকেন তাঁর তাল লয়ের সঙ্গতে। তবে তেমন দৃষ্টান্ত বেশি নয়। বেশির ভাগ সারঙ্গ-বাদকই সুরের সঙ্গতকার। সেই রূপেই তাঁদের পরিচয়।

হয়তো তার নেপথ্যে থেকে গেছে সারঙ্গীর আরেক মহৎ পরিচিতি। যে বাইজীর সহযোগী যন্ত্রী হয়ে আসরে বসেছেন, হয়তো তাঁরই ওস্তাদ তিনি। তাঁর শিক্ষাতেই বাইজী প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তিনিই প্রস্তুত করে দিয়েছেন গায়িকাকে। গানের সঞ্চয় দান করেছেন। আসরে বাইজীর মুগ্ধ শ্রোতারা উচ্ছ্বাস জানিয়েছেন সেই গানে। গায়িকার শিক্ষক সঙ্গতীয়া সামনেই রয়েছেন—প্রশংসামুখর শ্রোতাদের কাছে পরিচয়হীন।

অনেক সময় সারঙ্গীর নাম পর্যন্ত আসরে অজানা থেকে যায়। শ্রোতাদের আগ্রহ নেই যন্ত্রীর দিকে। তাঁর শিক্ষকতার জীবন তো আরো অন্তরালবর্তী। তা শুধু চোখের আড়ালে নয়, জ্ঞানেরও বাইরে। সঙ্গীত-জগতের শ্রুতি স্মৃতিতেও তিনি লুপ্তকীর্তি।

তেমনি ওস্তাদ গৌরীশঙ্কর মিশ্র কিংবা কালী ওস্তাদের নামও সুপরিচিত নয়। সঙ্গীত-জগতেও জীবন্ত নেই তাঁদের স্মরণ।

অথচ নিখিল ভারতের নিরিখেও তাঁরা প্রথম সারির কলাকার সারঙ্গ-বাদক। সেকালের শ্রেষ্ঠা গায়িকাদের মধ্যে দুজন—শ্বেতাঙ্গিনী ও কৃষ্ণভামিনী তাঁদেরই ছাত্রী। দুই ওস্তাদের শিক্ষাতেই গায়িকাদ্বয়ের সঙ্গীত-জীবন গড়ে উঠেছে। শুধু তালিম দেয়াও নয়। শ্বেতাঙ্গিনী ও কৃষ্ণভামিনীর গানের আসরে দুদিকে সারঙ্গী হয়ে

বসেছেন গৌরীশঙ্কর ও কালীপ্রসাদ। আসরে আসরে শ্রোতারা সেই রূপে ওস্তাদ দুজনকে দেখেছেন। কিন্তু কজন জেনেছেন তাঁদের শিক্ষক-পরিচয় ?

সেকালের এক আচার্য-স্থানীয় গুণী গৌরীশঙ্কর মিশ্র। আদর্শ শিক্ষক। অতি-সফল, পরম নির্ভর সহযোগী বাদক। একক আসরে সার্থক, স্বতন্ত্র যন্ত্রশিল্পীও।

সঙ্গতকার হিসেবে তিনি গায়ন-শিল্পীকে উদ্বুদ্ধও করতেন। আবার মূল কলাকাররূপে গুণপনা দেখিয়েছেন প্রথম শ্রেণীর আসরে। কলকাতায়, কাশীতে, দিল্লীতে।

রাগবিদ্যায়, বাদননৈপুণ্যে, শিক্ষকতায় গৌরীশঙ্করের প্রতিভা সমানভাবে সুপ্রকাশ। খেয়াল টপ্পা ঠুংরি টপ্-খেয়াল দাদরা থেকে কাজরী চৈতী লাউনী পর্যন্ত গানের তিনি শিক্ষাদাতা। তাঁর শিক্ষার গঠিত গায়িকারা পেশাদার জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন।

নিজে সুকণ্ঠ গায়কও গৌরীশঙ্কর। আসরে গান গাইতেন না বটে, কিন্তু যাঁদের শেখাতেন, নিজে গেয়েই সব কাজ দেখিয়ে দিতেন। আর নানা রীতির গানের সঞ্চয়ও ছিল তাঁর প্রচুর। সেকালের পেশাদার গায়িকাদের বিভিন্ন প্রকার গানেই পারদর্শিনী হবার রেওয়াজ ছিল। একটি কি দুটি রীতিতে গায়নশক্তি নিয়ে মুজরো করতে পারতেন না তাঁরা। গৌরীশঙ্করের মতন নানামুখী অভিজ্ঞ ওস্তাদেরই সেজন্য সমাদর ছিল।

একক বাদক হিসেবেও সম্মানিত ছিলেন তিনি। শুধু কলকাতায় নয়, পশ্চিমাঞ্চলেও। ওস্তাদজীর সুদীর্ঘ সঙ্গীত-জীবনে কলকাতার নানা আসরেই তাঁর একক বাদন শোনা যায়। তাঁর শেষ বড় আসরও হয় কলকাতায়। তাঁর জীবনের প্রায় অন্তিম পর্বে। তা হল ১৯৩৭ সালের ২৫শে জুলাইয়ের কথা। সেদিন ছিল ক্যালকাটা মিউজিক অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক উৎসব। লালাবাবু নামে সুপরিচিত দামোদরদাস খান্না ওই অ্যাসোসিয়েশনের একজন

প্রতিষ্ঠাতা-সঞ্চালক। তাঁর (১৭ বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের) বাড়িতেই সে আসর বসে। সেদিন শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন দানীবাবু নামে বিখ্যাত সতীশচন্দ্র দত্ত (তিনি একাধারে ধ্রুপদী এবং পাখোয়াজী), ধ্রুপদী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। তাছাড়া খেয়াল গান শোনান হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল (সুরবাহার-গুণী হিসেবেই তিনি বেশি প্রসিদ্ধ)। রামকিষণ মিশ্রও খেয়াল গেয়েছিলেন। খুসি মহম্মদ বাজিয়েছিলেন হারমোনিয়ম আর তরুণ বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী —বীণা। আর একক সারঙ্গ শুনিয়েছিলেন গৌরীশঙ্কর মিশ্র। তাঁর বয়স তখন বাহাত্তর-তিয়াত্তর বছর। কিন্তু বাজনার হাত প্রায় পূর্ণ মাত্রায় ছিল। সকলে সেদিন মুগ্ধ হন তাঁর বাদনশক্তিতে।

তার পাঁচ বছর আগে (১৯৩২) গৌরীশঙ্করের আরেকটি বড় আসর হয় কাশীতে। কবীর চৌরা মহল্লায় বিশেষ করে তাঁরই জন্যে সেই জলসা।

তখন তিনি কলকাতারই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে আছেন। আর যাতায়াত হয় না কাশীতে। তাই তাঁর বাজনা একবার ভাল করে শুনতে চান বারাণসীর গায়ক বাদক গুণীজনেরা। গৌরীশঙ্করের সে আসরে কজন বিখ্যাত কলাবৎ এসেছিলেন। যেমন, খেয়াল টপ্পার ওস্তাদ বড়ে রামদাসজী, বীণা-গুণী মিঠাইলাল, তবলিয়া মৌলবীরাম মিশ্র, প্রবীণ গায়ক ও সারঙ্গী ঠাকুরপ্রসাদ (গৌরীশঙ্করের কাকা), তবলিয়া ভিকৃকু মহারাজ (শান্তাপ্রসাদের ওস্তাদ), তবলিয়া কণ্ঠে মহারাজ। গৌরীশঙ্করের বাজনায় তাঁরা সবাই পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন।

তাঁর আরো একটি বড় আসর হয় দিল্লীতে। তা তাঁর আরো কম বয়সের কথা। আর সে আসরটিও অন্য রকমের। এক দুর্ধর্ষ সারঙ্গীর সঙ্গে তাঁর সেদিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। সে আসরের কথা বলবার আগে, গৌরীশঙ্করের সঙ্গীত-জীবনের বিবরণ দেবার আছে।

তিনি পঞ্চাশ বছরেরও বেশি যুক্ত থাকেন কলকাতায় সঙ্গীত-সমাজে। শ্বেতাঙ্গিনী ও কৃষ্ণভামিনীর মতন আরো দুজন শ্রেষ্ঠা

বাঙালী বাইজীরও সারঙ্গী গৌরীশঙ্কর। তাঁরা হলেন কিরণময়ী ও সুরমা। অনেক আসরে জুটিতে গাইতেন তুই ভগিনী। আর তাঁদের সঙ্গে সারঙ্গ বাজাতেন তিনি আর তাঁর ভাই কালী ওস্তাদ। অনেক আসরে গৌরীশঙ্কর একাও সঙ্গত করতেন।

নানা খ্যাতনামা গায়ক-গায়িকার সারঙ্গী রূপেই তাঁকে দেখা গেছে আসরে। কাশীর ঠুংরি গায়িকা বড়ী মোতিবাই তখন প্রায়ই কলকাতায় মুজরো করতে আসতেন। আর গৌরীশঙ্কর তাঁর সঙ্গে বাজাতেন আসরে আসরে। মেটিয়াবুরুজের মিহি কণ্ঠের গায়ক পিয়ারা সাহেবের অনেক গানের আসরেও তিনি সারঙ্গী থাকতেন। কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং ইন্দুবালার সঙ্গেও তাঁর বাজনা হত আসরে। পিয়ারা সাহেব, কৃষ্ণচন্দ্র আর ইন্দুবালার কোন কোন গ্রামোফোন রেকর্ডেও মিশ্রজী বাজিয়েছেন।

তবে সারঙ্গ-বাদক হিসেবে গৌরীশঙ্করের সবচেয়ে খ্যাতি ছিল গহর জানের সঙ্গতীয়া বলে। বাংলা আর ভারতের নানা অঞ্চলে তিনি গহর জানের সহযোগী থেকেছেন।

বাইজীদের শীর্ষস্থানীয়া তখন গহর জান। সবচেয়ে বেশি হারের মুজরো তাঁর। আর উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের আসরে দরবারে তাঁর মতন ডাক আর কেউ পান কিনা সন্দেহ। পশ্চিমে বোম্বাই আর দক্ষিণে মহীশূর হায়দরাবাদ পর্যন্ত মুজরো করেন গহর জান। সে সময় গহরের তুদিকে তুই সারঙ্গীকে দেখা যেত। গৌরীশঙ্কর আর পাটনার এমদাদ খাঁ। তাঁদের মধ্যে বাইজীর ডানদিকে বসতেন গৌরীশঙ্কর আর বাঁয়ে এমদাদ খাঁ। সেকালের রেওয়াজ অনুযায়ী দক্ষিণের সারঙ্গ-বাদকের মর্যাদা ছিল বেশি। তুজনের মধ্যে তিনিই অধিকতর গুণী বলে গণ্য হতেন। তখন গহর জানের প্রধান সারঙ্গী হয়ে যেতেন গৌরীশঙ্কর। পাটনা কাশী এলাহাবাদ লক্ষ্ণৌ রামপুর দিল্লী পাতিয়ালা কাশ্মীর বোম্বাই ব্যাঙ্গালোর হায়দরাবাদ প্রভৃতি সর্বত্র।

সম্রাট পঞ্চম জর্জের দরবার হল দিল্লীতে, ১৯১১ সালে। সেখানেও গহর জানের সঙ্গে গৌরীশঙ্কর সারঙ্গ বাজালেন।

এমনি ছিলেন ওস্তাদজী। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেই প্রথম সারির কলাকার। আর গহর জানের ডানদিকের সারঙ্গী—এই পরিচয়ও যথেষ্ট ছিল সেকালে।

গহর জানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের দুটি কারণ। গৌরীশঙ্করের পিতা বেচু ওস্তাদের ছাত্রী গহর জান। আর দ্বিতীয়ত, গৌরীশঙ্করের নিজস্ব গুণ। তাঁর নির্ভরযোগ্যতা। আসরে এমন সুর-সঙ্গতকার কজনই বা ছিলেন তখন। গহর জানের অতি আস্থা ছিল তাঁর ওপর।

যৌবনকালেই গৌরীশঙ্কর কৃতী বাদক। ছেলেবেলা থেকে গান-বাজনা শিখেছেন। বড় হয়েছেন নিজেদের পেশাদার পরিবারে। আর প্রথম জীবনেই তৈরি হয়ে বৃহত্তর সঙ্গীতক্ষেত্রে যোগ দিয়েছেন। প্রথমে নিযুক্ত হয়েছেন নেপাল দরবারে। তখন গহর জানের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না।

নেপালে কিছুদিন থেকে চলে এসেছেন কলকাতায়। গহর জানের সঙ্গে তাঁর বাদক-জীবনের সূত্রপাত এখানেই।

তারপর গৌরীশঙ্কর কলকাতায় স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন। সঙ্গীতগুণে আর সুন্দর স্বভাবে সম্মানের আসন করে নিলেন নিজের জন্যে। গুণী মহলে সকলের স্নেহধন্য হয়ে উঠলেন। সেকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মিশ্রজী কেমন প্রিয় ছিলেন তার একটি প্রমাণ তাঁর জন্মাষ্টমীর আসর।

প্রতি জন্মাষ্টমীতে গৌরীশঙ্কর এক ঘরোয়া আসর করতেন। সেদিন সন্ধ্যা থেকে সারারাত গান-বাজনা হত তাঁর বাড়িতে। জোড়া-সাঁকোর সেই বলরাম দে স্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে। সে জলসায় তাঁর সাদর আহ্বানে কত শ্রেষ্ঠ কলাকাররাই যোগ দিতেন। এমন কি মুসলমান গায়ক-গায়িকারা পর্যন্ত। পুরুষদের মধ্যে যেমন শরদী

করামৎউল্লা, মৌজুদ্দিন প্রমুখ। লছমী ওস্তাদ তো আসতেনই। তেমনি গায়িকাদের মধ্যে কলকাতা আর কাশীর শ্রেষ্ঠা বাইজীদেরও সে আসরে দেখা যেত। সেখানে গান শুনিয়েছেন গহর জান, আগা-ওয়ালী মালকা জান, চল্‌বুলাওয়ালী মালকা জান, নূরজাহান বাই, যাদুমণি, কিরণময়ী ও সুরমা, শ্বেতাঙ্গিনী, কৃষ্ণভামিনী। কলকাতা-নিবাসিনী লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধা নর্তকী বাচুয়ার নাচও সে আসরে হয়েছে। কাশীর বাইজীদের মধ্যে গান শুনিয়েছেন হুস্‌না বাই, বড়ী ময়না, মন্নুয়া বাই।…

কলকাতা আর কাশীর সঙ্গীত-জগৎকে গৌরীশঙ্কর নিজের জীবনে জুড়ে রেখেছিলেন। তাঁর জন্মাষ্টমীর আসর ছিল তার একটি যোগসূত্র।

কলকাতার সঙ্গীতসমাজে একজন অন্তরঙ্গ হয়ে তিনি বাস করতেন। গহর জান, শ্বেতাঙ্গিনী, কৃষ্ণভামিনী, কিরণময়ী, সুরমা ও আরো নানা বাইজীর সারঙ্গী দেখা যেত তাঁকে। কখনো একক বাজনার আসরে। আবার নাট্যমঞ্চে মাঝে মাঝে যে জলসা হত, সেখানেও যোগ দিতেন গৌরীশঙ্কর। কোন কোন মঞ্চে নাটকের মধ্যেও নেপথ্য বাদকের ভূমিকা নিতেন। সুরসৃষ্টি করতেন নাটকীয় পরিবেশে, বিশেষ নাট্যমুহূর্তে।

তাঁর শিল্পী-জীবন ও মানসের এমনি নানা দিক ছিল। কিন্তু সেসবের জন্যে তাঁর মূল রাগসঙ্গীত-চর্চা ব্যাহত হয়নি কখনো।

মধ্যবয়স থেকেই আচার্যের সম্মান পান গৌরীশঙ্কর। শ্বেতাঙ্গিনী, কৃষ্ণভামিনীর মতন শ্রেষ্ঠ গায়িকারাই শুধু তাঁর ছাত্রী নন। আরো গৌরবের কথা আছে তাঁর শিক্ষক-জীবনে। স্বনামধন্য কৃষ্ণচন্দ্র দে-ও তাঁর কাছে শিখেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে গৌরীশঙ্করের সাঙ্গীতিক যোগাযোগ ছিল দীর্ঘকালের। তাঁর অনেক গানের আসরে গৌরী-শঙ্কর সারঙ্গ বাজিয়েছেন। তেমনি গ্রামোফোন রেকর্ডেও।

গায়িকা ইন্দুবালারও প্রথম ওস্তাদ গৌরীশঙ্কর। কলকাতায়

বাংলা গানের জন্যে ইন্দুবালা বেশি পরিচিতা। কিন্তু বৃহত্তর সঙ্গীত-ক্ষেত্রে তিনি খেয়াল ঠুংরি দাদরা গানেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। উত্তর ভারতের নানা কেন্দ্রে, দাক্ষিণাত্যের মহীশূর দরবারেও ইন্দুবালার নাম-ডাক ছিল রাগসঙ্গীতের গায়িকা হিসেবে। সেই সঙ্গীতের পাঠ তাঁর গৌরীশঙ্করের কাছেই আরম্ভ হয়। মিশ্রজীর শিক্ষাতেই সম্ভব হয় তাঁর স্বরসাধনা আর কণ্ঠপ্রস্তুতি। সে প্রসঙ্গে ইন্দুবালা তাঁর স্মৃতি-কথায় বর্ণনা করেছেন :

'...একদিন কাকার বন্ধুবান্ধবদের গান শোনাতে হল। যেটুকু সামান্য পুঁজি ছিল, তা থেকেই দু' একটা গান শোনালাম। ভাল লাগল সকলের।

সকলের পরামর্শে কাকা আমার গান শেখার ব্যবস্থা করলেন। আমাদের বাড়িতে লছমী মিশ্র আসতেন। তাঁরই উদ্যোগে তাঁর ভাই শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর মিশ্রের কাছে আমার প্রথম পাঠ শুরু হল। কিন্তু সহজে নয়।

গৌরীশঙ্করজী শুধু যে ওস্তাদ ছিলেন তাই নয়, মেজাজেও ছিলেন বড় কড়া। অসামান্য গহর জানের সঙ্গে সারেঙ্গী বাজাতেন। সারা ভারতবর্ষ চষে বেড়াতেন। অত বড় গুণী যিনি, তিনি কি আমার মত সামান্য বালিকাকে এক কথায় গান শেখাতে রাজি হন?

আমার মার আমন্ত্রণে এলেন বটে, আমার গানও শুনলেন, শেখাতেও রাজি হলেন; কিন্তু আশ্চর্য এক শর্তে।

মাকে বললেন 'আমি তোমার মেয়েকে শেখাতে পারি, কিন্তু তোমায় আমার পৈতে ছুঁয়ে শপথ করতে হবে যে, আমি না বলা পর্যন্ত তোমার মেয়েকে সা রে গা মা সাধতে হবে। কিন্তু অন্য কিছু রেওয়াজ করার চেষ্টা যেন না করে।'

মা শপথ করলেন।

গুরুজীর মাইনে ধার্য হল মাসিক পঁচিশ টাকা। তারপর দিন দেখে নাড়া বাঁধা হ'ল। মিশ্রজী আমায় সা রে গা মা'র কয়েকটি

রকমফের শিখিয়ে সেই যে চলে গেলেন আর পাত্তাই নেই। আমি তো সা রে গা মা সাধতে সাধতে প্রায় জল করে ফেললাম। কিন্তু গুরু কোথায়! কেবল মাঝে মাঝে গুরুজীর ভাই শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিশ্র মাইনে নিতে আসতেন। তখন আমার বিদ্যের পরীক্ষা দিতে হত। একঘেয়ে একই জিনিস গাইতে গাইতে আমার প্রায় কান্না পেয়ে যেত।

ঠাকুরকে কেঁদে কেঁদে বলতাম, 'কবে আমি প্রাণ খুলে গান গাইতে পারবো!'

আমার পাশের বাড়িতেই গান শিখত আমাদেরই পাড়ার রাজলক্ষ্মী। পরে সিনেমা থিয়েটার করে বড় রাজলক্ষ্মী নামে তার পরিচয় হয়। সে যখন গান শিখত আমি পাশ থেকে অনায়াসে সেটা গলায় তুলে নিতাম।···তবে গলা খুলে গাইবার যো ছিল না। কারণ বাধা ছিল গুরুর কাছে মা'র প্রতিজ্ঞা।

এমনিভাবে কান্নায়, দুঃখে, হতাশায়, অভিমানে বহুদিন কেটে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন গুরুজী এসে হাজির।

গুরুজী এসেছিলেন নিজের বাড়িতে জন্মাষ্টমীর দিন উৎসবের আয়োজন করতে। জন্মাষ্টমীর দিন বিরাট গানের আসর বসত সেখানে। নানান্ জ্ঞানী গুণীর ভিড় হতো সেখানে। সেখানেই গহর জানকে প্রথম চোখে দেখি। সে কথা পরে বলছি।

প্রায় এক বছর পরে গুরুর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথাটা আগে সেরে নিই। গুরুজী এসেই সা-রে-গা-মা'র পাঠ নিলেন।

যা শিখিয়ে গিয়েছিলেন সব শোনালাম। শুনে ভারী খুশী।

ভাই কালীজীকে ডেকে বললেন, 'ইন্দুকে এবার রাগ দাও।'

'বাঙ্গুরী মোরী মোরা জি না ছুঁয়ো।' ইমনের এই গান দিয়ে শুরু হল আমার প্রথম গানের তালিম। এর সঙ্গে একটা ঠুমরী ও গজলও দিলেন। গলায় তখন সুর এমন বসে গেছে যে গান তিনখানা তড়িঘড়ি শিখে নিতে একটুও অসুবিধে হল না। এদিকে জন্মাষ্টমীর

সেই উৎসবও এসে গেল। আমিও নেমন্তন্ন পেলাম। তবে শুধুই শোনবার জন্যে। উৎসবে হাজির হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে গেল।...আমায় একবার কেউ ডাকলও না।...বাড়ি ফিরে মাকে অভিমানের কথা বললাম। কথা শুনে মা দুঃখ পেলেন। পরদিন ওস্তাদজীকে ডেকে সব বললেন। চুপ করে শুনলেন গুরুজী।

শেষে যা বললেন, তা আমার আজও মনে আছে। বলেছিলেন, 'ইন্দুর রূপ নেই। অল্প শিখে সে যদি পাঁচজনের সামনে এসে দাঁড়াতে চায় তো অপমানিত হবে। রূপ অনেক অভাব ঢাকতে পারে। কিন্তু যে শুধু গুণের জোরে আদর পেতে চায় তাকে তেমন গুণী হতে হবে।...'

গুরুর কথায় আমার গান শেখার উৎসাহ যেন আরো বেড়ে গেল। কালীজীর তদারকীতে গান শেখা চলতে লাগল। আশাবরী, ভৈরবী—একটার পর একটা রাগ শিখে যেতে লাগলাম। এক বছর ধরে অনেক কিছুই শিখলাম। দেখতে দেখতে আবার সেই জন্মাষ্টমীর দিন এসে গেল। আবার সেই গানের আসর।...' (আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৭৯—পৃঃ ৮৮-৮৯—অতীত দিনের স্মৃতি, ইন্দুবালা)

এই বিবরণ থেকে বোঝা যায়, কণ্ঠসাধনাকে কতদূর গুরুত্ব দিতেন গৌরীশঙ্কর। আর শিক্ষাদানের ব্যাপারে কি নিয়ম-নিষ্ঠ ছিলেন। ছাত্রীর কতখানি ঐকান্তিকতা দেখে তবে সম্মত হতেন শিক্ষা দিতে।

ইন্দুবালার সঙ্গে তাঁর গুরু-শিষ্যা সম্পর্কের সেই সূচনা। তার পর থেকে বহুকাল ওস্তাদজীর সঙ্গে তাঁর গায়িকা-জীবনের সহযোগিতা ছিল। ইন্দুবালার গানের অনেক আসরে বাজিয়েছেন গৌরীশঙ্কর।

আবার বাংলার বাইরেও অনেক সবাক ফিল্মে ইন্দুবালা অভিনয় করেছেন। গানের ভূমিকাতেই দেখা দিয়েছেন বেশি। কখনো তাঁর অনুরোধে ওস্তাদজীকেও ছায়াচিত্রে যোগ দিতে হয়েছে। সারঙ্গ-বাদকের সাজেই বসেছেন ইন্দুবালার কোন আসরের দৃশ্যে। আসরের

মতন যন্ত্র বাজিয়েছেন। যেমন ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর 'স্টেপ মাদার' ছবিতে। এক বাইজীর আসরে দস্তুরমত সারঙ্গীর ভূমিকায় অবতীর্ণ গৌরীশঙ্কর। সেই দৃশ্য থেকেই নেওয়া হয়েছে বর্তমান বইতে মুদ্রিত গৌরীশঙ্করের প্রতিকৃতিটি। নচেৎ ওস্তাদজীর ছবি হয়তো অপ্রাপ্য হত। ইন্দুবালার সঙ্গে তিনি এমনি আরো একখানি সবাক চিত্রে কাজ করেছিলেন মাদ্রাজে।

আরেকজনকেও গৌরীশঙ্করের সাময়িক ছাত্র বলা যায়। তিনি বাংলার সঙ্গীতরত্ন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। খুবই তরুণ বয়সী তখন ভীষ্মদেব। কলেজের প্রথম দিকের ছাত্র। গৈরিক বসনে সে সময় তাঁকে দেখা যেত। সেই পর্বের উদীয়মান গায়ক-প্রতিভা ভীষ্মদেব কিছুদিন শিক্ষার্থী হয়ে যাতায়াত করতেন গৌরীশঙ্করের কাছে। তা হল ১৯২৫।২৬ সালের কথা। ওস্তাদজী তখন প্রবীণ— বয়সে এবং সঙ্গীতে। ষাট বছর পার হয়েছেন। ভীষ্মদেবের শিক্ষক হিসেবে নগেন্দ্রনাথ দত্ত ও বাদল খাঁর নামই অবশ্য ধর্তব্য। তবে কিছুদিনের জন্যে যে গৌরীশঙ্করও তাঁর এক ওস্তাদ ছিলেন এ কথাও নথিভুক্ত রাখা যায়।

শ্বেতাঙ্গিনী, কৃষ্ণভামিনী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ইন্দুবালা প্রমুখ এঁরা সকলেই ওস্তাদজীর শিক্ষা পান কণ্ঠসঙ্গীতে। আর তিনি সারঙ্গের তালিম দুজনকে দেন। সেই দুই শিষ্যই তাঁর আত্মীয়। বাঙালীরা সারঙ্গ শেখেন না। না হলে বাঙালী শিক্ষার্থীদেরও এ যন্ত্র শেখাতেন গৌরীশঙ্কর।

তাঁর দুই সারঙ্গী শিষ্য হলেন ছন্নুলাল মিশ্র ও চামু মিশ্র। দুজনকেই তিনি কলকাতায় তৈরি করেন। আর তাঁরাও এই শহরে থাকেন ওস্তাদজীর মতন।

ছন্নুলাল তাঁর শ্যালক-পুত্র। সারঙ্গ যন্ত্র আর গান দুয়েরই তিনি তালিম পান গৌরীশঙ্করের কাছে। মধ্যবয়স পর্যন্ত সারঙ্গ-বাদক থাকেন। কিন্তু পরিণত বয়সে গানকেই একমাত্র বৃত্তি করেন

ছন্নুলাল। গায়ক-রূপে সঙ্গীতসমাজে স্বীকৃতি পান। আজও অশীতিপর ছন্নুলাল গৌরীশঙ্করের এক ধারক-বাহক হয়ে বর্তমান।

চামু মিশ্র হলেন ওস্তাদের ভ্রাতুষ্পুত্র। অপুত্রক গৌরীশঙ্কর চামুকে সযত্নে গড়ে তোলেন। ছেলেবেলা থেকে শিক্ষা পেয়ে চামু প্রতিভাবান সারঙ্গ-বাদক হন তরুণ বয়সেই। কিন্তু মাত্র ছাব্বিশ বছরেই তাঁর জীবনে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে (১৯৪৩)। চামু মিশ্রের এমন অকালমৃত্যু না ঘটলে তাঁর মধ্যেই সারঙ্গী গৌরীশঙ্করের প্রতিমূর্তি লাভ করত পরবর্তীকাল।

ওস্তাদজীর শিষ্য প্রসঙ্গে আরেকজনের নামও যোগ করা যায়। তিনি হলেন বাংলার সুপরিচিত গুণী অনাথনাথ বসু। খেয়াল ও ঠুংরির কলাবৎ অনাথনাথ তাঁর শিষ্যস্থানীয়। গৌরীশঙ্করের কাছে গানের অনেক উপদেশ-নির্দেশ তিনি পেয়েছেন। উপকৃত হয়েছেন রাগবিদ্যায়। ওস্তাদজী তাঁকে অনেক রাগের রাস্তা দেখিয়েছেন। অনাথনাথের নানা গানের আসরে বাজিয়েছেন তাঁর সঙ্গে। গৌরীশঙ্করের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিন সাঙ্গীতিক যোগাযোগ ছিল।

ওস্তাদজী যে গায়কও ছিলেন সে কথা আগে বলা হয়েছে। অনেক যন্ত্রী, বিশেষ সারঙ্গী, তো অর্ধেক গায়ক। গান তাঁরা জানেন অন্তরঙ্গভাবে। নচেৎ গানের অত সূক্ষ্ম কারুকর্মে সুর-সঙ্গত করতে অপারগ হতেন। তবে গৌরীশঙ্কর তার চেয়েও বেশি। ছেলেবেলা থেকেই রীতিমত গান শিখেছেন পিতার কাছে। যেমন অভ্যাস করেছেন সারঙ্গ যন্ত্রে, ঠিক তেমনি নিষ্ঠার সঙ্গে। তাঁদের পরিবার বা ঘরানার এইটি বৈশিষ্ট্য। একাধারে গান আর সারঙ্গের চর্চা। সেজন্যেই যন্ত্রী হিসেবে সুর তাঁদের হাতে আরো বসে। আঙুলের স্পর্শ আর চলন হয় আরো সুরেলা। গান চর্চার ফলে সঙ্গতকার হিসেবেও তাঁরা আসরে সফলতর হন। আবার গানের শিক্ষক বা ওস্তাদরূপেও বরণীয় হতে পারেন পেশাদার জীবনে। তাই এই মিশ্র

ঘরের যাঁরা সারঙ্গী বৃত্তির জন্যে প্রস্তুত হতেন, দস্তুরমত গানও শিখতেন।

গৌরীশঙ্করের জীবনেও তাই ওতপ্রোত ছিল যন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীত। তাঁর সারঙ্গে গানই বাজত। শুধু তান বিস্তারই নয়। কণ্ঠের ভাবাবেগ পর্যন্ত রণিয়ে উঠত তাঁর ছড়ের টানে। সারঙ্গের এই বৈশিষ্ট্য। অন্য কোন বাদ্যই এমন সুচারুভাবে গানের সুর-সঙ্গতের যোগ্য নয়। খেয়াল ঠুংরির সঙ্গে এমন একাত্ম হওয়া অন্য যন্ত্রের পক্ষে অসম্ভব। এতগুলি তরফের তারে ঝঙ্কারের ঐশ্বর্যেও সারঙ্গ অনন্য।

গৌরীশঙ্করের প্রসঙ্গে এই যন্ত্রের সব গুণের কথাই মনে আসে। সারঙ্গ বাদ্যরীতির এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য বহন করে এনেছিলেন তিনি। বারাণসী থেকে কলকাতায় প্রসারিত করেছিলেন তার ধারা। বাংলায় তাঁর সঙ্গীতকৃতির এই এক উল্লেখ্য ভূমিকা। মিশ্র ঘরানার সারঙ্গ-বাদনকে তিনি বাংলার সঙ্গীতচর্চার সঙ্গে যুক্ত করেন।

গৌরীশঙ্করের প্রৌঢ় বয়সে আরেক গুণী সারঙ্গী প্রতিষ্ঠা পান কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্রে। সেই কলাকার ছোটে খাঁ। একক অনুষ্ঠানে তিনিও রীতিমত কৃতিত্ব দেখান। কিন্তু গৌরীশঙ্করের তুল্য দীর্ঘকাল তিনি দান রাখেননি বাংলার সঙ্গীত-জগতে। তাঁর কোন উত্তরাধিকারও এই প্রদেশে থাকেনি। চোদ্দ-পনেরো বছর এখানে বাস করে ১৯৪৬ সালে কলকাতা ত্যাগ করে যান ছোটে খাঁ। ইন্দোরের কাছে তাঁর পূর্ব নিবাস গোয়ালদায় বাস করতে থাকেন। আর ফিরে আসেননি কলকাতায়।

গৌরীশঙ্কর কিন্তু নানা বন্ধনে বাঁধা ছিলেন বাংলার সঙ্গীত-জীবনে। তাঁর দেহান্তের পরেও তার একটি রেশ স্মৃতিধারায় রয়ে যায়।

কাশীর প্রাচীন সারঙ্গ-ধারার উত্তর-সাধক গৌরীশঙ্কর। সেখানকার বিরাট কথক সম্প্রদায়ের এক সুযোগ্য প্রতিভূ। কবীর-

চৌরা সেনপুরা রামাপুরা ইত্যাদি এলাকায় বিস্তারিত সেই কত্থক সমাজ। নানা শাখাপ্রশাখার মধ্যে পরস্পর সম্পর্কিত তাঁরা। মিশ্র তাঁদের পদবী।

যন্ত্র আর কণ্ঠসঙ্গীতের নানা বিভাগে তাঁরা বিশেষজ্ঞ হন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলকে প্রভাবিত করেন নিজেদের সাধনায়। তাঁদেরই কোন কোন শাখা স্থায়ী হয়ে পড়েন কলকাতায়। বাংলার রাগসঙ্গীতচর্চার শ্রীবৃদ্ধি করেন। যেমন নানা রীতির গান আর বীণাদি যন্ত্র-সঙ্গীতে রামকুমার, লছমী ওস্তাদ, শিউসহায়। তেমনি বিবিধ কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে রামসেবক, পশুপতিসেবক, শিবসেবক। তবলায় মৌলবীরাম, নান্নু সহায় প্রভৃতি। তেমনি এক সারঙ্গ-বাদক গায়ক-ধারায় কত্থক-বংশীয় গৌরীশঙ্কর মিশ্র।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত। আর বিশ শতকের প্রথম ভাগে তার সুপরিণতি।

গত শতাব্দে ভারতীয় সঙ্গীতচর্চায় সেই নবজাগৃতির পর্ব। আর বাংলা তার মুখপাত্র। তারই একটি অধ্যায় হয় কাশীর কত্থক সম্প্রদায়ের একাংশ বাংলায় স্থিতি করার ফলে। সেই ঐতিহাসিক যোগাযোগে তাঁদের উত্তরাধিকার বাংলাদেশে বর্তায়।

সারঙ্গ-বাদক-গায়ক বুদ্ধু মিশ্রের বংশের সঙ্গীত-সম্পদও তেমনি অঙ্গাঙ্গী হয়ে যায় বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রে।

গৌরীশঙ্করের পিতৃপিতামহের এই পরিবার একাধারে গায়ক ও সারঙ্গ-বাদক।

গৌরীশঙ্কর মিশ্রের পিতামহ বুদ্ধু মিশ্র। কবীর-চৌরা মহল্লায় কবীর-মন্দিরের পিছনে তাঁর বাড়ি। বুদ্ধু মিশ্রের দুই পুত্র। বেচু ওস্তাদ ও ঠাকুরপ্রসাদ। দুজনেই পিতার তালিম পান গানে আর সারঙ্গ যন্ত্রে। বেচু ওস্তাদের কাছে গান শেখেন গহর জান। আর তাঁর সময় থেকেই এ বংশের সঙ্গে কলকাতার সংযোগ। ওদিকে ঠাকুরপ্রসাদ থাকেন কাশী-নিবাসী।

বেচু ওস্তাদের কলকাতায় অন্য সম্পর্কও ছিল। লছমী ওস্তাদের পিতা রামকুমার মিশ্র হলেন বেচু ওস্তাদের ভগিনীপতি। তবে বেচু ওস্তাদ কাশী-নিবাসী থেকেই কলকাতায় আসা-যাওয়া করতেন।

তাঁর পাঁচ পুত্র। শ্যামাচরণ, গৌরীশঙ্কর, কঙ্কর, বুন্দি ও কালীপ্রসাদ। পাঁচজনেরই জন্ম কাশীতে আর সকলেই হন পেশাদার গায়ক-বাদক। তৃতীয় কঙ্কর বারাণসীতে থাকেন এবং ভাইদের মধ্যে প্রথম মৃত্যু হয় তাঁর। অপর চারজনই প্রতিষ্ঠা পান, স্থায়ী বাসিন্দা হন কলকাতায়। কেউ গায়ক কেউ তবলিয়া কেউ সারঙ্গী হয়ে আমৃত্যু এখানকার সঙ্গীত-জগতে যুক্ত থাকেন।

শ্যামাচরণ আর বুন্দি মিশ্র হলেন তবলাগুণী বুন্দি অবশ্য গায়কও ছিলেন। আর গৌরীশঙ্কর ও কালীপ্রসাদ বংশের ধারায় সারঙ্গী। সেই সঙ্গে দুজনেরই গানের যেমন অভিজ্ঞতা, তেমনি সংগ্রহ। তাঁরা দুজন পিতার শিক্ষাতেই গঠিত। তবে গৌরীশঙ্কর বংশের অতিরিক্ত শিক্ষাও কিছু পান। তিনি সারঙ্গের তালিম পেয়েছিলেন কাশীর বিরাই মিশিরের কাছেও। কবীর-চৌরা-নিবাসী বিরাই মিশিরও অবশ্য কথকদেরই এক সুপরিচিত সারঙ্গ-বাদক পরিবারের গুণী।

পেশাদার জীবনের প্রথমেই গৌরীশঙ্কর নেপালে থাকেন। তারপর স্থায়ী হন কলকাতায়। এখানে গহর জানের সঙ্গে তিনি তখন থেকেই সহযোগী।

কলকাতায় আসার সময় গৌরীশঙ্করের বয়স ত্রিশও হয়নি। আর এখানেই তাঁর মৃত্যু হয় অশীতিপর বয়সে। তাঁর পঞ্চাশ বছরের সঙ্গীত-জীবন এই শহরেই উদ্‌যাপিত বলা যায়। তাঁর জন্মসন আনুমানিক ১৮৬৫।

গৌরীশঙ্করের শিষ্যদের কথায় বলা হয়নি, কনিষ্ঠ কালীপ্রসাদও তাঁর শিক্ষা পেয়েছিলেন। তিনিও কলকাতায় প্রসিদ্ধ হন কালী

ওস্তাদ নামে। গৌরীশঙ্করের সঙ্গীত-জীবনে চিরদিন সহযোগী কালীপ্রসাদ। দুজনে অনেক সময় একই ছাত্রীকে শিখিয়েছেন। যেমন কৃষ্ণভামিনী কিংবা ইন্দুবালাকে। আসরে সারঙ্গ বাজিয়েছেন একই বাইজীর দুদিকে বসে। যেমন শ্বেতাঙ্গিনী কিরণময়ী সুরমা কৃষ্ণভামিনীর সঙ্গে। দুই সহোদর অর্ধ শতাব্দ একই বাড়িতে বাস করেছেন। জোড়াসাঁকোর ১৫৮ বলরাম দে স্ট্রীটে।

এই ঠিকানা থেকেই গৌরীশঙ্কর সারা ভারতের আসরে দরবারে মুজরোয় যেতেন, গহর জানের সঙ্গে। এখানেই তাঁর জন্মাষ্টমীর আসর হত বছরের পর বছর।

ওস্তাদজী কখনো কখনো আলাদাও পশ্চিমের আসরে যোগ দিতেন। আর কাশীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বজায় ছিল বরাবর। সেখানে নিজেও যাতায়াত করতেন। আর কাশীর গুণীরা কলকাতায় এলে সহযোগী থাকতেন তাঁদের আসরে। এখানে তাঁদের মুজরোর ব্যবস্থাও করে দিতেন। বাইজী গানেই সুরসঙ্গতের রেওয়াজ। তাই বাইজীদের সঙ্গে মিশ্রজীর সংযোগ ছিল বেশি। তাঁর মুজরো নিয়মিত হত বাইজীর আসরে। বেশি শিক্ষা বাইজীদেরই দেন। খেয়াল টপ্পা ঠুংরি দাদরা টপ্‌খেয়াল হোরি আর চৈতী কাজরী লাউনী—শেখাতেন সব রকমই।

তার মধ্যে টপ্পার বিশেষ স্থান। কাশীতে টপ্পা গানের ঐতিহ্য যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি এই মিশ্র ঘরেও। কাশীর একেক কলাবৎ টপ্পা রীতির বিশেষজ্ঞ। যেমন ছোটে রামদাস। এই ঘরেরই শিষ্য তিনি। গৌরীশঙ্করের কাকা ঠাকুরপ্রসাদের শিক্ষা পান ছোটে রামদাস।

গৌরীশঙ্করও টপ্পা-প্রবীণ। তাঁর শিক্ষাতেই টপ্পা, টপ্‌খেয়ালে অমন কলাবতী গায়িকা হন কৃষ্ণভামিনী।

টপ্পার কি ঐশ্বর্য যে মিশ্রজী যন্ত্রে দেখাতেন! যেমন তার গিট্‌কারি জমজমার অলঙ্করণে রূপকার, তেমনি টপ্পা অঙ্গে তাঁর রাগের পরিবেশনা। তাঁদের ঘরানাই হল টপ্পা রীতিতে বিশেষজ্ঞ।

তাই তিনি টপ্পার চালে এত বিচিত্র রাগও বাজাতেন। টপ্পা গানে কটি লঘু রাগই শোনা যায় সচরাচর। কিন্তু গৌরীশঙ্করের একক আসরে টপ্পায় এমন অনেক রাগ বাজত যা অনেকের গান বাজনায় পাওয়া যেত না। ছাত্রছাত্রীদের তিনি দিয়েছেনও সেসব। যেমন— পূরিয়া, সোহিনী, ভীমপলশ্রী, নটমল্লার, মালকোশ, সাহানা, মূলতান ইত্যাদি।

বলা যায়, বংশের ধারায় গৌরীশঙ্কর ছিলেন টপ্পা রীতিতে সিদ্ধ। না হলে দিল্লীর সে আসরে পাল্লা দিতে পারতেন না।

সেই লড়াইয়ের আসরের আগে বলে নিতে হয় তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়টি।

বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তিনি বেশ সক্ষম ছিলেন। স্বাস্থ্যবান নীরোগ শরীর ছিল প্রায় পরিণত বয়স পর্যন্ত। শ্যামবর্ণ একহারা চেহারার মানুষ। আকারেও ছোটখাটো। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতি। সেই যে আসরে দীর্ঘকায়া সুরমা বাইজীকে পাহাড় বলতেন নিজেকে গাছের সঙ্গে উপমা দিয়ে—'পাহাড় চল্‌তি হুয়ি। ঔর হম্ লোগ সব পেড় হ্যায়।'

শান্ত, আত্মসন্তুষ্ট স্বভাব গৌরীশঙ্করের। শিল্পীর পরিতৃপ্তিতে স্বচ্ছন্দেই দিন যাপন করতেন। বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন সুখে দুঃখে। বাঙালী গায়ক-গায়িকা সঙ্গতকার সঙ্গীত-প্রেমীদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। জীবনযাত্রায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী নন বলে কোন অভাব বোধ করেননি ওস্তাদজী।

শুধু একটি ক্ষোভ ছিল। কারণ অপুত্রক। তবে তা নিয়েও বিশেষ দুঃখ বোধ করতেন না। কারণ তাঁরা চার ভাই-ই পুত্রহীন, একমাত্র বুন্দি ভিন্ন। আর বুন্দির বড় ছেলে চামুকে তো নিজের সন্তানের মতন গড়ে তোলেন। আর অল্প বয়সেই সারঙ্গবাদক চামু অতিশয় গুণপনা দেখাচ্ছিলেন আসরে। সেজন্যেও গৌরীশঙ্কর বেশ তৃপ্ত ছিলেন।

এমনিভাবে তাঁর জীবন চলেছিল তিয়াত্তর-চুয়াত্তর বছর পর্যন্ত। আসরে আসরে সারঙ্গ সঙ্গত। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান। সিনেমায় যে মাঝে মাঝে বাজাতেন, তাও এই পরিণত বয়সে।

এমন সময়, সেদিন এক আসর থেকে বাড়ি ফিরছেন। গাড়িতে সঙ্গে রয়েছেন গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং আরো কজন। সেনট্রাল অ্যাভেনিউ দিয়ে এসে, বলরাম দে স্ট্রীটে তাঁদের গলির সামনে গাড়ি দাঁড়াল।

গৌরীশঙ্কর কিন্তু নামতে পারলেন না গাড়ি থেকে। শরীরের দক্ষিণ দিক একেবারে অবশ হয়ে গেছে! ডান হাত, ডান পা অক্ষম!

আকস্মিক পক্ষাঘাত!

সঙ্গীরা বোঝবার পর সকলে তাঁকে নিয়ে এলেন ধরাধরি করে। তাঁর দোতলার ঘরে ওস্তাদজী শয্যাগত হলেন।

তেমনি অশক্ত হয়েই রইলেন মাসের পর মাস। চিকিৎসা চলতে লাগল। সে সময় তাঁর অত্যন্ত যত্ন নিয়েছিলেন গোবরবাবু। স্বনামধন্য মল্লবীর, সঙ্গীতসেবী, কলাকারদের পৃষ্ঠপোষক গোবরবাবু গৌরীশঙ্করের এক গুণমুগ্ধ। ওস্তাদজীর চিকিৎসাদির জন্যে তিনি নানারকম সাহায্য করেছিলেন।

সে যাত্রা অল্পে অল্পে অনেকখানি আরোগ্য লাভ করলেন গৌরী-শঙ্কর। তবে আগেকার স্বাস্থ্য আর ফিরল না। ক্রমে সারঙ্গ হাতে দেখাও দিতে লাগলেন আসরে। কিন্তু আগেকার ক্ষমতায় বাজাতে আর সক্ষম হননি। কারণ তেমন সচল থাকেনি ডান হাতটি। দীর্ঘ-কালের সাধন ছিল। তাই কোনরকমে সঙ্গতীয়ার কাজ করতে লাগলেন আসরে। এমনিভাবে দিন যেতে লাগল।

প্রথম পক্ষাঘাত হয়েছিল ১৯৩৮ সালে। লালাবাবুর বাড়িতে ক্যালকাটা মিউজিক অ্যাসোসিয়েশনের সেই বড় আসরের বছর-খানেক পরে। একটু সুস্থ হয়ে আবার তাঁর বাজনাও আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু তারপরেই বাধল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। আর ১৯৪২-৪৩

সালে সেই বোমাতঙ্কে দলে দলে শহর ত্যাগ, ছুর্ভিক্ষ, নিষ্প্রদীপ, বোমা-আক্রমণ ইত্যাদি। কলকাতায় অনেক কিছুর মতন সঙ্গীত-জগৎও বিপর্যস্ত হয়ে গেল।

মহা সঙ্কট ঘনিয়ে এল গৌরীশঙ্করের পেশাদার জীবনে। তাঁর ছুর্দিনের ওপরে আবার ছুর্যোগ। মাত্র কদিনের কালাজ্বরে—পরম স্নেহের পাত্র, হাতে গড়া, ভবিষ্যতের আশা-ভরসা চামু মিশ্রের জীবনদীপ নিভে গেল।

সেই দারুণ ছুঃসময়ে এল বোমার বিপদ। আর কলকাতার মানুষদের শহর ছেড়ে যাওয়ার হিড়িক। জনশূন্য হয়ে পড়ল কলকাতা। গৌরীশঙ্করও সেই স্রোতে পুরুলিয়া চলে গেলেন। সেখানে বাস করতে লাগলেন চামুর কনিষ্ঠ দামোদরের সঙ্গে।

পুরুলিয়া বাসের মধ্যেই মৃগী রোগের আক্রমণ হল। তখন আবার তাঁকে আত্মীয়েরা নিয়ে এলেন কলকাতায়। এখানে রোগের ছুর্ভোগ বাড়তেই লাগল। কোন চিকিৎসাতেই আর নিরাময় হতে পারলেন না গৌরীশঙ্কর। অবশেষে ১৯৪৫ সালে চিরশান্তি লাভ করলেন, ১৫৮ বলরাম দে স্ট্রীটের বাসায়। কলকাতার পঞ্চাশ বছরেরও বেশি দিনের সারঙ্গটি স্তব্ধ হয়ে গেল। বয়স তখন আশী পার হয়েছিল।

তাঁর অনেক আসরের স্মৃতি জীবন্ত হয়ে আছে সঙ্গীত-সমাজে। তার মধ্যে একটি বিশেষ করে বলবার মতন। দিল্লীর সেই জলসায় সারঙ্গ-নেওয়াজ মম্মন খাঁ আর শান্তশিষ্ট গৌরীশঙ্কর মিশ্রের কথা।

ছোটে খাঁর ওস্তাদ বুন্দু খাঁর মামা মম্মন খাঁ। ছুর্ধর্ষ বাজিয়ে বলে পশ্চিমে তাঁর নামডাক। কোন গায়ক-গায়িকার সঙ্গতে মম্মন খাঁ কখনো সারঙ্গ বাজাননি। বরাবর মূল শিল্পী হয়ে বসেন আসরে। কি দাপটের সঙ্গে তাঁর বাজনা! নানা রকমে তিনি সারঙ্গ যন্ত্রের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেতার শরদের মতন তান তোড়া বিস্তার তো করেনই সারঙ্গে। আবার আলাপের অঙ্গও দেখান।

মম্মন খাঁর রাগালাপের জন্যে নতুন সম্মান পায় যন্ত্রটি। আরেকটি অভিনবত্ব তিনি করেছেন। প্রচলিত আকারের অনেক বড় মাপের সারঙ্গ তাঁর। সেই বৃহৎ যন্ত্রে আলাপ থেকে শুরু করে খেয়াল অঙ্গের গৎ তান বিস্তার সবই শুনিয়ে দেন।

নিজের বড় আকারের সারঙ্গটির তিনি নতুন নামকরণ করেছেন—স্বরসাগর। বাজনার মুন্সিয়ানায় সে যন্ত্রে সুরের অজস্র তরঙ্গধ্বনিই তোলেন মম্মন খাঁ।

আসরে আসরে তিনি একক বাজিয়ে সাড়া জাগিয়েছেন। তেমনি সম্মান তাঁর দিল্লীর সঙ্গীত-সমাজে। এখানকার অতি বিখ্যাত কলাকার তিনি। আর আপন গুণের বিষয়ে সচেতন। দর্পীও।

সেবার দিল্লী এসেছেন গৌরীশঙ্কর।

মম্মন খাঁর নাম আর পরিচয় তিনি আগে শুনেছিলেন বটে। কিন্তু কখনো তাঁর বাজনা শোনেননি। সেদিন সে সুযোগ পেলেন একটি আসরে। এখানে এসেছেন গৌরীশঙ্কর শ্রোতা হিসেবে।

মম্মন খাঁ তাঁর নিজস্ব যন্ত্রে শোনাতে লাগলেন—আলাপচারীর পর গৎ, তানকারী আর নানা অলঙ্কারের কাজ। অপূর্ব বাদন-রীতিতে তাঁর স্বরসাগর সুরের ঊর্মিমালায় ঝঙ্কার দিতে লাগল।

শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দিয়ে একসময় বাজনা শেষ করলেন খাঁ সাহেব। সকলে তাঁকে সাবাস দিলেন, মিশ্রজীও।

কিন্তু সেই প্রশংসার মধ্যে মম্মন খাঁ বড়ই অহমিকা প্রকাশ করলেন। নিজের প্রকাণ্ড সারঙ্গের দিকে দেখিয়ে এই মর্মে জানালেন—এ যন্ত্র কে আর বাজাতে পারবে! অ্যায়সা কোই হ্যায়?

বিস্মিত হলেন গৌরীশঙ্কর। বিরক্তও। প্রকাশ্য আসরে মম্মন খাঁ অহংকার জানাচ্ছেন এমনভাবে! লড়াইয়ের আহ্বান জানাচ্ছেন! মিশ্রজীর মধ্যে শিল্পীর অভিমান আর আত্মসম্ভ্রম জেগে উঠল। মনে মনেই বললেন—হম্ হ্যায়।

মম্মন খাঁর দিকে চেয়ে সবিনয়ে জানালেন—'কোশিশ করেঙ্গে।'

'আপ ?' তাঁর ছোটখাটো সাদামাঠা চেহারা দেখে সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলেন খাঁ সাহেব। গৌরীশঙ্করকে তাঁর জানা ছিল না।

'জী, হাঁ।' তেমনি বিনীতভাবেই তিনি জবাব দিলেন।

স্থির হল, সেখানেই গৌরীশঙ্করের আসর হবে কিছুদিন পরে। আজকের শ্রোতারাও সেদিন হাজির থাকবেন। মম্মন খাঁর মতন বৃহদাকার শারঙ্গ বাজিয়ে শোনাবেন মিশ্রজী। সেই নতুন যন্ত্র প্রস্তুত হলেই তিনি খাঁ সাহেবকে খবর দেবেন। তখন তাঁর আসরের বন্দোবস্ত হবে এখানে।

পরের দিন মিস্ত্রী মহল্লায় সন্ধান করে তিনি যন্ত্রের ফরমায়েস দিলেন। আর রয়ে গেলেন দিল্লীতে। তাগিদ দিয়ে নতুন যন্ত্র করালেন। সেই বড় মাপের সারঙ্গে রিয়াজ করতে লাগলেন দিবারাত্র।

তারপর মম্মন খাঁকে আসরের দিন স্থির করতে বললেন।

নির্দিষ্ট আসরে এলেন খাঁ সাহেব। আর তাঁর সঙ্গে সমঝদার কিছু ব্যক্তিরা। উৎসুক, কৌতূহলী শ্রোতায় আসর ভরে গেল। যন্ত্র বেঁধে নিয়ে, ছড়ের টানে ঝঙ্কার ওঠালেন গৌরীশঙ্কর। সে তাঁর এক নতুন রকমের দৃশ্য। মাথার পাগড়ি ছাড়িয়ে উঠেছে তাঁর হাতের যন্ত্রটি।

আবাল্য সারঙ্গের সাধক। কদিনের রিয়াজে বড় যন্ত্রেও হাত দুরস্ত করে নিয়েছেন। মম্মন খাঁ আর দিল্লীর শ্রোতাদের শোনাতে হবে, মিশির ঘর কি বাজ। খাঁ সাহেবের সদম্ভ আহ্বানের জবাব দিতেও হবে। তিনি বাজাতে লাগলেন গভীর আত্মপ্রত্যয়ে।

বাজনা যতই অগ্রসর হল, শ্রোতারা আশ্চর্য হয়ে গেলেন মিশ্রজীর তানের বহর দেখে। এমন টপ্পা অঙ্গ তাঁরা সারঙ্গের একক আসরে কখনো শোনেননি। বিস্মিত মম্মন খাঁ দেখতে লাগলেন, এ যন্ত্রে দস্তুরমত জমজমা আর খটকার কাজ। 'বানারসের' বাজিয়ে কি দানাদার বাহারের সব তান ওঠাচ্ছেন! মনে মনে মানলেন—হাঁ, এলেমদার বটে।

সুরের কারুকর্মে গৌরীশঙ্কর বাজনা জমিয়ে ভরিয়ে তুললেন। মুরকির তান ঝরতে লাগল ফুলঝুরির মতন। 'সাবাস' 'সাবাস' রব উঠল শ্রোতাদের মধ্যে।

বড় যন্ত্রের বড় আওয়াজে টপ্‌খেয়ালের মুন্সিয়ানা দেখালেন তিনি। আসর মাত করে দিলেন।

বাজনা শুনে খুশি হলেন সবাই। শেষ হতে সমঝদারদের তারিফ আবার বর্ষিত হল।

গৌরীশঙ্কর কিন্তু কোন বাগাড়ম্বর করলেন না। আহ্বান জানালেন না মম্মন খাঁকে—উঠাইয়ে ত অ্যায়সা তান আপ্‌কা যন্তর্‌মে!

কিছুই বলতে হল না তাঁকে। শ্রোতারা বুঝলেন, এ ধরনের তানকারী মম্মন খাঁর হাতে কোনদিন বাজেনি।

কিন্তু কোন প্রশংসাবাণী ফুটল না খাঁ সাহেবের মুখে।

তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। নিজেই বড়াই করতে গিয়ে বেইজ্জৎ হয়েছেন খুদ দিল্লীতে!

কাশীর ওস্তাদটি বড় জোর জিতে গেছেন।

কতবার আসিয়া কত ভালবাসিয়া

মানদাসুন্দরী

টপ্‌খেয়াল আর খেয়াল গানের কলাবতী মানদাসুন্দরী। গায়িকার নামের সঙ্গেই যেন গানখানির রেশ ভেসে আসে।

সেই আকুল-করা মরমী সুরে ভরে যায় সঙ্গীতের আকাশ। অন্য সব পরিচয় আড়াল করে মূর্তিমতী হয়ে ওঠে—গান। সুর আর বাণীতে অঙ্গময়ী।

শিল্পীর আর সব রেকর্ড ছাপিয়ে কেদারার মিষ্টি গানটি অনুরণন করে—

কতবার আসিয়া কত ভালবাসিয়া
গিয়াছি ফিরিয়া কত কাঁদিয়া কাঁদিয়া···

কিরণময়ীরই সগোত্রা, সঙ্গীতে আর শ্রেণীতে। কান্ত কলার গুণে আর ভাগ্য-বৈগুণ্যে। খেয়াল টপ্পায় আর টপ্‌খেয়ালে ওই ধরনেরই পারদর্শিনী। হয়ত আরো খ্যাতির সুযোগ পেয়েছিলেন। আরো জীবন্ত হয়ে আছেন শ্রুতিস্মৃতিতে। স্মরণ মননের নিদর্শনও রেখে গেছেন কিরণময়ীর চেয়ে বেশি। সেইসব গ্রামোফোন রেকর্ড।

দুজনে একই সময়ের, প্রায় সমবয়সিনী। কিরণময়ী হয়ত কিছু অগ্রজা। আরো আগে বিদায় নেন গানের জগৎ থেকে।

কিন্তু মানদাসুন্দরী অত দুর্ভাগিনী নন। অমনি পরিবেশেও সম্মানের স্থান করে নেন সম্পন্ন অবস্থায়। কিরণময়ীর চেয়ে সুন্দর করে বাঁচতে পেরেছিলেন। তবে হয়ত অপূর্ণতা ছিল এক বিষয়ে। খণ্ডিত হলেও ঘরণী জননী কিরণময়ী।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে আরেক পার্থক্য মানদার। কিরণময়ীর মতন

তিনি বাঈজী হননি। অর্থাৎ মানদা শুধুই গায়িকা। নর্তকী নন। নিজের বাড়িতে, বাইরের আসরে, কীর্তন-বাসরে কিংবা গ্রামোফোনের গীত-শিল্পী। সঙ্গীত-জীবনে এই তাঁর পরিচয়। শুধু গানের প্রদীপ জ্বেলেই তিনি জীবন-দেবতার আরতি করেছিলেন।...

শিল্পী হিসেবে মানদার ভাগ্য অনেক দিকে ভাল। ভাবীকালের আসরেও তাঁর দান থেকে গেছে। আছে প্রতিকৃতির স্মরণিকা। সঙ্গীত-জীবনের সংবাদ। কিছু ব্যক্তি-পরিচিতি। আর, বহুসংখ্যক গানের রেকর্ড। গ্রামোফোন-জগতের কালজয়ী কীর্তি। বিশ শতকের প্রথম তিন দশক ব্যাপী খ্যাতি।

গ্রামোফোনে মানদাসুন্দরীর প্রায় প্রতিটি গানই সুন্দর। রেকর্ড হিসেবে সফল। শোনবার মতন। আর, কয়েকটি গান শুনে ভোলা যায় না।

রেকর্ড যুগের প্রথম পর্বের গায়িকা তিনি। কিন্তু তখনই প্রথম সারির গীত-সাধিকা। সুমার্জিত, সুরেলা কণ্ঠের শিল্পী। দরদী শ্রোতার মন ভরে ওঠে একেকটি গানের সুরে। সেই চির-বিরহের আকূতিতে কেদারায় কি মাধুর্য সঞ্চার করে—

কতবার আসিয়া কত ভালবাসিয়া
গিয়াছি ফিরিয়া কত কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
কত নিশি জেগেছি কতই বা কেঁদেছি
তবু দেখা পাই না সাধিয়া সাধিয়া॥...

যে একবার শোনে, তার কানে থেকে যায় সেই সুরের রেশ।

লালচাঁদের পরই মানদা গ্রামোফোনে আসেন। তাঁর রেকর্ড হতে থাকে একটির পর একটি। সঙ্গীতপ্রিয়দের চিত্ত আকৃষ্ট করে। নানা ঘরে স্থান পায় সেসব রেকর্ড। কলকাতা ছাড়িয়ে, মফস্বল শহর পার হয়ে পল্লী অঞ্চলেও পৌঁছে যায়। এই উদীয়মানা গায়িকার গান বাজতে থাকে বাংলার জেলায় জেলায়।

গায়কদের মধ্যে লালচাঁদ বড়াল, আর গায়িকা মানদাসুন্দরী

ও পান্নাময়ীর রেকর্ডের তখন সবচেয়ে বেশি নাম। আর সর্বাপেক্ষা চাহিদা। সবচেয়ে বেশি লোকে শোনে।

তাঁদের মধ্যে পান্নাময়ীর শুধু কীর্তন। কিন্তু লালচাঁদের মতন মানদারও প্রায় সবই রাগসঙ্গীত। বেশির ভাগ টপ্‌খেয়াল ধরনের। বাংলা খেয়ালও বলা যায় মানদার কোন কোন গানকে। বাঙালী শ্রোতাদের মন রাগে রঞ্জিত করে দেয় তাঁর গান।

বাংলার সঙ্গীত-জগতে সে একটা যুগ এসেছিল। এক ভূমিকা পালন করেছিল গ্রামোফোন রেকর্ড। আর সেখানে মানদাসুন্দরীরও স্মরণীয় দান ছিল। বাংলার সাঙ্গীতিক ইতিহাসে মনে রাখবার মতন সে নাম।

নামের কথায় এক সমস্যার কথাও বলতে হয়। মানদাসুন্দরী দুজন ছিলেন কি?

বাংলার মঞ্চে এক মানদাসুন্দরী অভিনয় করতেন। গানের জন্যেই প্রসিদ্ধা তিনি। 'মলিনা বিকাশ' গীতিনাট্যের (স্টারে ১২৯৭, ২৯ ভাদ্র মঞ্চস্থ) নায়িকা নটী। গিরীশচন্দ্রের এই রচনায় সুরসংযোজক, সঙ্গীতাচার্য রামতারণ সান্যাল। তার ছখানি গান শুনিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করতেন মানদা। বিশেষ তাঁর 'পাখি তোর পেলে মধুর স্বর' (পূরবী, দাদরা) আর 'দেখলে তারে আপন হারা হই' (হাম্বীর, কাওয়ালী) গান দুখানি তখন লোকের মুখে মুখে শোনা যেত। তা ছাড়া, গিরিশচন্দ্রের 'চণ্ড', 'মহাপূজা', 'প্রফুল্ল' নাটকেও মানদা গানের ভূমিকায় দেখা দিতেন স্টার মঞ্চে। 'প্রফুল্ল'তে 'মা তোমার এ কোন্ দেশী বিচার' (বিলম্বিত লয়ে ভৈরোঁ মিশ্র) গানটি যেমন কঠিন তেমনি বিখ্যাত আর গুরুত্বপূর্ণ। সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা-নটী নরসুন্দরীরই ও গানের জন্যে নাম ছিল। তাঁর বিকল্পে গানখানি গাইবার অধিকারিণী ছিলেন সে যুগে মানদাসুন্দরী।

গায়িকা-অভিনেত্রী মানদাকে বেশিদিন মঞ্চে দেখা যায়নি। ওই ক'টি অভিনয় ভিন্ন তিনি অবতীর্ণা হন 'তরুবালা' নাটকে পারুলের

ভূমিকায়। ১৯০৬ সালের ১৩ই এপ্রিল, পুরনো বেঙ্গল থিয়েটারে। সেখানে তখন নতুন করে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম দিয়ে চলছিল। সে রাতেই মানদার শেষ মঞ্চে অবতরণ।

সেই 'তরুবালা'র দশ বছর আগে (১৮৯৬) স্টারে নেমেছিলেন ওই গানের ভূমিকায়। আর তাঁর প্রথম মঞ্চে অভিনয় 'চণ্ড' নাটকে, ১৮৯০ সালে। (এটিই গিরিশচন্দ্রের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক, মধুসূদনের ১৪ অক্ষরের অমিত্রাক্ষর ছন্দ এ রচনায় ব্যবহার করেন নতুন রীতিতে। দানীবাবুরও রঘুদেবজী চরিত্রে প্রথম নতুন ভূমিকা এই নাটকে)।

১৮৯০ সালে সূচনা আর ১৯০৬ সালে সমাপ্তি। মঞ্চের নটী মানদাসুন্দরীর ওই ক'টি মাত্র অভিনয়-রজনী। সুকণ্ঠী গায়িকা বলে প্রতিষ্ঠা পেলেও নাট্যশালা থেকে তিনি কিন্তু বিদায় নেন অকালে। তার কারণও জানা যায় না।

সমস্যা এই, অভিনেত্রী মানদা আর গ্রামোফোনের মানদা কি অভিন্ন?

রেকর্ড-গায়িকা মানদাসুন্দরীর জীবন অনেকখানি জানা। তিনি ওস্তাদ বিশ্বনাথ রাওয়ের শিষ্যা। বাংলার সঙ্গীত-জগতের এক সুপরিচিতা গুণী। ১৯২৭ সালে তাঁর একটি আসরের বিবরণ পাওয়া গেছে, যখন তাঁর গায়ন-ক্ষমতা পরিপূর্ণ, অটুট। গীতকণ্ঠ পূর্বাপর সতেজ। বয়স ও স্বাস্থ্য দৃশ্যত পঞ্চাশের অনধিক।

দুই মানদার এক হওয়ার প্রতিপক্ষে সন্দেহের কারণ—১৮৯০ সালে যিনি মঞ্চে অবতীর্ণা, ৩৭ বছর পরের গায়িকাও কি তিনি? কালের ব্যবধান লক্ষ্য করবার মতন।

আবার দুই মানদা অভিন্ন হওয়ার পক্ষেও যুক্তি হতে পারে—অভিনেত্রীর 'প্রফুল্ল' নাটকে গাওয়া 'মা তোমার এ কোন্ দেশী বিচার' গানটি গ্রামোফোনেও আছে রেকর্ড-গায়িকার তালিকায়। আর সেকালে, মঞ্চে যিনি গান, রেকর্ডেও তাঁরই গাইবার রেওয়াজ দেখা যেত।

সেজন্যে সমস্যাটি জানিয়ে রাখা হল, সিদ্ধান্ত না নিয়ে।…

সেকালে ধ্রুপদী-ধামারী বিশ্বনাথ রাও বাংলার সঙ্গীতজগতে এক সম্মানিত আচার্য। কলকাতার আসরে ধামার গানকে তিনি নতুন করে প্রচলন করেছিলেন। বাঁটের কারুকর্মে ভরা চমৎকার সার্গমে মাতিয়ে দিতেন বাঙালী শ্রোতাদের। বছরের পর বছর কলকাতায় বাঙালীদের সঙ্গে বাস করে, তিনিও বাঙালী বনে যান। বাঙালীদের সঙ্গেই ওস্তাদজীর মেলামেশা ছিল বেশী। নাটোর-রাজ জগদিন্দ্রনাথের আসরে তিনি অনেক সময় আসর-পতির সম্মানে উপস্থিত থাকতেন। বাংলায় কথা বলতেও পারতেন, উচ্চারণে একটু পশ্চিমী টান দিয়ে। আর আসরে ধ্রুপদ ধামার গাইলেও, ঘরোয়াভাবে শোনাতেন কিছু কিছু বাংলা গান। বিশ্বনাথজীর রেকর্ডও সব বাংলা গানের। সেই 'হর হর হর বম্ বম্ বামে শোভে গৌরী' (প্রভাতী), 'এমন দিন কি হবে তারা' (কাফিসিন্ধু), 'রাখ রাখ মিনতি মম আজিকে গো রাই' (খাম্বাজ), 'মুই অধমের অধম' (আশাবরী), 'তারা তারা তারা বলে কবে আমার প্রাণ যাবে' (ছায়ানট), 'জাল ফেলে যম রয়েছে বসে' (বেহাগ) ইত্যাদি।

ওস্তাদ বিশ্বনাথ রাওয়ের শিষ্যদের মধ্যে লালচাঁদ বড়াল (ধামার ও সার্গম), দানীবাবু নামে সঙ্গীত-জগতে সুপরিচিত ধ্রুপদী-পাখোয়াজী সতীশচন্দ্র দত্ত, ধ্রুপদী অমরনাথ ভট্টাচার্য, যোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ('বন্দে মাতরম' গায়নের জন্যে বিখ্যাত), ধ্রুপদী বিনোদবিহারী মল্লিক (পাখোয়াজ-গুণী গোপালচন্দ্র মল্লিকের পুত্র), লালচাঁদ-পুত্র কিষণচাঁদ বড়াল, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির নাম করা যায়। আর মানদাসুন্দরী। তাছাড়া স্যর আশুতোষ চৌধুরী ও প্রতিভা দেবী পরিচালিত 'সঙ্গীত সঙ্ঘ'রও অন্যতম শিক্ষক বিশ্বনাথজী।

ওস্তাদের সূত্রে সঙ্গীত-জগতের এই পরিবেশে মানদার গায়িকা-জীবন।

আসরে তিনি খেয়াল আর টপ্‌খেয়াল গাইতেন। তাঁর আসল পরিচয় ছিল রাগসঙ্গীতের শিল্পী হিসেবে। কিন্তু কীর্তন-গায়িকা বলেও মানদার নাম ছিল। কীর্তনের আসর করতেন ভাল দক্ষিণা নিয়ে। অবশ্য তা শ্রাদ্ধ-বাসরেই। সেকালে শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানে কীর্তনং-গায়িকার চলন ছিল। গৃহস্থ পরিবারে 'পতিতা'দের সাধারণ সঙ্গীতাসর সে যুগে সম্ভব না হলেও ব্যতিক্রম দেখা যেত কীর্তন-বাসরে।

মানদাসুন্দরীর খেয়ালাদি গানের বেশি আসর নিজের বাড়িতেই হত। গান শোনাতেন মুজরো নিয়ে। তবে যে কোন ব্যক্তির পক্ষে অবারিত দ্বার নয়। পরিচিত কোন সূত্রের প্রয়োজন হত। কিছু স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতেন গায়িকা, পেশাদার হলেও। মুজরো করতেও যেতেন কলকাতার কোন কোন আসরে। কলকাতার বাইরে থেকেও ডাক আসত। শহরের আসর বসত বিশেষ ধরনের বাগান-বাড়িতে।

আসর থেকে গায়িকা বলে যে নাম, তা কিছু গণ্ডীবদ্ধ ছিল। কারণ তখনকার সঙ্গীত-সমাজ তো সেইরকমই। কিন্তু গ্রামোফোন রেকর্ডের মাধ্যমে তাঁর নাম সঙ্গীতপ্রিয় বাঙলীর ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়।

মানদার রেকর্ড হয় অন্তত ৫৫খানি গান। আরো ছিল কিনা নিশ্চিত বলা যায় না। কারণ সম্পূর্ণ তালিকা অপ্রাপ্য। কিন্তু সে যুগের নিরিখে তাঁর রেকর্ডের সংখ্যা খুবই বেশী। তখন রেকর্ড করা যেমন কঠিন ছিল যন্ত্রপাতির কারণে, প্রচারও হত কম। গ্রামো-ফোনের সেই প্রথম পর্বে মানদার কাছাকাছি রেকর্ড করেন আর মাত্র দুজন। পান্নাময়ী ও কৃষ্ণভামিনী। লালচাঁদ বড়ালের রেকর্ড-সংখ্যা মানদার অর্ধেক। অবশ্য লালচাঁদ অল্পায়ু না হলে যে আরো রেকর্ড করতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মানদার রেকর্ড-সঙ্গীত পরিমাণের সঙ্গে গুণেও লক্ষ্য করবার

মতন। গানের মান চটুল করে তিনি লোকপ্রিয় হননি। বরং মার্জিত, উন্নীত করেছিলেন রেকর্ড-শ্রোতাদের সঙ্গীত-রুচি। বাংলা খেয়াল, বাংলায় টপ্‌খেয়াল শুনিয়ে তাঁদের কান তৈরি করে দেন।

একটি হিন্দী গান আছে তাঁর তালিকায়। 'এ বিরহী শুনো শুনো বচন হমারি'—ইমনে গাওয়া। গানখানি ছোট খেয়ালের সুন্দর নমুনা। আসরে যে পূর্ণাঙ্গ খেয়াল গাইতেন, রেকর্ডে তার সময়াভাব। এই তিন মিনিটে তান বিস্তারের সুযোগ নেই। তবু তান করেছেন অল্পস্বল্প। বাণী আরম্ভের আগে ইমনের স্বর-বিন্যাস শুনিয়েছেন। তারপরই জমিয়ে ধরেছেন—এ বিরহী শুনো শুনো বচন হমারি। বেশ মনোহারী শোনায় শিক্ষিতপটু গায়িকার কণ্ঠ।

ইমনটি ভিন্ন তাঁর অন্য সব গানই বাংলা। তার মধ্যে দুখানি কীর্তনাঙ্গ। 'এস এস রসিক নেয়ে' ও 'ও আমার সুন্দর না'। মানদা যে উৎকৃষ্ট কীর্তন-গায়িকা ছিলেন, তার আভাস আছে এই রেকর্ডে। পূর্ণাঙ্গ পদাবলী তিনি কীর্তন আসরে শোনাতেন।

তাঁর বাকি সব রেকর্ডের গান ছোট খেয়াল আর টপ্‌খেয়াল ধরনের। বাংলা খেয়ালাঙ্গও বলা যায়। কোন কোন গানের কাব্য অংশ দীর্ঘ। তাই তানের অবকাশ পাননি, যেমন—'আর কবে দেখা দিবি মা হর রমা'। কিন্তু অন্য গানগুলির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন অল্প তানে। গানের ভাব কথার তানে শ্রুতিমধুর হয়েছে। মোলায়েম বোল তানের ধরনে গভীর হয়ে ফুটেছে বাণীর আবেদন। মানদার টপ্‌খেয়ালের মুন্সিয়ানা তিন মিনিটের রেকর্ডেও কিছু ধরা আছে।

সঙ্গীত-রসিক অমিয়নাথ সান্যাল এক জায়গায় বলেছেন, 'উত্তম উত্তম টপ্‌খেয়ালও শুনেছি বাংলার গায়িকাদের মুখে। এঁদের মধ্যে মানদাসুন্দরী ও কৃষ্ণভামিনীকে শীর্ষস্থানীয়া বলে মনে করতে বাধ্য হয়েছি।' (বেতার জগৎ, ৩৩ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, পৃঃ ৫২১)

যথা কথা। মানদার রেকর্ডও তার সংক্ষিপ্ত প্রমাণ। আর

সংক্ষেপে রাগসঙ্গীত ও কাব্যসঙ্গীতের যুগল মিলন যেন। রাগ-রূপে পরিবেশিত হয়েও বাংলা গানে রস সৃষ্টি।

কলাবতীর সুরেলা, সুমিষ্ট কণ্ঠ। পরিমার্জিত প্রস্তুতি। নিটোল স্বরে পরিচ্ছন্ন উচ্চারণ ও গায়ন-ভঙ্গিমা। দরদী, হৃদয়স্পর্শী এক একটি গান। অনুভবে আবেগে সপ্রাণ। পরিমিতি বোধের জন্যে খেয়াল, টপ্পার ছোট ছোট তান বাংলা গানে মানিয়ে গেছে। ঈষৎ সুর-বিস্তার শোনা যায় কোন কোনটিতে। যেমন, 'আর কারো কাছে যাব না আমি' (মূলতান), কিংবা 'যে যাবার সে যাক সই রে' (পূরবী), কিংবা 'যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে' (ভীমপলশ্রী)।

গায়িকার গলার তবিয়ৎও লক্ষ্য করবার। তারা গ্রামের পঞ্চম ধৈবতেও অনায়াস অটুট সুরেলা। নেই কোন স্বরবিকৃতি।

রাগের রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন সাবলীলভাবে। একটি ভৈরবীতে ('ও মা দয়াময়ী কোন গুণে তোর…') মুন্সিয়ানায় দুই মধ্যম প্রয়োগ করেছেন। সব গানেই স্বচ্ছন্দ সুরপ্রবাহ। কোন চেষ্টা বা আড়ষ্টতা-রহিত। কি প্রেমসঙ্গীত, কি ভক্তিভাবের গান সকলই আন্তরিকতাময়।

শিল্পীর আবেদন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে শ্রোতার হৃদয়-তটেও। কেদারার গানখানি কি সুন্দর অনুভব জাগায়—

কতবার আসিয়া কত ভালবাসিয়া
গিয়াছি ফিরিয়া কত কাঁদিয়া কাঁদিয়া…

এ তো শুধু স্বরবিন্যাসের ছকে গেয়ে যাওয়া নয়। মিড় দিয়ে দিয়ে কি মিষ্টি করে গাওয়া। কথার পরে কথার ভাবে, সুরের পরে সুরের তরঙ্গিণীতে মিলিয়ে মিশিয়ে দেওয়া। এক স্বর অঙ্গাঙ্গী সুরে লীন হয়ে যায় স্বরান্তরে। বাণীর 'বার' 'আসিয়া' 'বাসিয়া' 'গিয়াছে' 'কাঁদিয়া'-তে কি মধুর মিড়ে মোচড়ে শ্রোতার মর্ম সিঞ্চিত করে দেয়। কেদারার কোমল কারুণ্যে হাহাকার করে বিরহিণীর মথিত অভিমান—

কত নিশি জেগেছি কতই বা কেঁদেছি
তবু সাড়া পাই না সাধিয়া সাধিয়া ॥

কি প্রতপ্ত আবেগ আকুল হয়ে ওঠে তারা গ্রামে—

হে নাথ কোথা তুমি দেখা দাও দেখা দাও,
আমি যে তোমারি, কোলে তুলে নাও নাও···

দরদী স্বরের আর্তিতে ধ্বনিত হয়ে ওঠে 'দেখা দাও দেখা দাও, আমি যে তোমারি, কোলে তুলে নাও নাও' এই আত্ম-নিবেদন। দীর্ণ মর্মের যন্ত্রণা শেষ চরণের দোলায়িত ছন্দে ঝঙ্কৃত হতে থাকে—

সহে না সহে না আর আসা যাওয়া বার বার
নিয়ে আসে নিয়ে যায় মাতিয়া মাতিয়া ॥

চির-দয়িতার চির-অতৃপ্তির কাঁদন!

তেমনি মূলতানের গানটিতে মূর্ত হয়েছে একান্ত প্রাণের প্রেমাবেশ—

আর কারো কাছে যাব না আমি
তোমারি কাছে রব হে।
আর কারো সনে কব না কথা
তোমারি সনে কব হে ॥

চিরন্তনী বাসনা, যা চিরদিনই অপূর্ণ থেকে যায়!

কিংবা মিশ্র সাহানার সেই মরমীয়া গানখানি। অল্প কথার তানে ভাবও এখানে কেমন সুষমাময়—

তোমারি প্রেমেব কথা হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা।
নিশিদিন জাগে মনে সোহাগের তব কথা ॥
কত কথা ছিল মনে,
কত আশা ছিল প্রাণে,
সে আশাদল শুখায়েছে,
সে ভুল ভেঙ্গে গেছে,
এত প্রাণ সয়েছে, কহিতে প্রাণে ব্যথা ॥···

আশাবরীর গানটিতে শিল্পী কেমন তান করেছেন, কাব্যের মাধুর্য অক্ষুণ্ন রেখে—

আমায় ভালবাস না বাস,
আমি ত কখন তোমার ছাড়িব না আশ ॥
যথায় তথায় থাকি,
তোমা ছাড়া হইনে সুখী,
মারিলে মারিতে পারো,
রাখিলে তোমার পাশ ॥

হাম্বীরের 'লাজে মরে যাই' গানে টপ্পার চমৎকার দানাদার তান দিয়েছেন। আবার শেষে যোগ করেছেন তারাণা।

'প্রাণপণে প্রাণ স'পলাম যারে' বাগেশ্রীতে সুন্দর খটকার কাজ দেখিয়েছেন।

রাগের সঙ্গে ভাবের মিলনের আরেকটি উদাহরণ। ছোট খেয়াল অথচ উপভোগ্য কাব্যসঙ্গীত—

যে যাবার সে যাক সই রে,
আমি ত যাব না জলে।
ভরিয়া এনেছি কুম্ভ নয়ন সলিলে ॥

এ গানে পূরবীর সকরুণ রেশ গানের শেষেও প্রাণে রণিয়ে ওঠে।

তাঁর খাম্বাজে একটি চমৎকার গান দরদ দিয়ে গাওয়া—

যাতনা দিতে আমারে আর কি রেখেছ তুমি
গরলে সরল ভেবে হয়েছিলাম অনুগামী ॥

কোন কোন গানের আরম্ভেই তান দিয়ে গায়িকা গানের ডৌলটি দেখিয়েছেন। যেমন বেহাগে 'ওই যে বাঁশরি বাজিল বিপিনে'। সিন্ধুতে 'এখনও কি ব্রহ্মময়ী' (নাটোর-রাজ, সাধক রামকৃষ্ণের রচনা)। সোহিনীতে 'ওই যে বাজিল বাঁশরি যমুনা পুলিনে'। মিশ্র ভৈরোঁতে 'মা তোমার এ কোন্ দেশী বিচার'। ইমনে 'এ বিরহী শুনো শুনো বচন হমারি', ইত্যাদি।

মানদার ভক্তি-ভাব ও পূজার গানগুলিও সুর আর গায়ন-রীতিতে উপযুক্ত। 'সাধে কি করুণাময়ী করি মা তোমার উপাসনা'য় পূরবী সার্থক হয়েছে। আবার ভাব প্রকাশে সহায়তা করেছে বিলম্বিত লয়ের ছন্দ।

সঙ্গীতরূপে শিল্পীর রসসৃষ্টি প্রায় সমস্ত গানেই। আর দৃষ্টান্ত না দিয়ে তাঁর গ্রামোফোন রেকর্ডের একটি তালিকা করে দেওয়া হল—এ তালিকার বাইরেও কোন রেকর্ড আছে কিনা বলা যায় না।

(১) প্রাণপণে প্রাণ সঁপলাম যারে—বাগেশ্রী।
(২) আর কারো কাছে যাব না আমি—মূলতান।
(৩) এ প্রেম ছলনা—ইমন।
(৪) যে যাবার সে যাক সই রে—পূরবী।
(৫) লাজে মরে যাই—হাম্বীর।
(৬) কতবার আসিয়া কত ভালবাসিয়া—কেদারা।
(৭) যাতনা দিতে আর বাকি কি রেখেছ তুমি—খাম্বাজ।
(৮) ওই যে বাঁশরি বাজিল বিপিনে—বেহাগ।
(৯) তোমারি প্রেমের কথা হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা—সাহানা মিশ্র।
(১০) এখনও কি ব্রহ্মময়ী হয়নি মা তোর—সিন্ধু।
(১১) চিরদিন কি এমনি যাবে কালী বল না—ইমন কল্যাণ।
(১২) কলুষ বিনাশিনী কালী ও মা—তোড়ি ভৈরবী।
(১৩) আর কবে দেখা দিবি মা হর রমা—হাম্বীর।
(১৪) ওই যে বাঁশরি বাজিল যমুনা পুলিনে—সোহিনী।
(১৫) আমায় ভালবাস না বাস—আশোয়ারি।
(১৬) মা তোমার এ কোন্ দেশী বিচার—ভেঁরো মিশ্র।
(১৭) ওমা দয়াময়ী কোন্ গুণে তোর—ভৈরবী।
(১৮) আর বাঁশি বাজায়ো না শ্যাম—বেহাগ খাম্বাজ।
(১৯) মনের সাধে শিবের হৃদে—ভৈরবী।
(২০) হরি হে কে জানে তব—ভীমপলশ্রী।

(২১) শুনো শুনো বচন হমারি, এ বিরহী—ইমন।

(২২) সাধে কি করুণাময়ী—পূরবী।

(২৩) এস এস বলে রসিক নেয়ে—কীর্তন।

(২৪) ও আমার সুন্দর না— ,,

(২৫) যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে—ভীমপলশ্রী।

(alias প্রতিভা দাসী)।

(২৬) পীরিতি করেছি বিসর্জন, ওগো—খাম্বাজ।

(২৭) প্রাণ আমার কাহারে জানাব—ভৈরবী।

(২৮) কেন মন চায়—খাম্বাজ মিশ্র।

(২৯) হারে রে রাম নাম নিতি- ভৈরবী।

(৩০) বাঁশরি বাজিল যমুনায় (ওগো শ্যামের)—ভীমপলশ্রী।

(৩১) এস রে নয়নে, তোমায় লুকায়ে রাখি—ভৈরবী।

(৩২) আমি তোমার জন্যে কাঁদি—ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

(৩৩) আর জলে যাওয়া হল না (আমার)—খাম্বাজ।

(৩৪) রাধা নামে অভিলাষী রাধা নামে সাধা বাঁশি— ভৈরবী।

(৩৫) অঞ্চল ছাড় চঞ্চল শ্যাম ওহে গুণধাম—কাফি সিন্ধু।

(৩৬) শ্যাম রাখি কি কুল রাখি সই—খাম্বাজ।

(৩৭) চরণ ছাড়িয়ে কেন দাও না—কানাড়া মিশ্র।

(৩৮) আমি আমি করি বুঝিতে না পারি—ভেঁরো মিশ্র।

(৩৯) আমায় পিছন থেকে কে যেন ডাকে—ভৈরবী।

(৪০) কে বলে তারিণী তোমায় কালোবরণী—ভৈরবী।

(৪১) জানি না কি বলে ডাকি শ্যামা মা—খাম্বাজ।

(৪২) দেহি শ্রীচরণ জুড়াক এ প্রাণ—ভীমপলশ্রী।

(৪৩) সেথা আমি কি গাহিব গান (রজনীকান্তের রচনা)

—গৌরী।

(৪৪) (সখি) তারে ভুলিব কেমনে—ঝিঁঝিট।

(৪৫) (আমায়) বল সখি মনোবেদনা কব কারে।

(৪৬) (সদা) কালী কালী কালী বল মন—রামকেলী।

(৪৭) কালী করুণাময়ী শিবাণী অভয়া—পিলু মিশ্র।

(৪৮) ঐ ভয়ে মুদি নে আঁখি—সিন্ধু কাফি।

(৪৯) মা আমার কি এমন দিন হবে—সিন্ধু ভৈরবী।

(৫০) সখি রে মরমে পরশে তারি গান—ভূপালী।

(৫১) সে কেন রে করে অপ্রণয়।

(৫২) সই রে তারি রূপ মনে পড়ে—পরজ।

(৫৩) মাঝে মাঝে তব দেখা পাই—সিন্ধু।

(৫৪) আমায় ছজনায় মিলে পথ দেখায় বলে।

(৫৫) ডুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি।

শেষের তিনটি গান রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুরে মানদা গাননি। যেমন, 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই' গানখানি রবীন্দ্রনাথ গঠন করেন কীর্তনাঙ্গে। কিন্তু গায়িকা সেটি সিন্ধুতে টপ্পার তান যোগে নিজস্ব ধরনে গেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সুরের কথা মনে না রাখলে, সেকালের একটি বাংলা টপ্পাঙ্গ গানের নিদর্শন হিসেবে ধরা যায় এটিকে। সে যুগের এক গুণী টপ্‌খেয়াল ও খেয়াল-গায়ক ছিলেন ভাগলপুরের সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনিও 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই' টপ্পার তান দিয়ে গাইতেন। রবীন্দ্রনির্দিষ্ট সুরের পরিবর্তে আপনাপন ইচ্ছানুযায়ী রবীন্দ্রনাথের গান গাইবার দৃষ্টান্ত শুধু তাঁরা নন। গহর জানের কথা বলা হয়েছে তাঁর অধ্যায়ে। আরো ছিলেন কৃষ্ণভামিনী, পূর্ণকুমারী, পিয়ারা সাহেব, ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কে. মল্লিক প্রমুখ। তাঁরা স্বেচ্ছাকৃত সুরে রবীন্দ্রনাথের গান শোনাতেন। কেউ গ্রামোফোনে, কেউ বা সাধারণ আসরে। মানদাসুন্দরী ভিন্ন অ-রবীন্দ্র সুরে তাঁর গান রেকর্ড করেছেন পূর্ণকুমারী, কৃষ্ণভামিনী, ব্রজেন্দ্রনাথ। আগেকার কালে এমন চলত।

মানদাসুন্দরীর গানের আংশিক পরিচয় আছে রেকর্ডে। তাঁর

সম্যক গুণপনা আসরেই প্রকাশ পেত।

শিল্পীর এই অন্তরসত্তা-রূপ সুন্দর মনোমন্দির।

আর লৌকিক পরিচয় কিরণময়ীর মতন ছায়ারহস্যে ঘেরা। জীবন-কথা সামান্য মাত্র উদ্ধার করা যায় সেই আলো-আঁধারি থেকে।

প্রায় শ'খানেক বছর আগেকার দক্ষিণ কলকাতা। ভবানীপুরে হাজরা পার্কের পশ্চিমে একটি চিহ্নিত এলাকা, রামকৃষ্ণপুরে সন্ধ্যা-বাজারের পাশে যেমন। হাজরা পার্ক পার হয়ে হাজরা রোড আরো পশ্চিমে গেছে। সে রাস্তার উত্তরে এক নিষিদ্ধ পল্লী।

সঙ্কীর্ণ গলিঘুঁজি নিয়ে সেই অঞ্চলটি। তার উত্তর-পশ্চিমে ধাঙড়দের বস্তি। বাকি সব জায়গা নিয়ে বারবধূদের বাস।

তার মধ্যে একটি গলি কিছু সুপরিসর। সেটি উত্তরে বন্ধ। দক্ষিণে, হাজরা রোডের দিক দিয়ে সেখানে যাতায়াত হয়ে থাকে।

সে পল্লীতে ছোট মাঝারি নানা আকারের ঘর আর বাড়িও। পাকা দোতলা একতলাও যেমন, তেমনি আছে টালির ঘর, টিনের চালা। অসচ্ছল থেকে অবস্থাপন্ন—নানা স্তরের।

লণ্ঠনের আলোয় দরজায় দাঁড়ানোদের সংখ্যাই বেশি। আবার কজন বিশিষ্টা অন্তরালবর্তিনীও।

এলাকার পশ্চিম দিকে সুস্থ সমাজের গৃহস্থ পাড়া। দক্ষিণে হাজরা রোডের পারেও যেমন।

আর এত নিকটে থেকেও আদিম কলঙ্কিত জীবিকার শিকার এখানকার নিবাসিনীরা।

তার মধ্যে কখনো বা ঘর-সংসারও দেখা যায়। সবই মাতৃতান্ত্রিক পরিবার। পিতৃ-পরিচয় কচিৎ প্রকাশ।

সন্ধ্যের পর সেসব গলিতে টিম্‌টিম্ করে গ্যাসের আলো। তাতে অন্ধকার ভাল কাটে না। সেখানকার আগন্তুকরাও হয়ত চায় সেই আবছায়া। মিটমিটে আলোয় সেই ক্ষণিকের অতিথিরা আসে।

তারা কিন্তু সামাজিক জীব। হতভাগিনীদের জীবিকার সংস্থান করতে যায় সমাজ থেকেই। আবার রাতের অন্ধকারে সমাজেই ফিরে থাকে।

মানদা-জননী এ পাড়ার এক বিশিষ্টা বাসিন্দা। তাঁর নিজস্ব আবাস। অর্থাৎ পরস্মৈপদী সম্পত্তি। তিনি অন্য পর্যায়ের। কন্যার মতন সঙ্গীতগুণ ছিল না বটে। কিন্তু রূপবতী। তেমন তেমন কোন নির্ধারিত বিলাসীর সঙ্গে তাঁর সংস্রব।

কোন নাট্যমঞ্চের কর্তৃপক্ষ এককালীন তাঁর নাকি অনুরাগী পোষক ছিলেন। আর সে সঙ্গতিপন্নার তীর্থস্থানে দান-ধ্যান ছিল পরিণত বয়সে। জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর এখানেই বাস।

ই পরিবেশে মানদার আবাল্য জীবন। তবে ধরনধারণে কিছু ভিন্ন প্রকার। মায়ের দৃশ্য-রূপ পেয়েছিলেন। আর জননীর যা ছিল না, সেই কলাবতী হয়েছিলেন মানদা। তার প্রস্তুতিপর্বের এই মাত্র সংবাদ জানা যায় যে, ওস্তাদ বিশ্বনাথ রাওয়ের তালিম অনেক-দিন পেয়েছিলেন। আর সঙ্গীত-বৃত্তিই হয় জীবনের অবলম্বন। কীর্তন তিনি কার কাছে শিখেছিলেন, সেকথা জানা যায়নি।

পেশাদার গায়িকা হিসেবে মানদাসুন্দরী অত্যন্ত সফল হয়ে-ছিলেন। সমাদর স্বীকৃতিলাভের সঙ্গে উপার্জনও হতে থাকে দস্তুরমত। আর তাঁর প্রায় পরিণত বয়সে সামাজিক ধারণায় পরিবর্তন দেখা দেয়। অর্থাৎ আধুনিক যুগের সূত্রপাত। শিল্পীর সম্মানে মানদাও তখন স্থান পান একেকটি গৃহাসরে। তার গুরুত্ব যথেষ্ট। কারণ, সম্মেলন-পূর্ব যুগে সেইসব ঘরোয়া আসরই ছিল প্রকাশ্য গুণপনা প্রদর্শনের মঞ্চ। তেমনি আসরে মানদা যোগ দিতেন শ্রেষ্ঠ কলাবৎদের সঙ্গে, একাসনে।

আসরের মুজরো, গ্রামোফোনের আয়, কীর্তন-বাসরের দক্ষিণা। সবের জন্যেই গায়িকার অতি সচ্ছল জীবনযাত্রা। জননীর"উত্তরা-ধিকারও হয়ত ছিল।

গ্লানিময় ছিল না নাকি তাঁর জীবন যাপনের ধারা। বহুবল্লভা নন মানদা আর মার্জিত রুচিতে আত্মমর্যাদাসম্পন্না। বহিরঙ্গ রূপেও তার প্রতিফলন দেখা যেত। হাব-ভাব অবয়বে এক 'আভিজাত্য', যা এ সমাজে দুর্লভ-দর্শন।

হাজরা রোডের উত্তরে সেই গলিতে পাশাপাশি তিনখানি বাড়ি তাঁর। মাঝেরটি তুলনায় কিছু বড়। সেখানেই বসবাস করে গেছেন আমৃত্যু।

সে গৃহের সদরে মর্মর ফলকে লেখা—মানদা ভবন।

গানের জন্যে তো খুবই বিখ্যাত হয়েছিলেন। এ অঞ্চলে তাই সকলের পরিচিত থাকে তাঁর নাম। এমন কি, সেই বসত বাড়ির সরু রাস্তাটিকে লোকে বলে—মানদার গলি।

আরো একজন নামী গায়িকার বাস এই গলিতে ছিল। মানদা ভবনের উত্তর দিকে। প্রসিদ্ধা কীর্তন-গায়িকা হেমাঙ্গিনী। শুধু কলকাতায় নয়, বাংলার নানা জেলা থেকেও হেমঙ্গিনীর ডাক আসত কীর্তনের আসরে।

মানদার সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর হৃদ্যতা দেখা যেত। অতি নিকট প্রতিবেশিনী। মানদার একটি বাড়ির পরেই হেমাঙ্গিনীর বাস। ঈর্ষার ভাব ছিল না, সমব্যবসায়িনী হলেও। বরং দুজনের সহযোগিতা দেখা যেত। গানের ব্যাপারে আদান-প্রদান। কোনদিন হয়ত হেমাঙ্গিনীর হারমোনিয়ম আসত মানদার বাড়িতে। জানলায় মাথা কাত করে হেমাঙ্গিনী দেখতেন, প্রিয় দামী হারমোনিয়মটি বাহক ঠিকমত আনছে কিনা।

সেই হেমাঙ্গিনীর পুত্র সতীশ ঘোষ। পরে কলকাতায় এক উৎকৃষ্ট কলাবৎ হন। যেমন খেয়াল তরানার গায়ক। তেমনি গুণী তবলিয়া।

পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত থাকে এ পাড়ার সন্তানদের। কিন্তু সতীশচন্দ্রের ঘোষত্ব কি করে ঘোষিত হল, কে জানে।

হেমাঙ্গিনী মানদার প্রায় সমবয়সিনী। কীর্তন ভিন্ন অন্ত গান গাইতেন না। সেজন্তে তাঁর গানের আসর হত না সে বাড়িতে।

কিন্তু মানদার আসর নিজের ঘরে প্রায়ই হয়ে থাকে। মানদা ভবনের দোতলায়।

কক্ষটি মাঝারি আকারের। কিন্তু ভালভাবে সাজানো। ওপরে আলোর একটি ঝাড়। ঘরের অনুপাতে সেটি বড় বলতে হয়। তিন দিকের দেয়ালেই একেকটি প্রমাণ মাপের আয়না। দামী, ভিনিশীয় তৈরী। মেঝে ভাল কার্পেটে ঢাকা।

মানদার অনেক দিন-রাতের সঙ্গীত-সঙ্গে ধন্য সেই ঘর। কত নিস্তব্ধ নিশীথে সে পল্লীর পশ্চিমে, দক্ষিণের বাড়ি থেকে লোকে শোনে তাঁর গান।

মানদা ভবনে বিশ্বনাথ রাও এসেছেন শিক্ষক রূপে। গুরুর সঙ্গে ছাত্রীর সাঙ্গীতিক যোগাযোগ অনেকদিন পর্যন্ত থাকে। বিশ্বনাথজীর সঙ্গে কখনো আসতেন কোন শিষ্য। গুরু-ভগ্নীর কাছে সঙ্গীত সম্পর্কে। ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী এইভাবে এসেছেন। কিছু সৌখিন লোককে দেখা গেছে মুজরো দিয়ে মানদার গান শুনতে।

কিন্তু-সঙ্গীত জগতের বাইরে থেকেও কিছু ব্যক্তির আগমন মানদা ভবনে ঘটত। তার কারণ একেবারে ভিন্ন। তাঁদের বলা যায় সমাজসেবী বা দেশসেবী।

সঙ্গীত ছাড়া আরো কিছু মহৎ গুণও পতিতার ছিল। দেশের প্রতি ভালবাসা স্থান পেয়েছিল তাঁর হৃদয়ে। বিপ্লবীদের তিনি সহায়তা করতেন গোপনে, এই জনশ্রুতি। বন্যাত্রাণ ও অন্যান্য দেশ-সেবার কার্যেও অর্থ দিতেন। অসহযোগ আন্দোলনেও নাকি সহানুভূতি ছিল গায়িকার। সেই জাতীয় আলোড়ন কোন কোন নটীর প্রাণেও সাড়া জাগায়। যেমন, পুরানো আমলের অভিনেত্রী নীরদাসুন্দরী। মানদাও তেমনি একজন।

এককালে একটি বইয়ের খুব প্রচার হয়েছিল—'শিক্ষিতা পতিতার

আত্মচরিত—মানদা দেবী প্রণীত।' গায়িকা মানদাসুন্দরী সে লেখিকা নন। বইটি জাল। 'মানদা দেবী' নামে কোনও নারীর রচনাও তা নয়। অসাধু লেখকের ব্যবসায়িক ফন্দী মাত্র।...

গ্রামোফোন রেকর্ডে গায়িকার নাম মুদ্রিত থাকত—'মানদা-সুন্দরী দাসী।' রেকর্ড সঙ্গীতের পুস্তকাদিতেও তাই। শিল্পী নিজেও 'দাসী' পরিচয় দিতেন। দস্তখৎ করতেন সেইভাবে। সেকালে সেই বিনীত আচরণেরই চলন ছিল। স্বয়ং-আখ্যাতা 'দেবী'-কুলের আবির্ভাব হয় অনেক পরে। মানদাসুন্দরীদের অমন অদ্ভুৎ দাবীদার হওয়া স্বপ্নাতীত। দেখে শুনে রাজশেখর বসু মশায় বেশ টিপ্পনী কেটেছেন—এ যুগের সিনেমাওয়ালীরা দেবীদের জাত মেরে দিয়েছেন!

যাক সে কথা। গায়িকার একটি রেকর্ডে ('যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে') দেখা যায়—'Manda Sundari Dasi alias Prativa Dasi' অর্থাৎ মানদাসুন্দরী দাসী ওরফে প্রতিভা দাসী।

কৌতূহল জাগায় মানদার এই প্রতিভা নামটি। যেন আধুনিক ভাবের কিংবা গৃহস্থ-কন্যার স্মারক। সে যুগের নটীদের এ ধরনের নাম প্রচলিত ছিল না। তাঁদের পরিচিতি থাকত 'বালা', 'সুন্দরী', 'ময়ী' ইত্যাদি যোগে।

প্রতিভা কি তাঁর নিজস্ব নাম বা 'পিতৃ'দত্ত, অথবা জীবনসঙ্গীর সম্বোধিত? এই মার্জিত নামের অন্তরালে কোন উল্লেখযোগ্য পরিচয় আত্মগোপন করে আছে কিনা কে জানে। গায়িকার প্রতিকৃতিও যেন আভাস দেয় কোন সুভদ্র উৎস।...

জীবনের শেষদিকে অন্য রূপে দেখা যেত মানদাকে। এ অঞ্চলের লোকেরা তাঁকে প্রত্যহ দেখতেন। গানের আসরে নয়। সকাল-বেলা তিনি যেতেন গঙ্গাস্নানে।

নিযুক্ত ট্যাক্সিটি গলির মোড়ে হাজরা রোডে এসে দাঁড়ায়। এক

বৃদ্ধ শিখ তার চালক। হর্ণ শুনে মানদা এসে বসেন গাড়ির পিছনের সীটে। হাজরা রোডটুকু পার হয়ে হরিশ মুখার্জী স্ট্রীট বরাবর ট্যাক্সি চলে যায়। উত্তরে, বড় গঙ্গার দিকে।

প্রতিদিন সকাল সাতটা সাড়ে সাতটার সময়।

তখন নতুন কেউ সামনে থাকলে এ পাড়ার লোক তাকে দেখায়। ট্যাক্সির দিকে সম্ভ্রমের সঙ্গে চেয়ে, বলে, 'ওই গাড়িতে মানদাসুন্দরী। মস্ত বড় গাইয়ে।'

আরো পরে দৃষ্টিশক্তি হারাল গায়িকা। তখন থেকে গঙ্গাস্নানে যাওয়াও বন্ধ। পাড়ার লোকেরা আর তাঁকে সকালে দেখতে পায় না।

তবে অতিথিরা তাঁর সাক্ষাৎ পেতেন মানদা ভবনে। বহুদিনের ব্যবহার করা সেই দোলতার ঘরটিতে। দেয়ালে হাত দিয়ে এসে আন্দাজ করে মানদা বসেন। গান একেবারে অন্তর্ধান করেনি এ পর্বেও। সংবাদ পাওয়া যায় এই পর্যন্ত।

তারপর কবে সে সঙ্গীত স্তব্ধ হয়ে যায়, শেষ নিঃশ্বাস পড়ে সেই শীর্ষস্থানীয়া টপ্ খেয়াল গায়িকার—সংবাপত্রেও সে খবর স্থান পায় না।

অবশেষে সেই পল্লী, সেই গলি, মানদা ভবন, গ্যাসের আলো লুপ্ত হয়ে যায় সবই। মানদার মৃত্যুর কয়েক বছর পরে।

সমস্ত এলাকাটি ধূলিসাৎ করা হয়। নগর কলকাতার সে এক নবীকরণের অভিযান। উন্নয়ন পরিকল্পনার এক রূপায়ণ ঘটে হাজরা পার্কের পশ্চিম বরাবর।

পুরাতনের অবলোপে নতুন বসতি গড়ে ওঠে।

মানদাসুন্দরী হেমাঙ্গিনীদের অঞ্চল, তার উত্তর-পশ্চিমের ধাঙড় বস্তি সমস্ত নিশ্চিহ্ন করে দেখা দেয় আধুনিক রূপ। নতুন নতুন বাড়ির সারি। সামাজিক গৃহস্থ পরিবার। সুপরিসর, বিদ্যুৎ 'আলোর পথ। নব লোকালয়া-নতুন বাজার। বিপণি শ্রেণী...

শুধু স্মৃতি থাকে, সে সঙ্গীতকণ্ঠের কিছু নিদর্শন চিহ্ন অবলম্বন করে। নিত্যকালীন আনন্দলোকের নান্দনিক। সুন্দরের মন্দিরে যে কলাবতী সুরের আরতি করেছিলেন তারই বিচিত্র অনুরণন। কোন্ সুদূরের অচিন্ পাখির সুর তোলা শ্রোতার হৃদয় কন্দরে।

আর সেই আসরের কথা। একটি আসরের সূত্রে আরেকটি প্রসঙ্গ। এক প্রদীপের শিখা থেকে অন্য দীপ জ্বালানো।

মানদার গলি আর মানদা ভবন তখনো কালগ্রাসে পড়েনি। নিশুতি রাতে দোতলার সেই ঘর থেকে ভেসে আসে সুরেলা গলার গান, তখনকার কথা। ১৯২৭ সালে গ্রীষ্মের সময়।

ল্যান্সডাউন রোডের নাটোরভবনে সেদিন আসর বসেছে। মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ তখন পরলোকে। সঙ্গীতচর্চার ধারা বজায় রেখেছের পুত্র যোগীন্দ্রনাথ। সে আসরের সময় গুরু বিশ্বনাথজীও ছিলেন না। হয়ত তাঁরই সূত্রে আসেন শিষ্যা মানদা। আরো কজন কলাবৎ এসেছিলেন। বেশ বড় আসর হয়েছে একতলার প্রশস্ত কক্ষে।

ফৈয়াজ খাঁ খেয়াল গাইলেন। গোয়ালিয়রের মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ও শোনালেন সেই রীতির গান।

কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ দাস এমন মেয়েলি গলায় বাইজীদের ঢঙে ঠুংরি গাইতেন যে তাঁর নাম হয়ে যায় 'সুরেন বাইজী'। কাশীর ওস্তাদ বড়ে রামদাসজীর ভাল ছাত্র তিনি। চতুরঙ্গ গানেও মুন্সিয়ানা দেখাতেন। এ আসরে ঠুংরি গাইলেন সুরেন্দ্রনাথ।

খেয়াল ও টপ্পাগায়ক বিজয়লাল মুখোপাধ্যায় খেয়াল শোনালেন। আর সেতার, সুরবাহার বাজালেন বাংলার এক দিকপাল যন্ত্রী জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। আরো কজনের গান সেখানে হয়েছিল।

মানদা গেয়েছিলেন খেয়াল।

কিন্তু তাঁর গান বেশিক্ষণ হয়নি। আরো হতে পারত খানিকক্ষণ।

সকলের আরো শোনবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আর গাইলেন না মানদা।

জিতেন্দ্রনাথের সঙ্গে তবলিয়া পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় সঙ্গত করেছিলেন।

তাঁর মনে আছে—'বেশ ঠাস লয়ে মানদা গাইছিলেন এক-তালায়। গান খুব জমে উঠেছিল। কিন্তু যেন হঠাৎ তিনি শেষ করে দিলেন। কেন যে থেমে গেলেন, বোঝা যায় না। জমাট গান এমনভাবে বন্ধ করতে দেখে অনেকেরই আশ্চর্য লাগল। কেউ যেন কিছু বললেন মনে হচ্ছে। তার উত্তরে মানদা বললেন, 'আজকে আর থাক।' তাঁকে দেখে মনে হয় বেশ রাশভারি।'

সে আসরেই মানদার কথা হয়েছিল জিতেন্দ্রনাথের সঙ্গে। ভট্টাচার্য মশায়ের বাজনা তিনি আগেও শুনেছিলেন। মৌখিক আলাপও ছিল তাঁর।

কিন্তু তাঁর প্রতি মানদার কতখানি শ্রদ্ধা, তাঁকে একদিন নিজের বাড়িতে গান শোনাবার ইচ্ছা মনে মনে কিরকম পোষণ করতেন, তা এই আসরে জানা গেল।

তখন জিতেন্দ্রনাথের বাজনা হয়ে গেছে। আসরের এক পাশে মানদা তাঁকে প্রণাম করে বললেন, 'বাবা, বলতে সাহস হয় না। কিন্তু আমার অনেকদিনের ইচ্ছে। দয়া করে একদিন আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন কি? ভাল করে আপনাকে গান শোনাতে পারি?'

'কেন, মা', মানদার কুণ্ঠা লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'সাহস না হবার কি আছে?'

মাথা একটু নীচু করে গায়িকা বললেন, 'সবাইকার চোখে আমরা তো···অন্য শ্রেণীর···'

সেতার সুরবাহারের শিল্পী হয়ত অভিভূত বোধ করলেন। অন্তরের সঙ্গে জানালেন, 'তুমি তো আমাদের মতন এই বিদ্যা নিয়ে

আছ মা। এখানে অন্য কোন শ্রেণীর প্রশ্ন নেই। আমি যাব তোমার বাড়ি।'

কৃতার্থ বোধ করলেন মানদা। জিতেন্দ্রনাথ তাঁর গান শুনতে স্বীকৃত হয়েছেন!

তারপর নিজের তবল্‌চীকে দেখিয়ে বললেন, 'তাহলে ওকেও নিয়ে যাব '

স্নেহভাজন সঙ্গতকার পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'আমার সঙ্গে বাজায়। বেনারসের নান্নু সহায়ের ভাল তালিম পেয়েছে। ভাট্‌পাড়ায় বাড়ি।'

ভক্তিমতী সপ্রতিভ মানদা। জিতেন্দ্রনাথের কথা শুনেই দু হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, 'ভাটপাড়া? ব্রাহ্মণ পাণ্ডিতের জায়গা!'

তারপর তাঁকেও আমন্ত্রণ জানালেন, 'তাহলে, কাকাবাবু, আপনিই সেদিন বাজাবেন। অত দূর থেকে আপনার তবলা আনবার দরকার নেই। আমার বাড়িতে আছে।'

পরের সপ্তায় শনিবার তাঁদের দিন স্থির হল।

সেদিন সন্ধ্যার পর এলেন জিতেন্দ্রনাথ। সঙ্গে পঞ্চানন ও তাঁর এক বন্ধু। মানদা ভবনের দোতলার সেই ঘরটিতে।

অন্য কোন শ্রোতা নেই। শুধু তাঁদের জন্যেই আসর।

কার্পেটের একদিকে হারমোনিয়াম, তানপুরা, তবলা। অন্য ধারে গোটাকয়েক তাকিয়া। অতিথিরা সেইদিকে বসলেন।

অভ্যর্থনা করলেন মানদা। জিতেন্দ্রনাথের পদধূলি নিলেন। দু-চার কথার পর বললেন, 'একটু চা হবে তো, বাবা?'

'হ্যাঁ, তা...'

মানদা নিজে থেকেই বললেন, হয়ত আচার বিচারের কথা মনে রেখে, 'বাইরে থেকে আসবে। পাঁড়েজী এনে দেবে।'

দারোয়ান গোছের এক হিন্দুস্থানী চা আর কচুরি আলুর দম নিয়ে এল।

অতিথিরা জলযোগ করছেন, এমন সময় এলেন তাঁর তবল্‌চী মৌলা বখ্‌স্।

মানদাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'গানা হোগি ?'

'হাঁ। লেকিন্ আজ এই বাবু বাজাবেন। এঁর বেনারস বাজের তালিম।'

মৌলা বখ্‌স্ একপাশে বসে বললেন, 'তা আমি শুনতে পারি তো ?'

'হাঁ, হাঁ। কিঁউ নেহি ?

আজকের তবল্‌চী বাদে তিনজন মাত্র শ্রোতা। বাজনার দিকে বসে মানদা কোলে তুলে নিলেন তানপুরা।

ওপর থেকে ঝাড়ের আলো তাঁর মুখে পড়েছে। তার প্রাত-ফলনে দেয়ালে দেয়ালের আয়নায় মানদার প্রতিবিম্ব। বাহুল্য-বর্জিত তাঁর প্রসাধন। শুভ্র পরিধান। অলঙ্কারের একটি বৃহৎ আকারের মুক্তার লকেট তাঁর বুকে, চিকণ সরু হারের নীচে দৃশ্যমান। বাহুতে এক এক গাছি মুক্তার কঙ্কন।

মুখভাব থেকে তনুশ্রীতে বিচ্ছুরিত একটি দীপ্তি। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিল্পীর অভিব্যক্তি যেন।

তানপুরায় সুর মেলানো সম্পূর্ণ হল। সুগৌর সুডৌল দুটি অঙ্গুলি ভ্রমর-গুঞ্জন তুলতে লাগল চারটি তারে তারে।

পঞ্চানন তানপুরার সুরে তবলা বেঁধে নিতেই মানদা গান আরম্ভ করলেন। সদা প্রস্তুত, সাধা কণ্ঠে ধরে নিলেন—মুদ্‌রি মোরি কাহেকো···

আড়ানায় সেই বিখ্যাত বন্দিশের স্থায়ী কলি—

মুদরি মোরি কাহেকো ছিন্ লেয়ি তুরক ছেল্‌ওয়া
কাহে কিও ম্যয় তোর রে···

উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ। অতি বিলম্বিত লয়ে গাইতে লাগলেন উদাত্ত সুরেলা কণ্ঠে।

রাগের বাদী স্বরই তারা গ্রামের ষড়জ। মানদার পিক কণ্ঠ মধ্য থেকে তার সপ্তকে অবলীলায় সঞ্চরণ করতে লাগল। আর মুন্সিয়ানার সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু ফুটে উঠল তাঁর গানে। প্রাণের নিবিড় অনুভব স্বরের অঞ্জলীতে। ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র গুণীকে নিবেদনের এক পরম তৃপ্তির আস্বাদন। ধীর ছন্দ-কারুতে রাগের মনোহারী বিস্তার শুধু নয়। গভীর অন্তরের রূপায়ন।

তার আবেদন প্রবীণ কলাকারের চিত্তে সাড়া জাগাল। তিনি সাবাস দিতে লাগলেন সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষণে ক্ষণে।

গানের বাণী অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু তারই ওপর ভর করে সুরের অপরূপ বিগ্রহ গায়িকা গড়ে তুললেন।

অন্তরায় সে প্রতিমার পূর্ণতা—

ইত্‌না হি ইতরাত রঙ্গিলে মারে কাঁহা

অব মোর রে ॥

অজস্র সার্থক আসরের গায়ন-শিল্পী। অনেক মুজরো বিনা যাঁকে শোনায় সুযোগ মেলে না। তিনি আজ রসসৃষ্টির এক তুঙ্গে আরোহণ করলেন এই সখের, নিরালা আসরে। সাধিকা কলাবতীর প্রভাবে ঘরখানি সুরপুরীতে পরিণত হল। ভট্টাচার্য মশায় উপভোগ করতে লাগলেন চক্ষু মুদ্রিত করে। সুরের স্পন্দনে আন্দোলিত তাঁর আমস্তক। অশ্রু ভরে উঠল চোখে।

মাঝে মাঝেই তিনি উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ দিতে লাগলেন। ভাবে সজল-চক্ষু মানদাও।

ঢিমা লয়ের একটি গানেই প্রায় দেড় ঘণ্টা পার হয়ে গেল। আড়ানার বিস্তার যতখানি সম্ভব মানদা দেখালেন দরাজ গলায়।

সুরের ধারা যখন শেষ ঝঙ্কারে নিথর হল, সে এক দৃশ্য। প্রাজ্ঞ শ্রোতার সঙ্গে গায়িকার আঁখি থেকেও অশ্রু ঝরছে।

কয়েক মুহূর্তেই আত্মস্থ হলেন মানদা। পঞ্চাননকে তবলা সঙ্গতের জন্যে সুখ্যাতি করলেন।

চোখ মুছে জিতেন্দ্রনাথকে বললেন, 'বাবা, একটু বসুন। আমি আসছি।'

শিল্পী এবার তৎপর হলেন গৃহিণীর কর্তব্যে। জলযোগের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। কত রকমের আম টুকরো করে সাজালেন শ্বেত পাথরের প্লেটে। মিষ্টান্নের মধ্যে রাবড়ির বাটিও রইল।

পাঁড়েজীকে দিয়ে সেসব আনালেন অতিথিদের সামনে। বললেন, 'বাবা, একটু মিষ্টি মুখ করুন।'

তাঁদের সামনে বসে যত্ন করে খাওয়াতে লাগলেন।

আগ্রহের সঙ্গে মানদা বললেন, 'এই সামান্যর মধ্যে আর কিছু ফেলবেন না যেন।' তারপর ফলের দিকে দেখিয়ে ক'টি আমের নাম করলেন, 'এই আমটুকু আগে মুখে দিন-তারপর এটি নেবেন। এর আলাদা জাত, ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে রেখে খেতে হয়। আর এই যেটি কোণে রয়েছে, সবশেষে নেবেন। ওর পরে আর কোন ফল লাগবে না।"

শুনতে শুনতে প্রধান অতিথি বিস্ময় জানালেন, 'ব্যাপার কি? এত রকমের আম কি করে যোগাড় করলে?'

হাসিমুখে মানদা বললেন, 'মুর্শিদাবাদে গাইতে গিয়েছিলুম। ওস্তাদ কাদের বক্স্ এই আমের ঝুড়ি ট্রেনে তুলে দিলেন। আপনারা ব্রাহ্মণ এসেছেন, আপনাদের সেবায় লাগল।'

আমের প্রকারভেদ তাঁরা আস্বাদ করলেন।

শেষে, পরিতোষের সঙ্গে রাবড়ির পাত্রটিও নিঃশেষ করলেন অহিফেনসেবী জিতেন্দ্রনাথ।

বিশ্রামান্তে কথায় কথায় রাত হল। তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন সঙ্গীদের নিয়ে।

মানদা ভক্তিভরে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। অঞ্চল-প্রান্ত থেকে নিয়ে দক্ষিণা রাখলেন পায়ের কাছে।

তারপর গাঢ় স্বরে বললেন, 'গান শেখা আজ আমার সার্থক হল।'

ভট্টাচার্য মশায় আশীর্বাদ করে বিদায় নিলেন।

এলাহাবাদের ধ্রুপদী

বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

মোগল-সরাই জংশনে গাড়ি থেমেছে। অনেকক্ষণ দাঁড়াবে এখানে। এতক্ষণ কামরার মধ্যে বসে থেকে কি হবে? প্ল্যাটফর্মে একটু ঘুরে আসা যাক। এই ভেবে বিশ্বেশ্বর প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এলেন।

ধ্রুপদী বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলাদেশে তাঁর নামটি তখনো পরিচিত হয়নি। পরেও তেমন প্রসিদ্ধ ছিল না বটে। কারণ বাংলায় তিনি থাকতেন না তখন বাংলার সঙ্গীতসমাজের সঙ্গে কোন যোগ ছিল না তাঁর। কিন্তু পশ্চিমের সঙ্গীত-জগতে তাঁর যথেষ্ট নাম। কাশী এলাহবাদ আগ্রা গোয়ালিয়র। এমনি নানা আসরে অনেকে তাঁর গান শুনেছেন। বড় বড় জলসায় শ্রোতারা ধ্রুপদী হিসেবে দেখেছেন তাঁকে।

পশ্চিমে তাঁর বেশি পরিচয় গুরুর নামে। ধ্রুপদাচার্য অযোধ্যাপ্রসাদ তেওয়ারীর প্রিয় শিষ্য বলেই সকলে বিশ্বেশ্বরকে জানেন। গুরুর সঙ্গে জুটিতেও শোনা গেছে তাঁর গান। 'এলাহবাদের বিশ্বেশ্বর' নামেই তিনি বেশি বিখ্যাত।

কারণ এলাহাবাদের বাসিন্দা তিনি। সেখানে তাঁর ছাত্ররও দেখা দিয়েছেন। গড়ে তুলেছেন 'এলাহাবাদ সঙ্গীত সমাজ'। তার কর্ণধার এখানকারই নগেন্দ্রনাথ। ধ্রুপদ-গায়ক নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বেশ্বরের প্রধান শিষ্য।

এলাহবাদ থেকে কাশী। এসব অঞ্চলেই বেশি নাম বিশ্বেশ্বরের। আর এলাহবাদে তো প্রায় সকলের পরিচিত। সরকারী চাকুরির জন্যে এখানে বসবাস আরম্ভ হয়েছিল। তখন থেকেই 'প্রবাসী' বাঙালী। বাংলা থেকে পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া সেকালে ছিল কষ্টসাধ্য।

সময়সাপেক্ষও। জীবিকাসূত্রে সে অঞ্চলে বসবাস করলে কালে-ভদ্রে বাংলায় আসা হত। অথচ মন পড়ে থাকত বাংলার দিকে। ঘরকুনো বাঙালীর অন্তরে প্রবাসের দুঃখ জাগত পশ্চিমে বাসের সময়।

গোটা ভারতবর্ষ যে আমার স্বদেশ এ বোধ তাঁদের ছিল না। তাই পশ্চিমের বাঙালীরা নিজেদের এমনি প্রবাসী বলেই মনে করতেন সেকালে। যে-জন্যে, এই এলাহবাদ থেকেই পত্রিকা প্রকাশ করতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তার নাম দেন—প্রবাসী।

বাংলার বিশ্বেশ্বরও তেমনি এলাহবাদ নিবাসী হয়েছিলেন, রামানন্দেরও প্রায় ৪০ বছর আগে। আর কখনো কখনো আসতেন বাংলায়। তবে বেশিদিন থাকবার সুবিধা হত না। ছুটি কাটিয়ে যেতেন মাত্র, বেহালায় কিংবা বলাগড়ে।

সেবারও তেমনি কলকাতায় যাত্রা করেছিলেন। সপরিবারে, অনেকদিন পরে ফিরছেন ছুটি নিয়ে। সঙ্গে স্ত্রী পুত্র কন্যা।

বারাণসী পার হয়ে ট্রেন মোগলসরাই পৌঁছল। এখানে দাঁড়াবে প্রায় আধ ঘণ্টা।

বিশ্বেশ্বর গাড়ি থেকে নামলেন। প্রকাণ্ড জংশন স্টেশন মোগলসরাই।

হাঁক দিয়ে ঘুরছে ফেরিওয়ালার দল। কেউ বা দোকান সাজিয়ে বসেছে। চা, পান থেকে খাবার, ফল আর নানা জিনিসপত্রের বেসাতি।

এক জায়গায় পেয়ারা বিক্রি হচ্ছে। সেদিকে এগিয়ে গেলেন বিশ্বেশ্বর। অতি উৎকৃষ্ট কাশীর পেয়ারা। যেমন বড়, তেমনি টাটকা রসাল। দেখলেই কিনতে ইচ্ছে হয়।

বিশ্বেশ্বরও কিনলেন পেয়ারা।

আর সঙ্গে সঙ্গে গুরুজীর কথা মনে পড়ল। অযোধ্যাপ্রসাদ পেয়ারা খেতে বড় ভালবাসেন।

অমনি গুরুর জন্যেও কিনে নিলেন এক টুকরি। মহা আনন্দে সওদা নিয়ে কামরার দিকে চললেন।

তখনি মনে হল—কি আশ্চর্য! গুরুজীকে এ পেয়ারা কি করে দেব? তিনি তো এখন বৃন্দাবনে। আর আমি এই ট্রেনে চলেছি কলকাতায় পরিবার নিয়ে!

বিশ্বেশ্বর তাড়াতাড়ি কামরায় ফিরলেন।

স্ত্রীকে পেয়ারার টুকরি দেখিয়ে এই সমস্যার কথা বললেন, 'দেখো, গুরুজীর জন্যে পেয়ারা কিনে ফেলেছি। কিন্তু তিনি রয়েছেন বৃন্দাবনে। এখন কি করি?'

গৃহিণী যেমনি বুদ্ধিমতী, তেমনি পতি-পরায়ণা। স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি এখন গুরুদেবের কাছে যাবার ইচ্ছে? সেখানে গিয়ে তাঁকে এই পেয়ারা দিতে চাও?'

অত্যন্ত খুশি হয়ে বিশ্বেশ্বর জানালেন, 'ঠিক তাই। কিন্তু তা কি করে হবে? তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি কলকাতায়?'…

স্ত্রী আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আমি ছেলে-মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় যেতে পারব। ট্রেনের আর তো কোন ঝঞ্ঝাট নেই। খানিক রাস্তা চলে এসেছি। আর শুধু রাতটুকু। আমরা ঠিক চলে যাব।'

প্রায় একশ বছর আগেকার কথা। সে যুগের এক সাহসিকা ধর্মপত্নী। বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় এদিকেও ভাগ্যবান। তাঁর অনুরাগ বিরাগ ইচ্ছা অনিচ্ছাকে আপন করে নিয়েছিলেন সহধর্মিণী। স্বামীর সঙ্গীতাসক্তি আর তাঁর গুরুভক্তির আধিক্যতা নিয়ে গঞ্জনার পরিবর্তে সহমর্মিতা জানাতেন।

এখন স্বামীর আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিধ্বনিত করে বললেন, 'তুমি ভেব না। আমরা কলকাতায় ঠিক পৌঁছে যাব। তুমি নিশ্চিন্ত মনে গুরুজীর কাছ থেকে ঘুরে এস।'

সত্যিই ভাবলেন না বিশ্বেশ্বর।

পেয়ারার টুকরি আর নিজের কিছু জিনিস নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে গেলেন। খানিক পরেই ট্রেন ছাড়ল মোগলসরাই স্টেশন। তাঁর পরিবারবর্গ কলকাতায় যাত্রা করলেন। আর তিনি ফিরতি ট্রেনের সন্ধান করতে লাগলেন স্টেশনে।

মোগলসরাই থেকে হাথ্‌রাস। সেখানে গাড়ি বদল করে মথুরা। তারপর একায় করে বৃন্দাবনে গুরুজীর উদ্দেশে যাত্রা।

এইভাবে বিশ্বেশ্বর পরের দিন ব্রজধামে পৌঁছলেন।

এসে, অযোধ্যাপ্রসাদের কাছে দাঁড়াতেই বিষম বিস্মিত হলেন তিনি। শিষ্য যে সপরিবারে কলকাতায় গিয়েছিলেন!

জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার কি? কলকাতায় গেলে না যে?

বিশ্বেশ্বর প্রথমে তাঁর পদধূলি নিয়ে প্রণাম জানালেন। তারপর পেয়ারার টুকরি গুরুর পায়ের কাছে রেখে বুঝিয়ে বললেন ব্যাপার।

'ওদের কলকাতার ট্রেনে পাঠিয়ে দিয়েছি। আর আপনার জন্যে কাশীর এই পেয়ারা এনেছি। আপনি পেয়ারা বড় ভালবাসেন।'

শিষ্যকে দেখার চেয়ে তিনি আরো আশ্চর্য হয়ে গেলেন ঘটনার বিবরণ শুনে। নির্বাক হয়ে বিশ্বশ্বরের মুখের দিকে তিনি খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। আর, আশ্চর্য—বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ল তাঁর চোখ দিয়ে।

শিষ্যকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'এত তোমার গুরুভক্তি! এমন তোমার গুরুসেবার আগ্রহ! কিন্তু বিশ্বেশ্বর, আমি যে তোমায় ছলনা করেছি।'

শিষ্য এবার বাক্যহীন হলেন বিস্ময়ে। গুরুজী ছলনা করেছেন—তাঁকে! এ কথার অর্থ? এতকাল তো অকাতরে রাগ-বিদ্যা দান করে এসেছেন। পিতার তুল্য স্নেহপূর্ণ ব্যবহার। সৌজন্য। তবে...?

অযোধ্যাপ্রসাদ আবিষ্ট হয়ে বললেন, 'তোমায় আমি প্রায় সবই দিয়েছি। কিন্তু একটু হাতে রেখেছিলুম। মালকোশের আরো

দুই প্রকার তোমাকে দিইনি। সেই অপরাধ আজ শুধরে নেব।'

ধন্য বোধ করলেন বিশ্বেশ্বর। মাত্র এইটুকু না দেওয়ার জন্যে গুরু অনুতপ্ত! এটিকে অপরাধ মনে করেছেন? ছলনা ভেবেছেন? এত মহৎ তাঁর প্রাণ!

সেদিনই শিষ্যকে অযোধ্যাপ্রসাদ শেখালেন—মালকোশের দুই প্রকার-ভেদ।

বিশ্বেশ্বর কৃতার্থ হলেন। তারপর সে রাত্রেই কলকাতার ট্রেন ধরলেন।...

আরো একটি ঘটনা জানা যায় গুরু-শিষ্যের। তাঁদের ভক্তি ও প্রীতির এক উদাহরণ বলেও মনে করা চলে এটিকে। আর দুজনের সঙ্গীত-জীবনে সহযোগিতার নিদর্শনও।

পশ্চিমে সে সময় বড় বড় আসর মাঝে মাঝে হত। কাশী এলাহবাদ গোয়ালিয়র আগ্রা দিল্লী—এই সব শহরে। সেবার হয়েছিল গোয়ালিয়রে। স্বয়ং মহারাজা তার উদ্যোক্তা। নানা প্রসিদ্ধ কলাবৎ আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে বিশ্বেশ্বর একজন। আর অযোধ্যাপ্রসাদেরও সেখানে গাইবার কথা।

গোয়ালিয়রে এসে তিনি গুরুর খোঁজ করলেন। কারণ শুনেছিলেন, গুরুজীরও আমন্ত্রণ হয়েছে সম্মেলনে। কিন্তু তাঁর সন্ধান শহরে পেলেন না। বড়ই ইচ্ছা ছিল তেওয়ারীজীর সামনে গাইবেন। কিন্তু তা আর হল না বুঝি বিশ্বেশ্বরের।

আসরে এসেও তিনি গুরুর জন্যে অপেক্ষা করলেন। তারপর যখন তাঁর গানের পালা এল তখনও গুরুর কোন উদ্দেশ নেই। অগত্যা গুরুকে স্মরণ করেই গাইতে প্রস্তুত হলেন ক্ষুণ্ণ মনে।

যথাসময়ে আসরে বসে নিজের তানপুরা বেঁধে নিয়ে পাখোয়াজীকে সুর দিচ্ছেন। পাখোয়াজ সুরে বাঁধা হলেই আরম্ভ করবেন গান।

এমন সময় অতি বৃদ্ধ অযোধ্যাপ্রসাদ আসরে উপস্থিত হলেন।

তাঁকে দেখে কৃতার্থ বোধ করলেন বিশ্বেশ্বর। তানপুরা নামিয়ে রেখে গুরুকে প্রণাম করলেন।

অযোধ্যাপ্রসাদও আশীর্বাদ জানালেন স্মিত হাস্যে।

তারপর শিষ্যকে গান আরম্ভ করতে বললেন।

বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, 'গুরুজী, কি রাগ গাইব?'

সকলের সামনেই এ প্রশ্নে মুগ্ধ হলেন তেওয়ারীজী। চমৎকৃত বোধ করলেন। নিজের সমস্ত বিদ্যাই দান করেছেন শিষ্যকে। সঙ্গীত-জগতে বিশ্বেশ্বর এখন সুপ্রতিষ্ঠ। তবু গুরুর কাছে শিষ্যই রয়েছেন। গুরুকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে এখনো আগের মতনই আন্তরিক ইচ্ছা। এমন কৃতী গায়ক হয়েও আজও এত অবিচল ভক্তি।

অযোধ্যাপ্রসাদ ভাবের আবেগে উঠে দাঁড়ালেন। আসরের শ্রোতাদের লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনারা আমায় মার্জনা করবেন, গানের মধ্যে কথা বলবার জন্যে। কিন্তু শিষ্যের আচরণ আমার মন এমন স্পর্শ করেছে যে, আমি না বলে পারছি না। আমাকে আসরে দেখে শিষ্য অনুমতি প্রার্থনা করছে—কি গান গাইবে। এমন গুরু-ভক্তির কথা আমি সকলকেই জানাতে চাই। অন্য গুরুর শিষ্যেরাও যেন এমনি হয়। তাহলে তাদেরও সিদ্ধিলাভ হবে সঙ্গীতসাধনায়।'

আসরে ধন্য ধন্য, সাধু সাধু, ইত্যাদি শোনা যেতে লাগল বিশ্বেশ্বরের নামে।

তারপর গান আরম্ভ হল। শিষ্যের সঙ্গে কণ্ঠ মেলালেন তেওয়ারীজীও।

দরবারী কানাড়ায় তাঁরা যুগলবন্দী শোনাতে লাগলেন।

অযোধ্যাপ্রসাদ তখন অতি প্রবীণ বয়সী। তাঁর ৯০ বছর উত্তীর্ণ হয়েছে। শরীরে বয়সের ভারও প্রকট। কিন্তু সঙ্গীতকণ্ঠ তখনো জরাজীর্ণ নয়। দেহও অপটু হয়নি। শিষ্যের সঙ্গে এই উদাত্ত ভাবের রাগ উপযুক্ত মর্যাদায় গাইতে লাগলেন…

এত পরিণত বয়সের ধ্রুপদ-গায়কও সেকালে দেখা যেত আসরে। বারাণসীর ধ্রুপদী গোপালপ্রসাদ মিশ্র এমনি একজন গুণী। বাংলার স্বনামধন্য গায়ক গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর (সঙ্গীতসমাজে 'নুলো গোপাল' নামে সুপরিচিত) তিনি ছিলেন ধ্রুপদগুরু। গোপালপ্রসাদ প্রায় শতবর্ষেও গায়নসক্ষম ছিলেন। একথা 'সঙ্গীতে পরিবর্তন' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন কাশীর ধ্রুপদী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

তেওয়ারীজীও সে আসরে বয়সের পক্ষে অভাবিত গুণপনা দেখালেন। বিশ্বেশ্বরও গুরুর মুখোজ্জ্বল করলেন এই উচ্চকোটির রাগ রূপায়ণে।

শুধু দরবারী কানাড়া নয়। গোয়ালিয়রের সেই আসরেই কানাড়ার অষ্টাদশ প্রকার রাগ গেয়েছিলেন বিশ্বেশ্বর। সেবার তিনিই একমাত্র শিল্পী যিনি এই দুর্লভ রাগ-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। কানাড়া শ্রেণীর বিন্যাস করেন অতি সুষ্ঠুভাবে।

সে আসরে স্বনামধন্য তাজ খাঁও তাঁর গান শুনেছিলেন। সেদিন থেকেই তিনি গুণমুগ্ধ হন বিশ্বেশ্বরের। আর দুজনের মধ্যে যে সম্প্রীতি গড়ে ওঠে তা তাঁদের বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থেকে যায়।

তানসেনের এই বংশধর পরে ক' বছর ছিলেন কলকাতায়। নবাব ওয়াজেদ আলীর মেটিয়াবুরুজ দরবারের নিযুক্ত গায়ক তখন। গোয়ালিয়রের সেই আসরের বহু বছর পরের কথা। বিশ্বেশ্বরও সে সময় এলাহাবাদ থেকে মাঝে মাঝে আসতেন বড়িশায়

তাজ খাঁ তখন মেটিয়াবুরুজ থেকে বিশ্বেশ্বরের কাছে উপস্থিত হতেন। তাঁর শেষ জীবনের আবাস সেই বড়িশার বাড়িতে। কত-দিন সেখানে দুজনের সঙ্গীতালোচনায় কেটে গেছে। বিশ্বেশ্বরের প্রায় সমবয়সী ছিলেন তাজ খাঁ। তারপর মেটিয়াবুরুজ থেকে যখন খাঁ সাহেব নেপাল দরবারে চলে গেলেন, তখন থেকে আর দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি।

গোয়ালিয়রের মতন স্মরণীয় আসর আরো করেছিলেন বিশ্বেশ্বর।

সবই পশ্চিমের নানা অঞ্চলে। যতদিন চাকুরি ছিল, ততদিন শুধু নয়। অবসর নেবার পরও অনেক বছর ছিলেন এলাহাবাদে।

বাংলায় তিনি ফিরেছিলেন ৬৫ বছর বয়সে। তার আগে পর্যন্ত পশ্চিম নিবাসীই তো থাকেন। সেজন্য তাঁর সঙ্গীত-জীবনে শ্রেষ্ঠ অংশ ওদিকেই ধর্তব্য। তাঁর প্রতিভার দীপ্তি দেখেছিলেন পশ্চিমের শ্রোতারাই। বছরের পর বছর, নানা আসরে।

উত্তর ভারতে তাই অতি সম্মানের আসন তিনি পেয়েছিলেন। সেখানকার সঙ্গীত-সমাজে বাঙালাদের মধ্যে এমন স্থায়ী মর্যাদা আর কেউ পান কিনা সন্দেহ।

তাঁর সমকালীন বাঙালী ধ্রুপদী রামদাস গোস্বামীও একজন আচার্যস্থানীয় গায়ক ছিলেন। কিন্তু তিনি কাশীবাস করতে যান পরিণত বয়সে। গানও বারাণসীর ক'টি নির্দিষ্ট আসরেই পরিবেশন করতেন। বিশ্বেশ্বরের মতন গোয়ালিয়র প্রভৃতি নানা অঞ্চলে যোগ দিতেন না রামদাস। বিশ্বেশ্বরের চেয়ে দশ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি। তাঁর সঙ্গীতজীবনের শ্রেষ্ঠ কাল বাংলাতেই কেটেছিল। আর শিষ্য গঠন করেন শেষ জীবনে, বারাণসীতে। তখন উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ গুণীরাও রামদাসকে সঙ্গীতপ্রবীণ রূপে সমাদর করতেন। কিন্তু গায়ক হিসেবে কৃতিত্ব দেখাবার বয়স আর তখন ছিল না গোস্বামী মশায়ের।

তেমন বিশ্বেশ্বরের আর একজন বয়োজ্যেষ্ঠ বাঙালী কলাকার ছিলেন বারাণসীর মহেশচন্দ্র সরকার। এই বীণকারকেও যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন অন্যান্য গুণীরা। কিন্তু মহেশচন্দ্র কাশীর বাইরে কিংবা নিজ গৃহের বাইরেও বীণাবাদন বিশেষ করতেন না। (তাঁর বীণা শোনবার জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস গিয়েছিলেন তাঁর মদনপুরের বাড়িতে, একথা প্রসঙ্গত বলে রাখা যায়।) এই সব কারণে মহেশচন্দ্রের প্রতিভার যোগ্য খ্যাতি হয়নি পশ্চিমের বৃহত্তর অঞ্চলে।

কিন্তু উত্তর ভারতের শ্রোতাদের মধ্যে বিশ্বেশ্বর দীর্ঘকাল প্রিয় ও প্রখ্যাতনামা গায়ক হয়ে বিরাজ করেছিলেন। তিনি ধ্রুপদ শোনাতেন নানা আসরে।

কৃতী শিল্পী বলে তিনি অন্য গুণীদেরও স্বীকৃতি পেতেন। তাজ খাঁর তুল্য আরো ক'জন ভারতপ্রসিদ্ধ গুণগ্রাহী ছিলেন তাঁর। যেমন সরদী নিয়ামৎ উল্লা খাঁ। খাঁ সাহেব অযোধ্যাপ্রসাদকেও শ্রদ্ধা করতেন। বিশ্বেশ্বরের চেয়ে সামান্য বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন নিয়ামৎ উল্লা। খাঁ সাহেব তাঁকে যেমন সমাদর জানাতেন, তাঁর দুই বিখ্যাত পুত্র করামৎ উল্লা ও কৌকব খাঁও তেমনি। বিশ্বেশ্বর যখন বড়িশায় অবসর জীবন যাপন করছেন, তখন কলকাতায় কৌকব খাঁ স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। আর করামৎ উল্লা আসতেন মাঝে মাঝে। বিশ্বেশ্বরের নাম হলেই রীতিমত সম্মান দেখাতেন দুজনে। এ সবই তাঁর পশ্চিমাঞ্চলের খ্যাতি কৃতির কথা স্মরণ করে।

দরাজ উদাত্ত কণ্ঠের গায়ক বিশ্বেশ্বর। তিনি গান আরম্ভ করলেই সঙ্গীতের সঙ্গে সমস্ত আসরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। সুরে পূর্ণ হয়ে যেত আবহমণ্ডল। তাঁর দরাজ কণ্ঠে সুরের গভীরতায় ও গাম্ভীর্যে অপরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হত।

তানসেনের রচনাই তিনি বেশি গাইতেন আসরে। সেই ইমন কল্যাণটি যখন ধরতেন—'জয় দেবী শক্তি রূপা সারদা ভবানী'—প্রথম কলিতেই সুরে ভরে যেত আসর।

তারপর উদাত্ত অন্তরা—

তুঁহি ডাল, তুঁহি মূল
তুঁহি পত্র তুঁহি ফুল ॥

থেকেই আসর যেন দেবদেউল হয়ে উঠত।

শ্রোতাদের মনে হত দেবী সারদার চরণকমলে ভক্ত সাধক ভক্তির উপচার নিবেদন করছেন। দেবীর মন্দিরে সুরের অঞ্জলি দিচ্ছেন প্রাণের আকূতিতে। তাঁর সার্থক রাগ-রূপের সঙ্গে হৃদয়ের আবেদন

অঙ্গাঙ্গী মিলে যেত। আর এক অতীন্দ্রিয় লোকের আভাস পেতেন শ্রোতারা।…

হাম্বীর-নটের সেই গানখানি শুনিয়েও আসর মাৎ করতেন বিশ্বেশ্বর। এটিও তানসেনের ধ্রুপদ—

জ্ঞান-পতি গণেশ বিদ্যা-পতি মহেশ।
পৃথিবী-পতি নরেশ বলপতি হনুমান॥
সবিতা-পতি সিন্ধু গিরি-পতি সুমেরু।
রাজন-পতি ইন্দ্র ধর্ম-পতি দান॥
বাজন-পতি মৃদঙ্গ পত্রনু-পতি পান।
পক্ষীন্-পতি গড়ুর অর্জুন-পতি বাণ॥
সাহেন-পতি আকবর দিল্লী বাদশা।
তানসেন-কো প্রভু গোপীন-পতি কান্॥

এই গান কি হৃদয়স্পর্শী শোনাত তাঁর দরদী কণ্ঠে। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর এ গানে আসর উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত।

তাঁর বৃদ্ধ বয়সেও উত্তরপাড়ার সেই জলসায় যেমন দেখা যায় একদিন। সে আসরটির কথা এখানে বলা চলে।

বিশ্বেশ্বরের তখন অনেক বয়স। সত্তর পার হয়েছেন। এলাহাবাদ থেকে বাংলায় ফিরে এসেছেন শেষ জীবনে। বড়িশায় বসবাস করছেন।

এমন সময় একদিন গাইতে আসেন উত্তরপাড়ায়। জয়কৃষ্ণের পুত্র রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির আসরে। সঙ্গে এসেছেন তাঁর এক শিষ্য, নীলরতন রায়চৌধুরী।

প্রথমে নীলরতনের গান হল। ওই হাম্বীর (নট) গাইলেন তিনি।

কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। জমল না গান। শ্রোতারা অতৃপ্ত বোধ করলেন।

সামনেই বসে রয়েছেন বিশ্বেশ্বর। শিষ্যের ব্যর্থতা তিনিও দেখলেন।

তখন তাঁকেই বলা হল, 'বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়, এবার আপনি আসর রক্ষা করুন। একটি জমাটি রাগের গান শুনিয়ে দিন।'

কেউ কেউ অনুরোধ করলেন 'ভারি কোন রাগ না গাইলে হাম্বীরের ওই ছাপ কাটবে না। যদি মালকোশ ধরেন, তাহলে বেশ হয়।'

বিশ্বেশ্বর গান আরম্ভ করলেন তাঁদের কথায়। কিন্তু তাঁদের ফরমায়েস মতন রাগ শোনালেন না তিনি।

ওই হাম্বীরই ধরলেন গভীর আত্মবিশ্বাসে। একই রাগে সে আসর জমানো যায় কিনা দেখাতে চান।

তাঁর সঙ্গে পাখোয়াজ নিয়ে বসলেন ত্রিগুণাচরণ দত্ত। হাওড়ার শিবপুরে তাঁর বাড়ি।

ত্রিগুণাচরণের সঙ্গতে বিশ্বেশ্বর সুলফাকতা-য় গাইতে আরম্ভ করলেন। তানসেনের ওই যে গানটি শিষ্য এইমাত্র গেয়েছেন সেইটিই ধরলেন তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে। আর স্থায়ী কলি গাইবার পরই দেখা গেল—আসর হাম্বীরের সুরে আবার জমাট হয়ে উঠেছে।

সকলের মনে হল—এ যেন সে হাম্বার নয়। যাঁরা অন্য কোন ভারি রাগ শুনতে চেয়েছিলেন, তাঁরাও বিস্মিত হলেন—কোন ব্যর্থ গায়কের গান নিয়েই আবার এমন সার্থক আসর করা যায়।

কিন্তু বিশ্বেশ্বর একা গাইলেন না বেশিক্ষণ। স্থায়ীর পর গানের সমে এসে একবার থামলেন।

তখন সবাই আরো আশ্চর্য হলেন, যখন বিশ্বেশ্বর বললেন, 'নীলু, এবার আমার সঙ্গে ধরো।'

তারপর দুজনে একসঙ্গেই গাইতে লাগলেন—

জ্ঞান-পতি গণেশ বিদ্যাপতি মহেশ।
পৃথিবী-পতি নরেশ বল-পতি হনুমান॥
সবিতা-পতি সিন্ধু গিরি-পতি সুমেরু॥
রাজন্-পতি ইন্দ্র ধর্ম-পতি দান॥ ······

শিষ্যও এবার ঠিক ঠিক অনুসরণ করে চললেন তাঁকে। গুরুর সুরের দৃঢ় ভিত্তি তিনি পেয়ে গেছেন। এবার আর কোন অসুবিধা হল না তাঁর।

সকলেই দেখলেন, বিশ্বেশ্বর রাগের রূপ কেমন ফুটিয়ে তুলে গানখানি সুষম সুন্দর করলেন। ধ্রুপদে রাগরূপই যে বড়, একথা নতুন করে বুঝলেন সবাই। রাগের মূর্তি যিনি যথার্থ দেখাতে পারেন তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, তিনিই ধ্রুপদের প্রকৃত শিল্পী। সে আসরে বিশ্বেশ্বর একথার নতুন করে প্রমাণ দিলেন।

উত্তরপাড়ার সেই ভাঙা আসর জোড়া দিয়ে বিশ্বেশ্বর সেদিন দেখালেন—ধ্রুপদ গানের তিনি একজন সত্যিকার গুণী। আর তাও সেই বার্ধক্যের পরে।

তিনি যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গীত শিখেছিলেন, চর্চা করতেন নিয়মিত, আসরেও তার পরিচয় দিতেন। সেকালের গুরুমুখী রাগ-বিদ্যা শিক্ষার এক শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত বিশ্বেশ্বর।

একই গুরুর কাছে তিরিশ বছরেরও বেশি তিনি শিক্ষা করেন; একটি ধারার নির্দেশে গঠিত হন একান্ত নিষ্ঠায়। তারপর উত্তর ভারতের আসরে আসরে কলাবৎদের স্বীকৃতিতে ধন্য হয় তাঁর সঙ্গীত-জীবন। তাঁর প্রতিভার সেই পূর্ণ বিকশিত রূপ বাংলাদেশ দেখতে পায়নি।

তাঁর সঙ্গীতশিক্ষাও আদ্যোপান্ত পশ্চিমাঞ্চলে। সেখানেই তিনি ভাগ্যক্রমে এমন গুরু পেয়ে যান। আর সেই সঙ্গে শিক্ষার অবাধ সুযোগও।

কিন্তু তাঁর প্রথম জীবনে কল্পনার অতীত ছিল এমন সার্থকতা। এমনভাবে সঙ্গীতের সাধনায় সিদ্ধ হবেন, প্রসিদ্ধি লাভ করবেন বৃহত্তর সমাজে, তা তাঁর পূর্বজীবনে কেউ ধারণাও করতে পারেনি। বিশ্বেশ্বরের কোথায়, কিভাবে জীবন আরম্ভ! আর কেমন ঘটনাচক্রে পশ্চিমের

নিবাসী হয়ে গেলেন। সেখানেই এক কথায় লাভ করলেন এক দিকপাল সঙ্গীতাচার্যকে।

বছরের পর বছর তাঁর কাছে শিক্ষা করতে লাগলেন। তারপর সঙ্গীতসমাজে পেলেন যশ সমাদর প্রতিষ্ঠা। বারাণসী থেকে গোয়ালিয়র পর্যন্ত কেন্দ্রে কেন্দ্রে দীর্ঘকাল প্রসিদ্ধ হয়ে রইলেন। বাংলা থেকে সুদূর পশ্চিমে গিয়ে এমন সাফল্য তাঁর হল, জীবনের অন্য বৃত্তিতে থেকেও। চাকুরিজীবী হয়েও প্রথম শ্রেণীর কলাবৎ। অপেশাদার থাকলেও পেশাদার সমাজে স্বীকৃত গুণী। সব যেন গল্পকথার মতন।

সেকালের উদযোগী বাঙালীদের এমন অনেককে দেখা গেছে। উত্তর ভারতের বিভিন্ন বিষয়ের ইতিবৃত্তে নাম রেখেছেন তাঁরা। বিশ্বেশ্বর যেমন সঙ্গীতজগতে।

সেই উনিশ শতকের ভারতবর্ষে বাঙালীর তখন ঐতিহাসিক বর্ধিষ্ণু যুগ। জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে তার জয়যাত্রার অধ্যায়।

সেই পর্বেই বিশ্বেশ্বরের কর্মজীবনের সূচনা হয়েছিল।

আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগেকার কথা। বিশ্বেশ্বরের জন্মসন হল ১৮৩৩। হুগলী জেলার বলাগড় তাঁর জন্মস্থান।

পিতা পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন পরিচয় ছিল না। কিন্তু মাতুল বংশ সুবিখ্যাত—বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী পরিবার। বড়িশারই 'কৃষ্ণগোবিন্দ লজ্' নিবাসী কৃষ্ণগোবিন্দ রায়চৌধুরীর ভাগিনেয় ছিলেন বিশ্বেশ্বর।

বলাগড়ের গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁর প্রথম পাঠ হয়েছিল। তারপর ১৮৪২ সালে ইংরেজী শিক্ষার আশায় আসেন মাতুলালয়ে।

কিন্তু সেকালের বড়িশায় যানবাহনের অভাব। সেখান থেকে বালকের পক্ষে কলকাতায় যাতায়াতে বড়ই অসুবিধা দেখা গেল। তখন তাঁকে বাগবাজারে নিয়ে আসা হল, আর এক

আত্মীয়ের বাড়ি। সেখান থেকে ক্যাথিড্রাল চার্চে তাঁর বিদ্যাশিক্ষা হতে লাগল।

এদিকে তাঁর অসাধারণ মেধা কিছু ছিল না। জুনিয়র কেম্ব্রিজ পর্যন্ত পাঠ করলেন সতের বছর বয়সে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা এই পর্যন্তই হল।

তারপরের বছরেই (১৮৫১) বিশ্বেশ্বর একা পশ্চিমে চলে গেলেন। সুদর্শন তরুণ এবং সুগঠিত স্বাস্থ্য। তাঁর তেমনি মনোবলও। তিনি ভাগ্য অন্বেষণে, আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, ইংরেজের চাকুরির আশায় যাত্রা করলেন পশ্চিমাঞ্চলে। চাকুরি করে 'বড়' হতে হবে—এই ছিল লক্ষ্য। তখনকার ইংরেজী শেখা বাঙালী ছেলেদের যেমন 'আদর্শ' দেখা যেত!

কলকাতা থেকে প্রথমে তিনি জামালপুর পৌঁছলেন। তারপর সেখান থেকে 'ঘোড়ার ডাকগাড়ি'তে ফৈজাবাদ।

যাত্রাপথেই বিশ্বেশ্বরের ভাগ্য হাতছানি দিলে। সেই গাড়িতেই এক ফৌজী পদস্থ ইংরেজের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল তাঁর। ইংরেজী-জানা বাঙালী তরুণ। সুপুরুষ, ভাগ্যান্বেষী দর্শনধারী রূপেই তিনি সাহেবের সহানুভূতি আকর্ষণ করলেন।

কথায় কথায় সামরিক কর্তা ব্যক্তিকে জানালেন নিজের আকিঞ্চন। আর প্রয়োজনের কথা।

সাহেব প্রায় কথাই দিলেন তাঁকে। বললেন, 'ফৈজাবাদে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। তোমার জন্যে চাকরির চেষ্টা করব।'

ফৈজাবাদে পৌঁছেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন বিশ্বেশ্বর।

সাহেব কথা রেখেছিলেন। আর, অবিলম্বে। ফৈজাবাদেই মিলিটারি অ্যাকাউন্ট্‌স্ অফিসে কাজ হয়ে যায় বিশ্বেশ্বরের।

চাকুরির কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এলাহাবাদে বদলী হয়ে আসেন। স্থায়ী বাসিন্দা হন এখানেই। আর এলাহাবাদেই তাঁর রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষার সূত্রপাত।

বিশ্বেশ্বরের এই যে ভাগ্যের আশায় পশ্চিমে আসা, চাকুরি পাওয়া ইত্যাদি, এক হিসেবে বাহ্যজীবন।

আগে থেকেই অন্তরে তাঁর সঙ্গীতের জন্যে আকুলতা ছিল। কিন্তু বাইরে প্রকাশ পায়নি সুযোগের অভাবে। উপার্জনের সমস্যাই বড় ছিল। তারপর এলাহাবাদে যখন পাকা চাকুরি হল, সেই প্রবণতা দেখা দিলে নতুন করে। নিজের আগ্রহে গানের চর্চা তখনই কিছু কিছু আরম্ভ করলেন।

কিন্তু সে গানে নিজেরই মন ভরে না। ওস্তাদের কাছে রীতিমত শিক্ষার জন্যে জাগে ব্যাকুলতা। কারণ জানেন, কলাবতের কাছে না শিখলে গায়ক হওয়া অসম্ভব।

কিন্তু উপযুক্ত গুরু কোথায় সন্ধান করবেন এই নতুন জায়গায়। এখানকার সঙ্গীত সমাজে তিনি একেবারেই অপরিচিত। এইসব চিন্তা তাঁর মনের মধ্যেই থাকত।

কি করে বিশ্বেশ্বর জীবনের সেই চরম সুযোগ পেলেন সে কথায় রামেশ্বর চৌধুরীর পরিচয় দিতে হয়। তখনকার এলাহাবাদের একজন সর্বমান্য বাঙালী রামেশ্বর চৌধুরী।

প্রয়াগ তীর্থের কাছে ভরদ্বাজ আশ্রম। তার নিকটেই কর্নেল-গঞ্জ এলাকার নিবাসী তিনি। কোটিপতি রামেশ্বরের সমগ্র এলাহাবাদে সে সময় বিপুল প্রতিষ্ঠা।

জনহিতকর নানা কাজে তিনি অগ্রণী, বদান্য। বিশেষ চকের মিউনিসিপ্যাল মার্কেট প্রধানত রামেশ্বরের দাক্ষিণ্যেই পত্তন হয়েছিল। কোম্পানী-বাগান নামে পরিচিত অ্যালফ্রেড পার্কেও তাঁর প্রচুর দান। সেই বাগানের মধ্যে থর্নহিল্ ও মেইন মেমোরিয়াল লাইব্রেরিও তাঁর আনুকূল্যে গড়া। এলাহাবাদের একজন সুপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি তিনি। এ শহরের স্থায়ী বাঙালী বাসিন্দাদের অন্যতম বিশিষ্ট রামেশ্বর।

কিন্তু এমন প্রতিষ্ঠাপন্ন রামেশ্বর চৌধুরীও প্রথম জীবনে ছিলেন ভাগ্যান্বেষী। তবে কলকাতা থেকে নয়। কাশী থেকেই ভ্রমণ করতে

করতে তিনি এলাহাবাদে আসেন। বারাণসীর বিখ্যাত চৌধুরী বংশের সন্তান রামেশ্বর। পারিবারিক মনোমালিন্যে অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করে যান। তারপর এলাহাবাদেই প্রথমে পান কমিশনারি-য়েটের চাকুরি। পরে দোস্ত মহম্মদের সময় রামেশ্বব কাবুল যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে যাত্রা করেন।

সেই উপলক্ষ্যেই তাঁর ভাগ্যোদয়। তারপর প্রচুর উপার্জন করে রামেশ্বর এলাহাবাদে ফিরে আসেন।

তিনি কি পরিমাণ বিত্তশালী হয়েছিলেন, তা জানা যায় তাঁর উত্তরাধিকারের হিসাব থেকে। নগদ কুড়ি লক্ষ টাকা, প্রাসাদোপম অট্টালিকা, মাসিক পাঁচ হাজার টাকারও বেশি আয়ের জমিদারি ইত্যাদি তিনি মৃত্যুকালে রেখে যান।

এ হেন রামেশ্বর চৌধুরীর সঙ্গে পরিচিত হলেন বিশ্বেশ্বর। এলাহাবাদে চাকুরি সূত্রে নবাগত এবং সঙ্গীত শিক্ষার জন্যে অন্তরে একান্ত আগ্রহ।

রামেশ্বরের স্বভাবে নানা গুণ ছিল। তার মধ্যে একটি হল, তিনি সঙ্গীতের দরদী এবং সঙ্গীতজ্ঞদের পোষকও।

দূর বাংলা থেকে এসেছেন বিশ্বেশ্বর। ভাগ্যক্রমে রামেশ্বরের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তারপর আরো সৌভাগ্যের বিষয়, রামেশ্বরের স্নেহও লাভ করেছেন তিনি। কর্নেলগঞ্জে চৌধুরী ভবনেও যাতায়াত করেন তখন। এমন সময় রামেশ্বর জানতে পারলেন, অবসর সময়ে বিশ্বেশ্বর সঙ্গীতচর্চা করে থাকেন।

শুনে রামেশ্বর বললেন, 'কি গান গাও তুমি? যোগ্য গুরুর কাছে ধ্রুপদ শেখো।'

সাহস পেয়ে জানালেন বিশ্বেশ্বর, 'আমারও মনের বড় ইচ্ছে তা-ই। কিন্তু কার কাছে শিখব?'

রামেশ্বর আশ্বাস দিলেন, 'আচ্ছা, দেখি কি করা যায়।'

বিশ্বেশ্বর উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন চৌধুরী মহাশয়ের কাছে

ভরসা পেয়ে। আর তার কিছুদিনের মধ্যেই সুযোগ এসে গেল।

সেবার সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন হল এলাহাবাদে।

পাঁচ-সাত বছর অন্তর তখন পশ্চিমে সঙ্গীত সম্মেলন বা বড় বড় জলসা হত। বারাণসী এলাহাবাদ গোয়ালিয়র দিল্লী আগ্রা ইত্যাদি শহরে। উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট কলাবতেরা সেসব আসরে যোগ দিতেন। উৎসাহী শ্রোতারা অপেক্ষা করে থাকতেন সেই সম্মেলনের আশায়। কারণ, বার্ষিক নয়, কখনো পাঁচ বছর, কখনো ছয়-সাত বছর পরেও এই আসর বসত। আর, পশ্চিমে এটিই সব চেয়ে বড় জলসা।

সেই সম্মেলন সেবার এলাহাবাদে বসছে। সুতরাং শহরে তখন এটিই সব চেয়ে বড় সংবাদ। অনেকের সঙ্গে বিশ্বেশ্বরও সে আসরের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলেন। আরো এক কথা। সামাজিক সাংস্কৃতিক সমস্ত অনুষ্ঠানে যেমন, এ ব্যাপারেও রামেশ্বর হলেন একজন প্রধান।

এই সম্মেলনে বৃন্দাবন নিবাসী সঙ্গীতাচার্য অযোধ্যাপ্রসাদ তেওয়ারীও আসবেন। শুধু তাই নয়। তিনি অতিথি হবেন রামেশ্বরের আবাসে। এলাহাবাদে উপস্থিত হলেই তিনি এখানে সসম্মানে বাস করে যেতেন। এসব কথাও শুনলেন বিশ্বেশ্বর।

বয়সে তখনই বৃদ্ধ অযোধ্যাপ্রসাদ। কিন্তু দেহে মনে সঙ্গীত-শক্তিতে রীতিমত সক্ষম। উত্তর ভারতের সমকালীন এক শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী তিনি। আকুমার ব্রহ্মচারী, ঐকান্তিক সঙ্গীত-সাধক। সঙ্গীত-চর্চা ভিন্ন অন্য কোন লক্ষ্য বা আকর্ষণ অযোধ্যাপ্রসাদের জীবনে ছিল না। শিষ্যদের সঙ্গীতশিক্ষা দিতেন পুত্রস্নেহে, অকাতরে। খাণ্ডারবাণী রীতির ধ্রুপদী বলেই সঙ্গীতজগতে তাঁর পরিচিতি ছিল।

এবার এলাহাবাদ সম্মেলনে যোগ দিতে এলেন অযোধ্যাপ্রসাদ।

আর রামেশ্বর সেই উপলক্ষ্যে বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলেন।

অযোধ্যাপ্রসাদকে তিনি বললেন, 'এই ছেলেটির সঙ্গীতে বড় আগ্রহ। আপনি অনুগ্রহ করে বিশ্বেশ্বরের যদি শিক্ষার ভার নেন আমি কৃতজ্ঞ হব।'

রামেশ্বরের এমন অনুরোধ। তখনি আচার্য সম্মত হলেন। আর কৃতার্থ বোধ করলেন বিশ্বেশ্বর।

সে সময় থেকেই আরম্ভ হল তাঁর যথার্থ সঙ্গীতশিক্ষা। কাজের অবসরে অখণ্ড মনোযোগে এবং পরিশ্রমে তিনি সাধনা আরম্ভ করলেন।

গুরুর নির্দেশ পালন করতে লাগলেন মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। প্রায় তিরিশ বছরের শিক্ষার্থী জীবন তাঁর। গুরু এক এক সময় এলাহাবাদে শিষ্যের গৃহেও অবস্থান করে যেতেন। পিতার তুল্যই তিনি মান্য করতেন শিক্ষাদাতাকে। এমনিভাবে বিশ্বেশ্বরের সঙ্গীতশিক্ষা চলতে থাকে।

অযোধ্যাপ্রসাদের শিষ্য বলেই বিশ্বেশ্বর ক্রমে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। মধ্যবয়সেই প্রতিষ্ঠা পেলেন কৃতি ধ্রুপদীরূপে।

উত্তর ভারতের সব বড় বড় আসরেই তাঁর গান হতে লাগল। সাফল্যে মণ্ডিত হলেন ধ্রুপদগুণী বিশ্বেশ্বর।

এলাহাবাদেই তিনি স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পড়েন। নিজের বাড়ি করেন কর্নেলগঞ্জে। কর্মস্থলের মতন এই শহর তাঁর সঙ্গীতজীবনেরও কেন্দ্র হয়।

'এলাহাবাদের বিশ্বেশ্বর' নামেই সঙ্গীতজগতে প্রসিদ্ধ হন তিনি। আর তাঁর একাধিক শিষ্যও হন এলাহাবাদে। তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে পরিচিত, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। নিজে ধ্রুপদের চর্চা বজায় রেখে 'এলাহাবাদ সঙ্গীত সমাজ' প্রতিষ্ঠা করে নগেন্দ্রনাথ গুরুর ধ্রুপদের ধারা ও স্মৃতি অনেকদিন এ শহরে সঞ্জীবিত রেখেছিলেন।

পশ্চিমে বিশ্বেশ্বরের আর একজন শিষ্য ছিলেন, বেহালাবাদক সূর্য কাহার। গোয়ালিয়রে তাঁর সঙ্গে এই যন্ত্রীর পরিচয় হয়। সূর্য

কাহার আগে ছিলেন গয়ার কোন গুণীর শিষ্য। পরে বিশ্বেশ্বরের কাছে অনেকদিন রাগবিদ্যা শিখেছিলেন।

কলকাতাতেও ছাত্র ছিলেন বিশ্বেশ্বরের। কারণ শেষজীবনে আর তিনি এলাহাবাদে ছিলেন না। ১৮৯৮ সালে সেখানকার পাট তুলে দিয়ে চলে আসেন বড়িশায়। সেখানেই অন্তিম পর্বের প্রায় তের-চোদ্দ বছর বাস করেছিলেন।

বেহালার বড়িশা অঞ্চলে মাননীয় সঙ্গীতাচার্য রূপে সম্মান পান বিশ্বেশ্বর। জীবনের সেই শেষ পর্যায়ে।

বেহালার বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কৃতী খেয়াল গায়ক। বিশ্বেশ্বরের বাড়িতে বামাচরণ মাঝে মাঝে আসতেন। গান হত তাঁর। যেদিন সুস্থ থাকতেন, বর্ষীয়ান আচার্যও সন্ধ্যার আসরে যোগ দিতেন। তিরিশ বছরের বয়োকনিষ্ঠ বামাচরণকে তাঁর শিষ্যস্থানীয় বলা যায়। বড়িশাতেই তাঁর আর এক শিষ্য ছিলেন নীলরতন রায়চৌধুরী।

একেবারে শেষ বয়সে, প্রায় ৭০ বছরে বিশ্বেশ্বর বাংলার সঙ্গীত-জগতে পরিচিত হতে আরম্ভ করেন। তাও মাত্র কয়েক বছর সঙ্গীতক্ষম থাকেন সেই সমাপ্তির অধ্যায়ে। সেজন্য কলাবত বলে বাংলায় যোগ্য প্রসিদ্ধি তাঁর হয়নি। খ্যাতি সীমাবদ্ধ ছিল শুধু গুণীসমাজেই।

৭৮ বছর বয়সে তাঁর জীবনের অবসান হয়—১৯১১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর। সে শোকসংবাদ পরের দিন কলকাতার দৈনিক পত্রিকা-গুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন আর তিনি বড়িশায় থাকতেন না। তাঁর শেষনিঃশ্বাস পড়েছিল কলকাতায়—ঠনঠনিয়ার ৩।২ শম্ভুচরণ চাটুজ্যে স্ট্রীটে।

নিরহঙ্কার অথচ গভীর আত্মপ্রত্যয়ী ধ্রুপদী ছিলেন তিনি। বাংলায় তাঁর স্বল্পকালের জীবনেও সেই শ্রুতি স্মৃতি থেকে যায়।

উত্তরপাড়ার একটি আসরের কথা বলা হয়েছে আগে। আর একটি উদাহরণ দিয়ে তাঁর কাহিনী শেষ করা হবে। এ

আসরও তাঁর শেষ জীবনের কথা। বড়িশায় তখন তিনি বাস করতেন।

আসর হয় কলকাতায় প্রত্যুম্ন মল্লিক মহাশয়ের পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতে। সেখানে তাঁর গানের সঙ্গে সঙ্গত করতে আসেন কলকাতার এক বিখ্যাত পাখোয়াজী। বিশ্বেশ্বরকে তিান সঠিক জানতেন না।

সে আসরে তিনি রামকেলীতে গান আরম্ভ করতেই পাখোয়াজী তাঁর এক শিষ্যকে বললেন, 'তুই বাজা। এখানে আর আমি কি বাজাব।'

বিশ্বেশ্বর ক্রোধ বা বিরক্তি কিছুই দেখালেন না। আলাপ শেষ করে শান্তভাবেই আরম্ভ করলেন গান।

কিন্তু সেই শিষ্য পাখোয়াজী সঙ্গত করতে গিয়ে সম ধরতে পারলেন না। বিশ্বেশ্বর ধীর কণ্ঠে পাঁচ-ছয় বার গাইতে লাগলেন গানের মুখটি।

কিন্তু এমন কঠিন তার লয় যে. পাখোয়াজী কিছুতেই সম খুঁজে পেলেন না। কেবল 'কূড় কুড কুড়' শব্দই করতে লাগলেন পাখোয়াজে। ঠেকা আর বেরুল না।

সভার পরিবেশ আড়ষ্ট হয়ে উঠল। অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন শ্রোতারা। পাখোয়াজীর ওস্তাদ তখন শিষ্যের অবস্থা দেখে তাঁর হাত থেকে পাখোয়াজ নিজেই নিয়ে বসলেন। মান বাঁচাবার জন্যে আরম্ভ করে দিলেন সঙ্গত। বিশ্বেশ্বরের গান তেমনি আড়ি ছন্দে ঠায়ে চলতে লাগল।

কিন্তু ওদিকে শোচনীয় দেখা গেল পাখোয়াজীর অবস্থা। শিষ্যের চেয়ে তাঁর এইটুকু উন্নতি হল যে, সম কোনক্রমে খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু ওই পর্যন্ত। তিনি আশা করেছিলেন গায়ক এবার গান আরো স্বচ্ছন্দ করবেন আর তিনি হাত খুলে বাজাতে পারবেন।

কিন্তু এমন কঠিন লয়ের গতি যে, কোনরকমে ঠেকা ছাড়া আর কিছুই কাজ দেখাতে পারলেন না পাখোয়াজী। অথচ তিনি রীতিমত নামী বাজিয়ে আর তেমনি অহঙ্কারী। তাঁর সে দর্প চূর্ণ হল এমন প্রকাশ্য আসরে। সকলেই দেখলেন তাঁর অপ্রস্তুত অবস্থা।

বিশ্বেশ্বর শেষ পর্যন্ত তেমনি মানেই গেয়ে গেলেন। আর মাত্র ঠেকা দিলেন পাখোয়াজী।

গানের পর বিশ্বেশ্বরকে তিনি অবশ্য খুবই সুখ্যাতি করলেন। কিন্তু তাঁর নিজের সম্মান রক্ষা হল না শ্রোতাদের বা গায়কের কাছে। শ্রোতারা সার্থক শিল্পী বিশ্বেশ্বরের স্মৃতি নিয়েই সেদিন ঘরে ফিরলেন।

বিস্মৃত হারমোনিয়াম-শিল্পী

॥ মীর্জা সাহেব ॥

আঙুলে খেলিতেছে সাতটি স্বর সাতটি যেন পোষা পাখি।

শুধু সাত কেন। সাতটি তো শুদ্ধ স্বর। ঠুংরি অঙ্গে আর তেমন তেমন রাগে বারোটি স্বরও হতে পারে, কোমল কড়ি নিয়ে। যেমন ভৈরবী কিংবা পিলুতে পোষা পাখির মতন কলস্বরে সেই সব স্বর ঝমঝম বেজে উঠছে।

হারমোনিয়মে কালো শাদা চাবির সারি। আর তার ওপর চলন্ত গোলাপী-গোরা আঙুল কটি। যেন মোলায়েম তুলির টানে আসা যাওয়া করছে তারা। আর চোখের পলকে শাদা কালো পর্দা কটি অনর্গল ওঠা-নামা করে চলেছে। বাঁ দিক থেকে ডাইনে। আর এদিক থেকে ওদিকে। তারা গ্রামে ঘুরে এসে আবার খাদ হয়ে মন্দ্র সপ্তকে। সাড়ে তিন অকটেভের বিস্তার। আর সেই আঙুলের পরশ পেয়ে চাবির সার বেয়ে যেন ছোট ছোট ঢেউ খেলে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে নেচে চলেছে সুরের ঝর্ণা ধারা।

হারমোনিয়মের পর্দায় পর্দায় এত ত্বরিৎ, এমন মোলায়েম ওঠা-নামা—যেন একটির গায়ে আর একটি মিলে গেছে। একটির সঙ্গে মিশছে আর একটি স্বর। যেন মিড়ের কাজ। স্বর থেকে স্বরান্তরে, মাঝেরটি স্পর্শ করে গড়িয়ে বয়ে যাওয়া। শ্রুতির সূক্ষ্ম ক্রিয়া তো হারমোনিয়মে দেখানো যায় না। তবু মিড়ের কাজ হচ্ছে যতদূর সম্ভব।

শিল্পীর অন্তর সুরে এত পূর্ণ, হাত এমন সাধনে দুরন্ত যে চাবির গায়ে গায়ে মিড়ের ঢল নেমে আসছে। আর কত তার চিকনতা।

কখনো শিল্পী আশ্চর্য সাপটে কটি পর্দা ছুঁয়ে যাচ্ছেন ঘর্ষণের ধরনে। আর হারমোনিয়মে যেন আশ্‌-এর কাজ ফুটে উঠছে।

এমনি নানা অলঙ্কারে, সুরের নির্যাসে যেন কথা কইছে সুদৃশ্য যন্ত্রটি।

মীর্জা সাহেবের সেই হারমোনিয়ম বাদন। সেকালের আসরে ছিল এক মহা-উপভোগের যন্ত্রসঙ্গীত। এই শতকের ত্রিশের দশকে আর বিশের দশকে। আরো পাঁচ-দশ বছর আগেও।

সুরের সঙ্গতে যেমন, একক আসরেও তেমনি। খেয়াল অঙ্গেও মীর্জা সাহেব বাজাতেন। কি তৈরী সে বাজনা। এমন এক একটি কর্তব করতেন যা অনেক গায়কের পক্ষেও অসম্ভব। ছোট ছোট তান কিংবা টুকরো ফিরৎ। কিংবা রকমারি পাল্টা। তিন গ্রামে পাল্লা দিয়ে ঘুরে আসা বড় বড় তান সব দেখাতেন পরিপাটি ভাবে। সাধা কণ্ঠে খেয়াল গানই যেন হারমোনিয়মে বেজে চলেছে। কণ্ঠের বদলে যন্ত্রে। এই বাঁধা পর্দার বিদেশী যন্ত্রে যতদূর সম্ভব তার শেষ সীমা পর্যন্ত শিল্পী দেখিয়ে দিচ্ছেন সুরের বিস্তার।

মীর্জা সাহেবর বাজনা। তা এত প্রাণবন্ত হবার কারণ, তিনি নিজেও গায়ক ছিলেন। তবে গান গাইতেন না আসরে। ঘরোয়া ভাবে কখনো গাইতেন। তা ছাড়া গানের তালিম দেবার সময়ও দেখাতেন গেয়ে। তখন শোনা যেত তাঁর সুকণ্ঠ। গানে অভিজ্ঞ না হলে সুরযন্ত্রের ভাল শিল্পী হওয়া যায় না। প্রায় তাবৎ গুণী বাদকদেরই নেপথ্যজীবনে থাকেন একেক জন গায়ক। অলক্ষ্যে সেই সত্তা যন্ত্রীর হাতে সুর সঞ্চার করে তবেই জীবন্ত হয়ে ওঠে তাঁর পর্দা কিংবা তারের ঝঙ্কার।

মীর্জা সাহেবও গানের চর্চা করেছিলেন ভাল ভাবে। শুধু খেয়াল নয়, হোরি ধামার। রামপুর দরবারের বীণকার (অন্তরালে ধ্রুপদ হোরি ধামার থেকে ঠুংরি পর্যন্ত নানা রীতির গায়কও।) উজীর খাঁর কাছে তিনি হোরি ধামার শিখেছিলেন। তেমনি নিজের ছাত্রদেরও হোরি

খামার খেয়াল ঠুংরি সবই দিতেন মীর্জা সাহেব। গান গেয়ে শেখাতেন সেসব।

তবে আসরে তিনি ঠুংরিই বেশি বাজাতেন। একক অনুষ্ঠানে কিংবা গানের সঙ্গতে। কারণ ঠুংরি তাঁর ছিল প্রাণের প্রিয়। তার মিহি কারুকর্ম, তার মিষ্টত্ব, তার লাবণ্য তাঁর মনোহরণ করেছিল। আর তার শৃঙ্গার রসের আবেদন। বোল বানিয়ে বানিয়ে হৃদয়ের আবেগ আকুতি কত ভাবে প্রকাশ করা। বোল বানানা ঠুংরি। এই চালের ঠুংরির চর্চাই মীর্জা সাহেব করেছেন। গান থেকে হারমোনিয়মে। আসরেই তাই বাজান। এই রীতির ঠুংরিই তাঁর প্রিয়।

গণপৎ রাওয়ের ঠুংরিও তো এই ধরনেরই। মীর্জা সাহেবও সেই একই ধারার শিল্পী। এই পছন্দ-করা যন্ত্র হারমোনিয়মে ঠুংরি রীতিতে তাঁর দরদের চর্চা। হারমোনিয়ম আর ঠুংরি। এই দুই নিয়েই তাঁর আসল সঙ্গীতজীবন। ঠুংরির মরমীয়া তিনি।

তবে গানে নয়, হারমোনিয়মে। আর আসরে সেই ভাবেই তাঁকে দেখা যায়। পঞ্চাশ-ষাট কি আরো কিছু বছর আগেকার কলকাতায়। তখনকার আসরে আসরে।

ঠুংরি গানের আবেগ আর হৃদয়স্পর্শী ভাব তাঁর হারমোনিয়মে মেতে ওঠে। এক একটি ঠুংরি গানই যেন বাজতে থাকে কণ্ঠের আবেদন নিয়ে। তাঁর যন্ত্রের চাবিতে চাবিতে, তাঁর আঙুলের মরমী ছোঁয়ায়। শুভ্র আঙুল কটি সুরের ধারায় হারমোনিয়মের পর্দায় পর্দায় যেন নৃত্য করে চলে।

মীর্জা সাহেবের হারমোনিয়ম বাজনা। এতদিন যাবৎ এমনি ভাবে বাজিয়েছেন, এতক্ষণ ধরে বাজান যে আঙুলগুলির এই বাঁকানো ভঙ্গী অন্য সময়েও থেকে যায়। আঙুলের মাঝখান থেকে বাঁকা দেখায় বাজাবার ভঙ্গিমায়। হারমোনিয়ম যখন বাজান না, তখনো বাঁ হাতের আঙুলগুলি অর্ধ-গোলাকার, বাঁকানো থাকে। সোজা করা যায় না আর। সোজা করবার চেষ্টাও তিনি করেন না। এখনি

হয়ত আবার হারমোনিয়ম নিয়ে বসতে হবে। আবার তো বাজনা চলবে আঙুলের মাথা বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে।

মীর্জা সাহেবের বাঁ হাতের আঙুলগুলি বাঁকানো। কারণ তিনি ডান হাতে হারমোনিয়মের বেলো করেন। আর বাজান বাঁ হাতে।

গণপৎ রাওয়ের গোষ্ঠীর আরো কজনেরই এমনি বাজানোর দৃষ্টান্ত আছে। স্বয়ং গণপৎ রাও বাঁ হাতে বাজাতেন। আর বেলো করতেন ডান হাতে। তেমনি তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে দুজন—গয়ার গফুর খাঁ আর ইন্দোরের বসির খাঁও। গণপৎ রাওয়ের প্রধান শিষ্যদের মধ্যে ডান হাতে বাজাতেন অবশ্য শ্যামলাল ক্ষেত্রী, ইরসাদ (গয়ার) এমনি কজন। গয়ার সোহনীজীর নামও তাঁদের সঙ্গে করা যায় বটে। তবে তিনি গণপৎ রাওজীর তালিম পাননি অমন সাক্ষাৎ ভাবে।

মীর্জা সাহেবও গণপৎ রাওয়ের ঠিক শিষ্য নন। কিন্তু তাঁর বিরাট হারমোনিয়ম-বাদক গোষ্ঠীর একজন বলা যায় তাঁকে। গণপৎ রাওয়ের প্রিয় শিষ্য শ্যামলাল ক্ষেত্রীর সঙ্গে মীর্জা সাহেবের অতি ঘনিষ্ঠতা ছিল সঙ্গীতেরই সূত্রে। আর শ্যামলালজীর শিষ্য-স্থানীয় গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীরও তিনি অন্তরঙ্গ ছিলেন। গিরিজা-শঙ্করের ঠুংরি গানের প্রতিভা যখন পূর্ণ বিকশিত তখন তাঁর গানের সঙ্গে মীর্জা সাহেবের হারমোনিয়ম সঙ্গত হত নানা আসরে। কলকাতায় বহু আসরেই সে সময় গিরিজাশঙ্করের সঙ্গতকারী বাজনা তাঁর শোনা যেত।

আরো অনেকের সঙ্গে দেখা যেত মীর্জা সাহেবকে হারমোনিয়ম বাজাতে। বিখ্যাত গায়ক-গায়িকা থেকে শুরু করে অখ্যাত শিল্পীর সঙ্গেও। মৌজুদ্দিন কিংবা আগ্রাওয়ালী মালকা জানের সঙ্গে যেমন বাজিয়েছেন, তেমনি অন্য অনেকেই তাঁকে পেয়েছেন। এক সুলভ উপায় ছিল তাঁর হারমোনিয়ম শোনার। সে তাঁর চরিত্রের একটি দুর্বলতা কিংবা এক প্রধান বৈশিষ্ট্য।

যেখানে সেখানে যার তার সঙ্গে তিনি আসরে বাজিয়েছেন। তবু মীর্জা সাহেব একজন দস্তুরমত গুণী। আর হারমোনিয়মে এমন শিল্পী কজন ছিলেন সেকালের কলকাতায়? একমাত্র শ্যামলাল ক্ষেত্রী ভিন্ন?

গণপৎ রাওয়েরই আর এক কৃতী শিষ্য ছিলেন কলকাতায়। হারমোনিয়ম বাদক ইরসাদ। কিন্তু ইরসাদের চেয়ে অনেক ভাল বাজিয়ে তো বসির খাঁ। বিখ্যাত খেয়াল-দিকপাল আল্লাদিয়ার ভ্রাতুষ্পুত্র তিনি। সেই বসির খাঁ নিজেও বলতেন, 'মীর্জা সাব—হামসে আচ্ছা বাজা বাজাতা।'

শ্যামলালজী তো সৌখিন অর্থাৎ অপেশাদার। মীর্জা সাহেব কিন্তু অদৃষ্টের ফেরে পেশাদার হয়ে পড়েছিলেন। যদিও অর্ধ-সৌখীন হয়ত বলা যায় তাঁকে। কারণ বিনা মুজরোতেও বাজাতেন আসরে। অন্তত সঙ্গীত-জীবনের প্রথম কিছু বছর। হয়ত বরাবর অপেশাদার থাকবার ইচ্ছা ছিল তখন। কিন্তু জীবনের শেষ দিকে সে সৌখীনতা আর ছিল না।

যে কোন আসরে যা হোক মুজরোয় তখন দেখা যেত তাঁকে। হারমোনিয়ম নিয়ে বসেছেন। কখনো একক, কখনো সঙ্গতকার। পর্দায় পর্দায় আঙুলের খেলায় সুরের লীলা ঠিকই আছে। কিন্তু প্রথম জীবনে দেখা অনেকেই হয়ত চিনতে পারবেন না তাঁকে। এই বৃদ্ধই কি সেই মীর্জা সাহেব? মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটি পরিবর্তন! চেহারায় তো হবেই। কিন্তু পোশাকে-আশাকে ধরন-ধারণে? কোথায় সেই সব লোমদার কি জরিদার টুপির বাহার? সৌখীন পিরান চুস্ত পায়জামা? ওই নৃত্যপর আঙুলে কোথায় গেল ঝকমকে আংটি? কানে তুলোর টিপ থেকে লক্ষ্ণৌয়ি আতঙ্কের খসবু? মাথায় চিকনকৃষ্ণ কেশ? সেই গোলাপী গৌরবর্ণ আর মুখ-চোখের চমৎকার ছাঁদ শুধু খানিক আছে। শরীরটি ছোটখাটো বলে হয়ত ভাঙেনি তেমন। কিন্তু চিবুকে কপালে গালে

ফুটে উঠেছে জরার বলিরেখা। বাঁকানো আঙুলের মতন পিঠও একটু ঝুঁকে পড়ছে। আর শাদা চুল, শাদা ভ্রূ, ফর্সা গায়ের রঙের সঙ্গে আরো করুণ দেখিয়েছে মলিন বেশবাস।

কে মীর্জা সাহেব?

আসরের অনেকেই হয়ত জানেন না সেকথা। জানবার কৌতূহলও সম্ভবত নেই।

কিন্তু জানাবার মতন পরিচয় আছে মীর্জা সাহেবের। নবাব ওয়াজেদ আলির এক পৌত্র তিনি!

সে বংশ-কথা বলবার আগে মীর্জা সাহেবের সঙ্গীতজীবনের আরো কিছু কথা বলা বলে নেওয়া যায়।

কলকাতায় তাঁর আসর সচরাচর কোথায় হত। গান কিংবা হার-মোনিয়ম কে কে শিখেছিলেন তাঁর কাছে, এই সব প্রসঙ্গ।

মুজরো নিয়ে কিংবা বিনা মুজরোতে নানা আসরে তিনি বাজাতেন। সে সব সাময়িক আসর। কিন্তু নির্দিষ্ট কটি আসর তাঁর ছিল। সেখানে তিনি মাঝে মাঝেই বাজাতেন। বেশির ভাগই একক বাদন। তা তাঁর বন্ধু-বান্ধব বা সঙ্গীতজীবনের সহযোগী অনুরাগী, শিষ্য প্রভৃতিদের ঘরোয়া আসরে। অবশ্য এসব আসরে তিনি অপেশাদার হয়েই যোগ দিতেন, গুণপনা দেখাতেন।

এমনি আসর তাঁর সবচেয়ে বেশি হত শ্যামলাল ক্ষেত্রীর হ্যারিসন রোডের আস্তানায়। শ্যামলালজীর সেই ১০১ সংখ্যক বাড়িতে। সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ আর কলেজ স্ট্রীটের মাঝামাঝি, দক্ষিণমুখী। পাঁচতলা কোঠি। তার দোতলায় সে যুগের একটি সঙ্গীত-তীর্থ ছিল। কত ভারতপ্রসিদ্ধ কলাবৎ-কলাবতীদের সঙ্গীত চর্চায় আর যোগাযোগের কেন্দ্ররূপে ধন্য হত ক্ষেত্রী মহাশয়ের সেই নিত্য আসর। মীর্জা সাহেবেরও অনেক দিনের অনুষ্ঠান সেখানে হয়ে গেছে। সেই ১০১ হ্যারিসন রোড থেকেই গিরিজাশঙ্করের সঙ্গে মীর্জা সাহেবের আলাপের সূত্রপাত।

মেছুয়াবাজারে কিশোরীলাল চৌধুরীর বাড়িতেও প্রায়ই তাঁর বাজনা হত। চৌধুরীজীর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল মীর্জা সাহেবের। এখানে মাঝে মাঝে তিনি থেকেই যেতেন। কিশোরীলাল ছিলেন পাটনার লোক এবং সেকালের সুপরিচিত 'তাম্বুল বিহার' ব্যবসায়ী। তিনি কলকাতায় একজন সঙ্গীতপ্রেমী হিসেবে বাড়িতে আসর বসাতেন। কলকাতায় মীর্জা সাহেবের মতই অনেক গুণীই শুধু নন। লক্ষ্ণৌর রাজা নবাব আলি, গয়ার সোহনীজীর তুল্য গুণীরাও যোগ দিয়ে গেছেন কিশোরীলালের আসরে।

মেছুয়াবাজার অঞ্চলেই ফজ্জে মিয়া নামে তাঁর এক দোস্তের বাড়িতেও মীর্জা সাহেব মাঝে মাঝে আসর করতেন।

প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে, কিষণচাঁদ, বিষণচাঁদ, রাইচাঁদ বড়াল ভ্রাতাদের আসরেও বাজাতেন মীর্জা সাহেব।

বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের ছোটকালালের গৃহেও তাঁর আসর হত। ছোটকালালের পুত্র হলেন পরবর্তীকালের সঙ্গীতজগতে লালাবাবু নামে সুপরিচিত দামোদারদাস খান্না। পরে কলকাতায় উচ্চমানের এবং সর্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলনে আর নানা সঙ্গীতাসরের সঞ্চালক হিসাবে দেখা যায় লালাবাবুকে। তাঁদের ১৭, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে মীর্জা সাহেবের অনেক দিনের আসর হয়ে গেছে। ছোটকালাল তাঁর একজন শিষ্যও।

এমনি আরো কটি নির্দিষ্ট আসরে মীর্জা সাহেবের হারমোনিয়ম শোনা যেত।

তাঁর সারা সঙ্গীতজীবন কেটেছিল কলকাতায়। এ শহরের নানা ধরনের আসরে তিনি যোগ দিতেন। একবার একটি বড় জলসা হল নাট্যমন্দির মঞ্চে। বাংলার এস্রাজগুণী শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য রজনী হিসেবে অনুষ্ঠান। সে আসরে অংশ নেন হাফেজ আলি, আলাউদ্দিন খাঁ প্রমুখ অনেক বিখ্যাত কলাকার। মীর্জা সাহেবও সেদিন একক হারমোনিয়ম শুনিয়েছিলেন। সমবেত

শিল্পীদের একটি ফটোগ্রাফ নেওয়া হয়েছিল সে আসরে। মীর্জা সাহেবকেও সে চিত্রে দেখা যায়। সেইটিই বোধহয় তাঁর একমাত্র প্রতিকৃতি।

এক সময় 'আসর' নামে একটি সমিতি হয় ২০, চৌরঙ্গীতে। তার উদ্দেশ্য ছিল গুণী গায়ক বাদকদের উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়ে প্রতি মাসে অনুষ্ঠান করা। কলকাতায় তবলাচর্চার জন্যে সুপরিচিত মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সেখানে পরে মন্মথনাথেরই এক স্মৃতি-রজনীর সংবাদ পাওয়া যায়। ১৯৩২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর সেই জলসায় গান গেয়েছিলেন গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, তবলা বাজিয়েছিলেন লক্ষ্ণৌর ওস্তাদ আবেদ হোসেন। আর 'সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা'র ভাষায় 'প্রসিদ্ধ ওস্তাদ মীর্জা সাহেবের হারনো-নিয়ম' বাদনও সেদিন হয়েছিল।

এমনি নানাভাবে কলকাতায় সঙ্গীতজীবনে জড়িত ছিলেন মীর্জা সাহেব।

তাঁর শিষ্যমণ্ডলী বিরাট ছিল বলা যায়। আর কলকাতার বাইরে বহুদূর পর্যন্ত তা বিস্তৃত ছিল, পূর্ববঙ্গের কোন কোন জেলা পর্যন্ত।

মীর্জা সাহেবের কাছে যাঁরা নানা সময়ে শেখেন, তাঁদের কয়েক-জনের নাম পরিচয় এখানে দেওয়া হল :

(১) তিলজলার সাহাবুদ্দিন। ইনি হারমোনিয়মে ভাল তালিম পেয়েছিলেন। ভাল বাজাতেনও মীর্জা সাহেবের ঢঙে।

(২) জানি সাব নামে পরিচিত, মেটিয়াবুরুজের তফজ্জুল হোসেন। বিখ্যাত ঠুংরি দাদরা গজল ইত্যাদির গায়ক পিয়ারা সাহেবের পুত্র জানি সাহেব কৃতী হারমোনিয়ম বাদক হয়েছিলেন। তিনি গায়কও ছিলেন জমিরুদ্দিন খাঁ, ঝণ্ডে খাঁ প্রভৃতি নানাজনের তালিমে। কিন্তু হারমোনিয়মে জানি সাব শুধু মীর্জা সাহেবের শিক্ষাই পান।

(৩) বৌবাজারের ধীরেন্দ্রনাথ দাসও মীর্জা সাহেবের একজন

প্রিয় শিষ্য। তিনি তাঁর ভাল তালিম পেয়েছিলেন হারমোনিয়মে। কলকাতায় খরজ-পরিবর্তন-সক্ষম (স্কেল চেঞ্জিং) হারমোনিয়মের এক আদি নির্মাতা সুরেন্দ্রনাথ দাস তাঁর পিতা। সুরেন্দ্রনাথ নিজে হারমোনিয়ম বাদকও ছিলেন। গণপৎ রাওয়ের শিষ্য বসির খাঁ হলেন সুরেন্দ্রনাথের হারমোনিয়মের ওস্তাদ। সুরেন্দ্রনাথের হারমোনিয়মের দোকান (৬৯ হ্যারিসন রোডে) শ্যামলাল ক্ষেত্রীর বাড়ির কাছেই ছিল। সেই সূত্রে শ্যামলালজী ও তাঁদের গোষ্ঠীর অনেকের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। হারমোনিয়ম নির্মাতা বলেও তাঁদের সঙ্গে তাঁর সহযোগিতা থাকত। মীর্জা সাহেবও সুরেন্দ্রনাথের কাছে আসতেন হারমোনিয়মের জন্যে। এমনি পরিচয়ের ফলে সুরেন্দ্রনাথের পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ মীর্জা সাহেবের কাছে শিখতে আরম্ভ করেন। তারপর সতের-আঠার বছর ছাত্র সম্পর্ক রাখেন, ওস্তাদজীর প্রায় মৃত্যুকাল পর্যন্ত। মীর্জা সাহেবের এক যোগ্য শিষ্য হয়ে ধীরেন্দ্রনাথ দাস কলকাতার আসরে গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর সঙ্গেও অনেকবার হারমোনিয়ম সঙ্গত করেছেন। কোন কোন আসরে গিরিজাশঙ্করের গানের সঙ্গে এক পাশে বসে বাজিয়েছেন মীর্জা সাহেব, অন্য দিকে ধীরেন্দ্রনাথ।

(৪) টেরিটি বাজার অঞ্চলের আলি মহম্মদ সুস্তরিও মীর্জা সাহেবের এক শগীর্দ্। অতি রূপবান ইরাণী আলি মহম্মদ সুস্তরি তাঁর কাছে হারমোনিয়ম শিখতেন।

(৫) বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের লক্ষ্মীনারায়ণ গান আর হারমোনিয়ম দুই-ই শেখেন মীর্জা সাহেবের কাছে।

(৬) শ্রীহট্টের তৎকালীন নবাবও তাঁর হারমোনিয়মের শিষ্য ছিলেন।

(৭) মেছুয়াবাজারের কিশোরীলাল চৌধুরীর ভাই রামনারায়ণ চৌধুরী আর কিশোরালালের এক পৌত্রও হারমোনিয়ম শিখতেন মীর্জা সাহেবের কাছে।

(৮) ঢাকার কাজী হাউস নিবাসী মহাসৌখিন জমিদার জালালুদ্দিন আকবর কলকাতায় তাঁর কাছে হারমোনিয়ম কিছু কিছু শেখেন।

(৯) মুর্শিদাবাদের মৈনুদ্দিন মীর্জাকেও তাঁর হারমোনিয়ম শিক্ষা লাভ করতে দেখা যায়। তবে আসলে তিনি ছিলেন মীর্জা সাহেবের দরদী পৃষ্ঠপোষক, অর্থ-সহায়ক।

(১০) বৌবাজারের আবদুল আজিজ খাঁ (সেতারী হাফিজ খাঁর ভাগিনা ও সেতার-শিষ্য) মীর্জা সাহেবের কাছে হারমোনিয়মে তালিম পেয়েছিলেন।

(১১) সুপরিচিত সঙ্গীতজ্ঞ রাইচাঁদ বড়ালও কিছুদিন হারমোনিয়ম শেখেন মীর্জা সাহেবের কাছে।

(১২) মটরবাবু নামে পরিচিত কোরিন্থিয়ান থিয়েটারের হারমোনিয়ম বাদকও মীর্জা সাহেবের অন্যতম শিষ্য।

(১৩) ভ্রাতা নওশেরওয়ান জা'র পুত্র লাডলি মীর্জাও তাঁর কাছে হারমোনিয়ম শেখেন।

(১৪) জোড়াসাঁকোর ছোটকামলও (লালাবাবুর পিতা) মীর্জা সাহেবের হারমোনিয়মে একজন শিষ্য।

(১৫) ঢাকার নবাব পরিবারের কাজাম সাহেবের এক পুত্রও তাঁর কাছে হারমোনিয়ম শিক্ষা করতেন।

(১৬) বড়বাজারের বিখ্যাত হীরা-জহরৎ ব্যবসায়ী বদ্রিদাসের (যাঁর নামে বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রীট) কনিষ্ঠ পুত্রও হারমোনিয়ম শেখেন মীর্জা সাহেবের কাছে।

(১৭) বড়বাজারের তেজপাল ঝুনঝুনওয়ালাও হারমোনিয়মে মীর্জা সাহেবের এক শিষ্য ছিলেন।

(১৮) গড়পারের সুনন্দ ঘোষও (ব্যায়ামবীর বিষ্ণুচরণ ঘোষের অগ্রজ) হারমোনিয়ম শিখতেন তাঁর কাছে।

(১৯) বৌবাজারের কাশীনাথ শীল (রাইচাঁদ বড়ালের আত্মীয়) হারমোনিয়মে মীর্জা সাহেবের কৃতী শিষ্য হয়েছিলেন।

(২০) রামরাজাতলার (হাওড়া) নীলরতন চট্টোপাধ্যায় (গোয়ালিয়রের কলাবতী গায়িকা মঙ্গুবাঈয়ের শিষ্য) মীর্জা সাহেবের কাছেও গান শেখেন কিছুকাল।

তা ছাড়াও লাডলে জঙ্গ (হারমোনিয়মে) পঙ্কজ সরকার (হারমোনিয়মে) প্রভৃতি আরো কয়েকজন মীর্জা সাহেবের কাছে শিক্ষা করেছিলেন। তাঁদের সকলের নাম জানা যায়নি। মীর্জা সাহেবের জামাতা ছিলেন মুর্শিদাবাদ নবাব পরিবারের মঞ্জু সাহেব। ওস্তাদ কাদের বখ্সের তালিমে গঠিত সুকণ্ঠ গায়ক মঞ্জু সাহেব শ্বশুরের সাঙ্গীতিক উত্তরাধিকারও কিছু পেয়েছিলেন।

এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় কলকাতায় মীর্জা সাহেবের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল হারমোনিয়ম চর্চার ক্ষেত্রে। এই যন্ত্রের শিল্পী আর ওস্তাদ হিসেবে সেকালের সঙ্গীতজগতে তিনি সাক্ষর রেখে যান। একক বাদনে, সুরের সঙ্গতকার হয়ে, ঠুংরি দাদরার পরিবেশনে। কলকাতায় রাগসঙ্গীতের আসরে আসরে এই বিদেশী যন্ত্রটিকে (তার অপূর্ণতা সত্ত্বেও) তিনি অনেকের কাছে জনপ্রিয় করেছিলেন।...

সেকালের কলকাতার সঙ্গীতসমাজে এইভাবেই সুপরিচিত ছিলেন মীর্জা সাহেব। আসরে হারমোনিয়মের পর্দায় পর্দায় নৃত্যপর অঙ্গুলি। বাদ্য-বিহীন অবস্থাতেও বাঁকানো আঙুল কটি। অর্ধ-পেশাদার, সুরের সওদাগর। লক্ষ্ণৌর ছিন্নমূল নবাব ওয়াজেদ আলীর পৌত্র। দীন পাঞ্জাবি পাজামায় এক নবাবী অবয়বের অবশেষ। মীর্জা সাহেব। এক পুরুষ আগেও অকল্পনীয় সে দৃশ্য! আর অভাবনীয় জীবনযাত্রা!

মীর্জা সাহেবের সঙ্গীত-জীবন। তার পটভূমিতে ছিল সেকালের মেটিয়াবুরুজ—যেখান থেকে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল।

খিদিরপুরের দক্ষিণ উপকণ্ঠে, গঙ্গাতীরে মেটিয়াবুরুজে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের গার্ডেনরীচ নবাব ওয়াজেদ

আলীর মেটিয়াবুরুজে পরিণত হয়েছিল। মেটিয়াবুরুজ নাম তারও তিনশ বছর আগেকার। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের এক প্রত্যন্ত দুর্গ ছিল এখানে। সেই মাটির গড়ের স্মৃতি বহন করত মেটিয়াবুরুজ নাম। মাটির দুর্গ কিংবা বুরুজের কোন চিহ্নই ইংরেজ আমলে অবশ্য ছিল না।

তবে নবাব ওয়াজেদ আলীর জন্যে মেটিয়াবুরুজের আরেক তাৎপর্য দেখা দিয়েছিল। লক্ষ্ণৌতে যে নবাবীর উৎপত্তি, তার পরিণতি বা পরিসমাপ্তি ঘটে এখানে।

মীর্জা সাহেবের যখন মেটিয়াবুরুজে জন্ম, তখনো নবাবীর রেশ ছিল। লক্ষ্ণৌতে মহা ধূমধামে নবাবী শুরু করেছিলেন ওয়াজেদ আলি। তার অবশেষের পর্ব তাঁর তখনো চলেছিল মেটিয়াবুরুজে। বছরে বারো লক্ষ টাকা তাঁর বৃত্তি। আর বংশানুক্রমে পাওয়া সোনা-দানা হীরে জহরৎ। সেই সব নিয়েই নবাব-জীবনের গোধূলিবেলার অস্তচ্ছটা।

উনিশ শতকের পঁচাত্তর-আশি সালের সেই মেটিয়াবুরুজ! মীর্জার তখন নিতান্ত শৈশব।

লক্ষ্ণৌ থেকে নির্বাসিত নবাবের স্থায়ী আবাস সেদিনের মেটিয়া-বুরুজ। আর সেখানে ওয়াজেদ আলী তখনো দরবার বহাল রেখেছেন। তাঁর সেই ভারত-বিখ্যাত সঙ্গীতের দরবার। প্রথম শ্রেণীর কলাবৎদের আসর বসে তখনো। 'রহস্ মঞ্জিল' জমজমাট। 'পরী'দের নৃত্যগীতে মুখর। নবাব রচিত গীতিনাট্যের মহা আড়ম্বরে অভিনয় হয় সেই মঞ্চে। নবাব নিজেও যোগ দেন। পরিচালনা করেন। নবাবের খাস বাসভবন সুলতান খানা। তারই কাছাকাছি শাহ মঞ্জিল, বৈতুন নাজাত্ ইত্যাদি সদন। নবাবের রঙ্গমঞ্চ—রহস্ মঞ্জিল প্রেক্ষাগৃহ। নবাবের নিজস্ব চিড়িয়াখানা। এ সবই মেটিয়াবুরুজের গঙ্গার ধারে সেই নবাবী এলাকা জুড়ে। সে চত্বরের পূর্বদিকে লৌহ ফটক (যার স্মৃতি এখনো রয়েছে 'আয়রন

গেট রোড' নামের আড়ালে)। আর পশ্চিমে অবারিত গঙ্গার দৃশ্য।

নবাবের সেই শেষ বয়সে মীর্জা সাহেবের শিশুকাল!

নির্বাসিত নবাব তখনো সরকারী বৃত্তি পান বার্ষিক ১২ লক্ষ তন্খা। কিন্তু মাসে মাত্র লাখ টাকায় ওয়াজেদ আলী শার কি করে চলে! বিশাল হারেম। এত বেগম। এত সন্তান-সন্ততি পরিজন-বর্গ। দাসদাসী খিদমদগার। মাস মাহিনায় নিযুক্ত এত গায়ক বাদক। রহস্ মঞ্জিলের নর্তকী গায়িকা অভিনেত্রী বাঈজীরা। আর হেকিম থেকে দর্জি পর্যন্ত নানা পেশার বাঁধা সেবক। আশ্রিত জন বিভিন্ন প্রকারের। আরো আছে। বাগ-বাগিচা। চিড়িয়াখানা। মতবা-ই-সুলতানি : সুলতানের ছাপাখানা। নবাবের রচনা সব কেতাব যেখানে মুদ্রিত হয় বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিতরিত হবার জন্যে। এসব ছাড়াও নবাবেরর নিজস্ব আরো নানা-রকম খরচপত্র আছে।

মাসে লাখ টাকায় সঙ্কুলান কিছুতেই হত না। সব দিক বজায় থাকত না নবাবের খাস কোষাগার না থাকলে। লক্ষ্ণৌতে ক' পুরুষ ধরে নবাবদের সঞ্চিত ধনভাণ্ডার। সওয়া শ' বছরের নবাবীর পরেও কি জমা তখনো! সোনাদানার চেয়ে অনেক দামী দামী হীরে জহরৎ মুক্তো মানিক।

নবাব ওয়াজেদ আলী সেই সব মণি মুক্তো জহরৎ তখনো ফুরাতে পারেননি। তাই বজায় আছে তাঁর মেটিয়াবুরুজের নানা ঠাট-বাট। সঙ্গীতপ্রাণ গুণীতে জমজমাট নবাবের দরবার। তার শ'খানেক কলাবৎ-কলাবতীদের আসর। গান বাজনা নাচ। বাঈজী বেগম। ভোগবিলাস। খাই-খিলাই। দান-খয়রাৎ। খরচের বিস্তর রাস্তা তখনো খোলা আছে।

টান পড়লেই নবাব হাত দেন সেই জমাতে। এক মুঠো তুলে নিলেই আপাতত চলে যায়। নবাবের হীরে জহরৎ কেনবার লোক

কলকাতায় নির্দিষ্ট করুন। তাঁদের খবর পাঠান। তাঁরা কিনে নিয়ে যান মেটিয়াবুরুজে এসে। খুব জরুরি হলে, কিংবা খেয়াল চাপলে নিজেও বেরোন নবাব। নিজের সেই প্রকাণ্ড ফিটন গাড়ির সওয়ার হন। পাকা আমের মতন চেহারায় ফিটনের গদিতে বসে, মুখে তাঁর রূপোর গড়গড়া নল। মাথায় ময়ূরপুচ্ছে সাজানো মুক্তো-বসানো মুকুট। আরো পিছনে নবাবী গড়গড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে উর্দিপরা হুঁকা-বরদার।

বড়বাজারের সেই পাকা জহুরীর বাড়িতে আসেন নবাব। জহুরীর সঙ্গে তাঁর অতি বিশ্বাসের সম্পর্ক। মণিরত্ন ইত্যাদি নবাবের ইনি কিনেছেন, বেচে দিয়েছেন। মেটিয়াবুরুজেও এই কাজে মাঝে মাঝে যান নবাবের তলব হলেই। নবাবের মান রাখতে জানেন। তাই নবাব তাঁর বাড়িতেও আসেন প্রয়োজনে।

নবাবকে খাতির জানিয়ে জহুরী গদীতে বসালেন। লক্ষ্ণৌয়ি আতরের খসবুতে ভরে গেল কক্ষ।

তিনি জানেন, নবাব হীরে জহরৎ কিছু বেচতে এসেছেন। কিন্তু নবাবী কেতা আলাদা রকম। যেন কর্জ করছেন জহুরীর কাছে। জহুরীও সেই মতন কথা বলেন। নবাবের ইজ্জৎ বাঁচিয়ে জানতে চান—আজকের 'উধার' কত হবে।

—দেড় লাখ তন্‌খা।

জহুরী উঠে গিয়ে কোন গুপ্ত সিন্দুক থেকে একটা তোড়া এনে নবাবের সামনে রাখেন।

তারপর দু-চারটে আদব-কায়দা আর বাক্যালাপের পর তসরীফ ওঠান নবাব। তোড়া নিয়ে চলে যান।

তখন জহুরীর সন্ধানী দৃষ্টিতে পড়ে রঙীন রেশমী রুমালের একটি তোড়া। নবাব যেখানে বসেছিলেন, গদীর সেখানেই রয়েছে। যেজন্যে এসেছিলেন, সেটি রেখে গেছেন নবাব।

সুগন্ধী রেশমী তোড়াটি জহুরী খুলে ফেলেন। ঝকমক করে

ওঠে সাচ্চা হীরে মুক্তোর ছটা। যাচাই করতে থাকেন জহুরী। হিসেব করেন। এক লাখ ষাট-পঁয়ষট্টি হাজার হবে জরুর। সত্তর হাজারও হতে পারে।

এমনিভাবে নবাব নগদা রুপিয়া পেয়ে যান। হীরে জহরতের কারবারী উধার দেন এইভাবে। সুতরাং সে ঋণ পরিশোধ হবার কোন প্রশ্নই নেই!…

ওয়াজেদ আলী শা'র মত সৌখীন জীবন-তরণী এমনি বিচিত্র বিলাসে বয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। সঙ্গীতে, হারেমে, বেগমে, পরীতে। কাব্য-সাহিত্যে, গানে, গীতিনাট্যে, আসরে দরবারে, রহস্ মঞ্জিলে। ভোগে দায়িত্বে, কর্তব্যে, বাহুল্যে-আত্মজন অনুগত ভরণ-পোষণে-সরকারী বৃত্তিতে সঞ্চিত সম্পদে টলমল নবাবী ময়ূর-পঙ্খী।

কিন্তু ভাঁটার স্রোতও অলক্ষিতে তলে তলে বহতা ছিল। তাই ১৮৮৭তে নববারে মৃত্যুর পরেই ঝাঁপিয়ে এল মহাপ্লাবন। মেটিয়াবুরুজের তাবৎ নবাবী এলেকা নিমজ্জিত হ'্য়ে গেল। নীলামে উঠল সুলতান-খানা, শাহ্ মঞ্জিল, রহস্ মঞ্জিল, রাধা মঞ্জিল, শার্দা মঞ্জিল, বাইতুন নাজাত, চিড়িয়াখানা, বাগ-বাগিচা ইত্যাদি নবাবের তামাম মকান জমীন। অনুক্ষণ-সুর-রণনে গুঞ্জরিত সঙ্গীত-দরবার চির-নিস্তব্ধ হল।

মীর্জা সাহেব তখন নিতান্ত বালক বয়সী। নাম খুরসেদ মীর্জা। বিগত নবাবের পঞ্চম পুত্র শাহজাদা আসমন জার দশম ও কনিষ্ঠ পুত্র।

সরকারী নথিপত্রে নবাবজাদাদের নামমাত্র প্রিন্স খেতাব রইল। কিন্তু নবাবী মঞ্জিল থেকে বিদায় নিলেন তাঁরা। অনেকেই মেটিয়া-বুরুজ ত্যাগ করে গেলেন। অন্যত্র। অভাবিত অবস্থায়। কেউ বসতি করলেন নিকটবর্তী খিদিরপুরে। কেউ আর একটু দূরে ওয়েলেসলী অঞ্চলে। কেউ বা মেটিয়াবুরুজেই অন্য এলাকায় অন্য ভাবে বাস পত্তন করলেন।

ওয়াজেদ আলীর চব্বিশজন পুত্র আর একুশটি কন্যা (প্রথম দুই পুত্র তাঁর জীবিতকালে গতায়ু)। তাঁদের মধ্যে পাঁচ পুত্র ও বারো কন্যার জন্ম লক্ষ্ণৌতে। সেখান থেকে নবাব নির্বাসিত হয়ে ১৮৫৬ সালের এপ্রিল মাসে মেটিয়াবুরুজে আসেন। তারপর ২৬ মাস ফোর্ট উইলিয়মে বন্দীজীবন যাপনের পর ১৮৫৮ সালের শেষ থেকে স্থায়ী হন মেটিয়াবুরুজে। এখানে তাঁর ১৯ পুত্র ও ৯ কন্যার জন্ম। এই হিসাব সরকারী পেনসনপ্রাপ্তি ইত্যাদি সূত্রে স্বীকৃত। তা ছাড়াও পুত্র কন্যা হয়ত থাকতে পারেন, বলা যায় না। আর নবাবের বেগমদের সংখ্যা নিশ্চিতভাবে জানা প্রায় অসম্ভব।

এখানে কথা এই যে, এমন মহান সঙ্গীতজ্ঞ পিতার এই গুণ এত পুত্রদের কেউই লাভ করেননি। পৌত্ররাও নন। ব্যতিক্রম কেবল খুরসেদ, পরবর্তীকালের মীর্জা সাহেব। তিনিও পিতামহের সঙ্গীতগুণের এক ভগ্নাংশ পান। কারণ তিনি শুধু হারমোনিয়মশিল্পী এবং গায়ক। কিন্তু নবাব ছিলেন একাধারে বহুমুখী গুণী। গায়ক সেতার-বাদক নৃত্যবিদ বহু স্মরণীয় ঠুংরি গানের রচয়িতা ও সুরকার-ধ্রুপদও রচনা করতেন, যেমন শুক্ল বেলাবলে 'শুভ সগন শুভ লগন ছত্র ধরাউ' ইত্যাদি, সঙ্গীততত্ত্বের গ্রন্থকার (বনি প্রভৃতি), গীতিনাট্য-রচয়িতা ইত্যাদি নানা সাঙ্গীতিক পরিচয় ওয়াজেদ আলী শাহর আছে।

তবু নবাবের শতাধিক পুত্র-পৌত্রদের মধ্যে সঙ্গীত-গুণের একমাত্র উত্তরাধিকারী খুরশেদ মীর্জা। একথাও মনে রাখবার।

খুরসেদের পিতা আসমন জার জন্ম লক্ষ্ণৌতে (আনুমানিক ১৮৫১)। নবাব ওয়াজেদ আলী তখন লক্ষ্ণৌ মসনদে আসীন। তাঁর পঞ্চম পুত্র আসমন জার জননী যে নবাব-বেগম, তাঁর নাম রসক্ মহল। নিবাসনের আগে লক্ষ্ণৌতেই বেগম রসক্ মহলকে নবাব তালাক দিয়েছিলেন। মেটিয়াবুরুজে আসেননি রসক্ মহল। নবাবের অন্যান্য পরিবারবর্গের সঙ্গে পাঁচ বছরের বালক আসমন

জা মেটিয়াবুরুজে এসেছিলেন। তারপর থেকে এখানেই তাঁর বসবাস।

আসমন জার সাত পুত্র, তিন কন্যার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হলেন খুরসেদ মীর্জা। তাঁর জন্মস্থান মেটিয়াবুরুজ। তাঁর বাল্যজীবনও এখানে অতিবাহিত হয়, অন্তত ১৮৮৭ পর্যন্ত। তারপর মেটিয়াবুরুজের বিরাট নবাব পরিবারের বিপুল বিপর্যয়ে মীর্জা খুরসেদ কোথায় উৎক্ষিপ্ত হন, কোন্ ধারায় তাঁর জীবনচর্যা অগ্রসর হয় তার বিবরণ অপ্রাপ্য।

অনেক পরে যখন তাঁকে আসরে আসরে হারমোনিয়ম-শিল্পী হিসেবে দেখা যায়, তখন আর তিনি মেটিয়াবুরুজের বাসিন্দা নন। তখন ক'বছর ছিলেন বেলেঘাটার এক বাসায়। তারপর ন-দশ বছর জেলেটোলায়, মর্গের পেছনে এক বসতিতে। সে-সময় তাঁর পাশের ঘরে থাকতেন ওস্তাদ বাদল খাঁ এবং শ্রীজান বাঈয়ের পুত্র খাদেম হোসেন।

মীর্জা সাহেব জেলেটোলার পর জীবনের শেষ ছয়-সাত বছর তাঁতিবাগানে (জোড়া গির্জার কাছে) কাটিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে। তাঁতিবাগান লেন ও আঞ্জুমান রোডের কোণে সেই দোতলা মাঠকোঠায়। বয়স প্রায় ৬০ বছর হয়েছিল।

মীর্জা সাহেবের দুই বিবাহ। দ্বিতীয় পক্ষ নিঃসন্তান। প্রথম পক্ষে দুই কন্যা। কনিষ্ঠার সঙ্গে পরিণীত হন মুর্শিদাবাদের সুপরিচিত গায়ক মঞ্জু সাহেব। মুর্শিদাবাদ নবাব পরিবারের এক সন্তান মঞ্জু সাহেব।

এমনি কটি তথ্য ছাড়া মীর্জা সাহেবের ব্যক্তি-জীবনের অনেক কথাই অজ্ঞাত আছে। মেটিয়াবুরুজের পর কিভাবে তিনি জীবন-যাত্রা আরম্ভ করেন সে বৃত্তান্তও দুষ্প্রাপ্য। এমন কি তাঁর সঙ্গীতচর্চার সূচনা ও পরিণতি কি করে হয়, সে প্রসঙ্গও উদ্ধার করা যায়নি।

বেলেঘাটার এক নগণ্য বাসায় তাঁকে পাওয়া যায় কলকাতার এক অগ্রগণ্য হারমোনিয়ম-শিল্পীরূপে। আর অর্ধ-পেশাদার। মেটিয়াবুরুজের নবাব-পৌত্র বলে সামান্য সরকারী পেনসন পেতেন। ১৯১২ সাল পর্যন্ত তা ছিল মাসিক ২০ টাকা। তারপর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মাসে ৫০ টাকা হয় মৃত্যুকাল পর্যন্ত। সেই সঙ্গে ছাত্রদের তালিম দিয়ে কিছু কিছু উপার্জন করতেন। মুজরো পেতেন অনেক আসর থেকেই। তা হলেও দরিদ্রের মতনই তাঁর জীবন যাপন চলত। কারণ ঐসব আনুষঙ্গিক খরচ হত নিয়মিত। তেমন তেমন সন্ধ্যেবেলা, নগদের বদলে ঐ পেলেই বাজিয়ে আসতেন যত্রতত্র। নিজেকে এমন হীন করছেন দেখে কোন হিতার্থী হয়ত অনুযোগ করতেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের পুতুল—দুর্বলচিত্ত, সংযমে অপারগ। এমনিভাবে নবাব ওয়াজেদ আলীর এক পৌত্রকে হার-মোনিয়ম-শিল্পীরূপে প্রথম দেখা যায় বেলেঘাটায়।

বেলেঘাটার আগে কলকাতায় অথবা কোথাও কোথাও কাটিয়ে-ছিলেন মীর্জা সাহেব। তবে সে সব কথা জানা যায় না। যেমন জানা যায়নি তিনি হারমোনিয়ম শেখেন কার কাছে। এমন চালের বাজনা এমন মনোহারী শিল্পকর্ম কলাবতের তালিম ভিন্ন সচরাচর হয় না। কারণ এই প্রকার বিধিবদ্ধ অঙ্গুলিচালনার কায়দা শিক্ষা সাপেক্ষ।

মীর্জা সাহেবের কোন কোন শিষ্যের মতে, ওস্তাদজী হারমো-নিয়মের তালিম পেয়েছিলেন প্রসিদ্ধা চন্দ্রভাগা বাঈয়ের কাছে। কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ দুজনের মধ্যে কালের অসামঞ্জস্য। খুরসেদ মীর্জার জন্ম ১৮৮০ কিংবা ১৮৭৫ সালের আগে অসম্ভব। কারণ তাঁর পিতার জন্ম সন ১৮৫১। খুরসেদ মীর্জার হারমোনিয়ম শিক্ষা আরম্ভ সেই হিসাবে ১৮৯৫-এর আগে ধর্তব্য নয়। শেষোক্ত সময়ে চন্দ্রভাগার বয়স ৭০ উত্তীর্ণ। তাছাড়া খুরসেদ মীর্জা তাঁর কাছে শিখবেন কোথায়? তিনি তো লক্ষ্ণৌবাসিনী। আর ওয়াজেদ আলির পরিবারের সেকালে লক্ষ্ণৌতে

যাতায়াত নিষিদ্ধ ছিল, বিশেষ অনুমতি ভিন্ন। এইসব কারণে চন্দ্রভাগার কাছে মীর্জা সাহেবের তালিম পাওয়া বোধহয় সম্ভব নয়।

তবে গণপৎ রাওয়ের—হারমোনিয়মের সেই অপরূপ শিল্পী গণপৎ রাওয়ের গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন মীর্জা সাহেব। চন্দ্রভাগারই পুত্র গণপৎ রাও (ভাইয়া সাহেব)। আর ভাইয়া সাহেব হারমোনিয়ম তালিম তো জননীর কাছেই পেয়েছিলেন। চাবিতে চাবিতে অঙ্গুলি চালনার বিশিষ্ট সেইসব নিয়ম কায়দা। সেই চালের বাজনা। সেই বোল্ বানানা ঠুংরি অনুসারী হারমোনিয়ম বাদন। আর গণপৎ রাওয়ের শিষ্যরাও ওস্তাদের সেই ধারা অনুসরণ করতেন। গয়ার গোফুর খাঁ আর সোহনীজী। ইন্দোরের বসির খাঁ। কলকাতায় শ্যামলাল ক্ষেত্রী আর ইরসাদ।

গণপৎ রাও কলকাতায় এলেই তাঁর এই শিষ্যমণ্ডলীতে ঘেরা থাকতেন। আর তাঁর সঙ্গে মীর্জা সাহেবকেও দেখা যেত। দিনের পর দিন তিনি দেখতেন, শুনতেন গণপৎ রাওয়ের বাজনা আর বাজাবার কায়দা। অন্য সময়ে যখন ভাইয়া সাহেব থাকতেন না কলকাতায়, মীর্জা সাহেব শ্যামলাল ক্ষেত্রীর সঙ্গে মিলতেন খুব।

প্রায়ই শ্যামলালজীর ১০১ হ্যারিসন রোডের আসরে তিনি আসতেন, বাজাতেন। তাঁর বাজনার চালও ঠিক এঁদেরই মতন। এমনি রীতির মনোহারী ঠুংরি। এই কায়দার অঙ্গুলি চালনা। আর ডান হাতে বেলো করে বাম হাতে বাজানো মীর্জা সাহেবেরও—গণপৎ রাও, গোফুর, বসির খাঁর মতন। শ্যামলালজী, ইরসাদ, সোহনীজী বাঁ হাতে বাজাতেন না বটে। তবে তাঁদেরই মতন আঙুলে আর ঠুংরি অঙ্গে, মেজাজে, চালে, মীর্জা সাহেবের হারমোনিয়ম বাজনা।

তাঁদের সকলেরই বাজাবার ঢঙ একটি বিশিষ্ট প্রকারের। তা হল—তাল লয়ের চেয়ে সুরের দিকে, সূক্ষ্ম কারুকর্মের দিকে বেশি ঝোঁক।

এই বাঁধা সুরের পর্দায় যত মিহি কাজ করা সম্ভব তা দেখানো। সে সবই গণপৎ রাওয়ের এই গোষ্ঠীর চাল। আর শ্যামলাল ক্ষেত্রীকে কেন্দ্র করে কলকাতায় গণপৎ রাওয়ের এই অনুগামীদের সঙ্গেই মীর্জা সাহেবের সাঙ্গীতিক যোগাযোগ। গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর সঙ্গেও এই সূত্রে তাঁর অন্তরঙ্গতা আসরে আসরে। একযোগে গান বাজনাও। শুধু গিরিজাশঙ্কর কেন, গহর জান, মালকা জানও তো এই গোষ্ঠীর, গণপৎ রাওয়ের তাঁরাও শিষ্যা। সেই সূত্রে গহর, আগ্রাওয়ালী মালকা আসা-যাওয়া করতেন শ্যামলালজীর বৈঠকে। আর মীর্জা সাহেবও যেতেন।

তাছাড়াও গহর জান, মালকা জানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় মীর্জা সাহেবের। সেসব তাঁর যৌবনকালের কথা। তখন গহর আর মালকার বাড়িতেও তাঁর যাতায়াত ছিল। পান-ভোজন বিলাসী যেমন, তেমনি এসব দিকেও সঞ্চরণ করত তাঁর বিলাস-চিত্ত।

তখন তো এমন হাল হয়নি মীর্জা সাহেবের। চালচলন সাজ-পোশাক তখনো অনেকটা নবাব-পৌত্রের উপযুক্ত ছিল। আর যৌবনের সে লালিত্যময় স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শরীর। গোলাপী গৌরবর্ণ কান্তি। মুখ চোখ ভ্রূ-যুগলের নন্দন-ছাঁদ। অন্য সব গেলেও নবাবী চেহারা মীর্জার সেই যৌবনে ছিল বৈকি। আর গহর জান তার কদর করতেন। মীর্জার সঙ্গে সুখের সম্পর্ক ছিল তখন গহরের।

তারই একটি উত্তর-প্রসঙ্গ এই শেষের কথায় যোগ করে দেওয়া যায়।

স্বৈরিণী, যৌবন-বিলাসিনী গহর জান। আর রূপসী বাঈজী-বিলাসী রূপবান ভোগপরায়ণ তরুণ।

কিন্তু সে সব মধু বাসন্তী দিনের অনেক বছর পরের এই কথা। গহর জানের জীবনে অনেক নাটকীয় আবর্তন, বহু উপার্জন আর খ্যাতি-প্রতিপত্তির দিনের এক উপসংহার কাহিনী। বর্ণাঢ্য নানা দৃশ্য-শেষে দুজনেরই জীবন-নাট্যে এসময় পঞ্চমাঙ্ক শুরু হয়েছে।

এক আসরের হাজার টাকা মুজরো ছিল যে সেরা বাঈ সাহেবার, এখন তাঁর পসারহীন দুর্দিন। আয়নার সামনে বিগত কালের সে রূপতনু দেখার প্রত্যাশায় হয়ত আনমনা দাঁড়ান। আর বেদন-বিহ্বল হয়ে যান নতুন প্রতিবিম্ব দেখে। রমণীর দৃষ্টি দিয়ে আপন দেহলতা লক্ষ্য করেন। হয়ত হাহাকার করে ওঠে অন্তর। বাইরে থেকে যা অলক্ষ্য, পুরু কাঁচের সাহায্যে তা নিজের কাছে সুস্পষ্ট। বাহ্যত হয়ত অটুট-দর্শন শরীর। তবে পুরু চশমা ঘরে ব্যবহার না করলে অনেক দৃশ্যই অস্পষ্ট থেকে যায়।

এ আয়না মালকা জানের, তাঁর একটি গৃহ-কক্ষের। কলকাতা-জীবনের তখন শেষ পর্ব গহরের। এখান থেকে চিরবিদায় নিয়ে মহীশূর দরবারে চলে যাবার ঠিক আগের কথা। সেই বিপর্যস্ত দিনে অনেক কালের বান্ধবী গুরুবহিন মালকার অতিথি হয়ে আছেন। আগ্রাওয়ালীর সেই ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীটের উত্তরমুখী আস্তানায়।

সেদিনের ম্লান অপরাহ্ন বেলা। দোতলার এক অন্দর কামরায় বসে আছেন গহর জান। অন্যমনস্ক হয়ে কেশ পরিচর্যা করছেন। নিতান্ত অন্তঃপুরের বেশবাস।

এমন সময় হঠাৎ হাজির হলেন লতিফ, মালকা জানের সহোদর। সঙ্গে মীর্জা সাহেব আর তাঁর এক ছাত্র।

'কৌন্ কৌন্? অন্দরমে আ গিয়া।' বিরক্ত কণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠলেন ক্ষীণদৃষ্টি গহর জান, 'বে আদব্!'

লতিফ সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'জেরা দেখিয়ে ত কৌন্ আয়া আপ্‌কা পাশ?'

লতিফকে দেখে তাঁর আশ্বাসে ক্রোধ শান্ত হল গহর জানের। কৌতূহলী হয়ে পুরু কাঁচের চশমাটি শুভ্র খড়্গ-নাসিকায় তুলে ধরলেন।

সামনে ও কে দাঁড়িয়ে?

অনেক হিম ঋতু সে দেহ-সৌষ্ঠবের ওপরেও কাল-প্রবাহে বয়ে গেছে। বহুদিনের অদর্শন। তবু চিনেছেন গহর জান।

'মীর্জা!' সে আকুল স্বরে পুলকোচ্ছ্বাস না আর্তনাদ? নাকি দুয়েরই আশ্লেষ? আকস্মিকতার ভাবাবেগে উদ্বেল পরিস্থিতি। বাঈ সাহেবা আপ্লুতা হলেন।

'দেখো তুমহারা গউহরকি কেয়া হালাৎ হুয়ি।' কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে গেল অশ্রুধারায়।

জীর্ণ, মলিন মীর্জা সাহেব হতচকিত চেয়ে রইলেন। নির্বাক, অপলক দৃষ্টি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

সেই গউহর! গউহর জান!

হারমোনিয়মের পর্দায় পর্দায় ওঠানো কোন ঠুংরির সকরুণ রেশ যেন।

কতকালের হারানো সুরের ক্রন্দন···

আরেকজন শীর্ষস্থানীয়া

॥ কৃষ্ণভামিনী ॥

গায়িকার গুণই দোষ হয়ে উঠল। তাঁর গান নিয়েই হল বিপত্তি আর সেই বিপদের মধ্যেও কলাবতী চরিত্র ফুটে উঠল।...

পাড়ার অন্য লোকদের কোন আপত্তি ছিল না। বেশ ভাল ভাল গান তো শুনতে পাওয়া যায়। ক্ষতি কি!

কিন্তু একজন একেবারে খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন। এত রাত পর্যন্ত গান বরদাস্ত হল না তাঁর। ব্যাপারটি অসহ্য। আর তাও প্রায়ই। এ বন্ধ না করলেই নয়।

ভদ্রলোক অ্যাটর্নী—আইনের পেশা। তাই স্থির করলেন আইনের রাস্তাতেই নিস্তার পেতে হবে। রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত চলবে গান-বাজনা বাড়িটার সামনে, পথে লোক জমা হয়ে যায়। সব হাঁ করে শোনে—গান হচ্ছে ওপরের ঘরে। শুধু পাড়ার লোক নয়, অন্য জায়গা থেকেও লোক শুনতে আসে। এত লোক তো এ গলিতে থাকে না।

উত্তর কলকাতার শিমুলিয়া অঞ্চল। লোকে বলে—শিমলে। তারই একদিকে মহেন্দ্র গোস্বামী লেন। সেই গলির একখানি মাঝারি বাড়ি ঘটনাস্থল। কাল—বিশ শতকের প্রথম দিক।

সে পথটির দু পাশে তখন অনেকখানি খালি জায়গা দেখা যায় কয়েকটি মাত্র বাড়ি সে পাড়ায়। তার মধ্যে এই দুটি কাছাকাছি বাড়ি।

সেকালের কলকাতার জনবিরল গলি। সদর রাস্তার বেশি দূরে

নয়। তবু সন্ধ্যার পর থেকেই কেমন নিঝুম হয়ে আসে। আটটা-নটাতেই যেন নিষুতি রাত। বড় রাস্তার আওয়াজ সব কমে যায়। যেটুকু থাকে, পৌঁছয় না এখানে।

সেই নিস্তব্ধ রাতে গানের সুর ক্রমেই স্পষ্ট ভেসে আসে অ্যাটর্নী মশায়ের কাজের ঘরে। তাঁর একটি বাড়ির পরেই সেই গান-বাজনার বাড়ি। তার একদিকে আবার খানিকটা বাগান। ফাঁকা জায়গার হাওয়ায় গানের সুর যেন আরো ঢেউ তুলে দেয়।

ভদ্রলোকের বড় ক্ষতি হয় কাজকর্মের। মক্কেলরা আসেন। তাঁদের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমার জরুরি কথাবার্তা। নথিপত্র পড়াশুনা আর মুসাবিদা করার ব্যাপারে বড় অসুবিধে হতে থাকে। বিরক্তি আসে গানে। মেজাজ বিগড়ে যায়। এই শ্রেণীর মেয়েমানুষ থাকবে ভদ্রপাড়ার মধ্যে! প্রকাশ্যে গাইবে! আর শুধু তো গান নয়! গাইছে একটা ইয়ে মেয়েমানুষ! আর তাই শুনতে ভিড় হয়ে যাবে বাড়ির সামনে! এর একটা প্রতিকার হওয়া দরকার।

এবার তৎপর হলেন অ্যাটর্নী মশায়। সেদিন খোদ পুলিস দপ্তরে নালিশ করে এলেন। এ-অঞ্চলের থানা পাছে গাফিলতি করে, তাই গেলেন লালবাজারে। লিখিত বিবরণে মেয়েমানুষটির নাম-ধাম অপরাধের বিষয় সব জানালেন। আবেদন করলেন, এমন চরিত্রের রমণীর ভদ্রপাড়ায় বাস আর গানবাজনা যেন নিষিদ্ধ করেন আইন-শৃঙ্খলার কর্তৃপক্ষ।

ভদ্রলোক ক্রোধের বশে একটা কথা ভুলে গিয়েছিলেন। 'ওই শ্রেণীর মেয়েমানুষ' সেই গলিতেই তখন ছিল আরো ক'জন। তবে তারা গান গাইত না বটে। তাই তাদের নামে অ্যাটর্নীর কোন অভিযোগ ছিল না। তাঁর আসল আক্রোশ গানের বিরুদ্ধে। আর সেজন্যেই গায়িকার ব্যাপারে আপত্তি। সঙ্গীত সম্পর্কে তিনি বোধহয় সেই স্বভাবের, যাঁর বিষয়ে শেকস্পীয়রের সেই স্মরণীয় বাণী আছে—

The man that hath no music in himself,
Nor is not moved with concord of sweet sounds,
Is fit for treasons stratagems and spoils.
Let no such man be trusted.

লালবাজারে তখন পুলিসের এক বড়কর্তা ছিলেন হ্যালিডে সাহেব।

সে জবরদস্ত বৃটিশ আমলের কথা। ইংরেজ শাসনের অন্য দিকে যা হোক, বাহ্য আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে তেমন শৈথিল্য ছিল না। পুলিস অনেক সক্রিয় থাকত দুর্নীতি সম্পর্কে। কারণ পুলিসের ইংরেজ কর্তাদের দস্তুরমত দায়িত্ব-বোধ ছিল। অনেক সাহেব বড়-কর্তা রাতে বেরুতেন তেমন তেমন অঞ্চলে। স্বচক্ষে দেখতেন, সরেজমিনে তদন্ত করতেন। স্থানীয় থানার ওপর হুকুম জারি করে বসে থাকতেন না দপ্তরে।

হ্যালিডে সাহেব ছিলেন পুলিসের তেমনি এক কর্তব্যপরায়ণ বড়-কর্তা। তিনি আবার ছদ্মবেশে বেরুতেন। অপরিচিতভাবে গেলে সুবিধা হত অনুসন্ধানে। আর তিনি ছিলেন অতি সুশ্রী, সুপুরুষ। সুন্দর মুখ চোখ। নারীরূপেও তাঁকে চমৎকার মানাত। তাই স্ত্রী-ভূমিকাতেও মাঝে মাঝে দেখা দিতেন যথাস্থানে।

এ-ব্যাপারটিও হ্যালিডে সাহেব নিজে তদন্ত করলেন। অভিযুক্তের নাম-ঠিকানা নিয়ে বেরুলেন একদিন। মানিকতলা স্ট্রীট দিয়ে শিমলার সেই অঞ্চলে। মহেন্দ্র গোস্বামী লেনের নির্দিষ্ট বাড়িটিতে হাজির হলেন। কোন নারীর ছদ্মবেশে নয়, একেবারে পুলিসের নিজস্ব পোশাকে।

নীচের দরজা খোলা পেয়ে সাহেব দোতলায় উঠে এলেন। সামনে একটি বড় ঘর। সেখানে এক পরিচারিকা জিনিসপত্র পরিষ্কার করছিল। পুলিস সাহেবকে ঘরে ঢুকতে দেখে থরহরি কলেবরে মনিবানির কাছে ছুটল।

হ্যালিডে একদিকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন ঘরের দৃশ্য। মেঝের অনেকখানি জায়গা ভাল কার্পেটে ঢাকা। তার একপাশে হারমোনিয়ম, তানপুরা, বাঁয়া-তবলা। অন্যদিকে কটি মোটা মোটা তাকিয়া। ঘরের কোণে, দেয়ালের ধারে কয়েকটি নানা আকারের সৌখীন আসবাব। একদিকের দেয়ালে একটি নারীর রঙীন ছবি। বিপরীত দিকে প্রমাণ মাপের একটি দামী আয়না। চারদিকে দেয়ালে সেজ বাতির সরঞ্জাম। সমস্তই বেশ পরিচ্ছন্ন।

সাহেব কার্পেটের এক ধারে পা মুড়ে বসলেন।

খানিক পরে পরিচারিকার সঙ্গে প্রবেশ করলেন একজন মহিলা। হ্যালিডে বুঝতে পারলেন, তাঁর ছবিই দেয়ালে টাঙানো রয়েছে। হয়ত গৃহস্বামিনী।

তিনি যেমন পরিপাটি সজ্জিতা, তেমনি সপ্রতিভ। পুলিসের পোশাকে খাস সাহেবকে দেখেও তাঁর কোন ভাবান্তর হল না। যেন সাধারণ কোন অভ্যাগত, এমনিভাবে সাহেবকে নমস্কার করে মহিলাটি হারমোনিয়মের দিকে বসলেন।

তারপর জিজ্ঞাসু চোখে চাইলেন এদিকে। অর্থাৎ—আগন্তুক কে? তাঁর এখানে আসবার উদ্দেশ্য কি?

হ্যালিডে সাহেব বাংলা জানতেন। দস্তুরমত বই পড়ে শেখা ভাষা। তাছাড়া, কথ্য বাংলাও বুঝতে পারতেন ভাল। শুদ্ধ বলতেও পারতেন।

এখন গৃহকর্ত্রীকে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমি লালবাজার হইতে আসিতেছি। আপনার নামে রিপোর্ট আছে। তাই জানিবার জন্য আসিতে হইল।'

সাহেব আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন—ভয়ের কোন চিহ্ন ফুটল না লেডির মুখ-চোখে। বরং সুকণ্ঠে প্রশ্ন শুনলেন, 'বলুন কি জানতে চান?'

'আপনার নাম কি?'

'কেষ্টভামিনী দাসী।'

(তিনি কৃষ্ণভামিনী উচ্চারণ করতে পারতেন না বোধহয়। সেকালের প্রথায় রেকর্ডেও তিনি নিজ কণ্ঠে নাম ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সেখানেও 'কেষ্টভামিনী'। যেমন মূলতানের 'হৃদয় মাঝারে নাথ এস হে লুকায়ে রাখি' গানখানির শেষে বলেছেন—কেষ্টভামিনী। কিংবা গহরজানের মতন ইংরিজীতে নাম শুনিয়েছেন 'দিবানিশি তোর লাগি ঝরে মোর দুনয়ন' গানটির পরে—'মাই নেম ইজ কেষ্ট-ভামিনী।')

তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন।

'আপনার কি করিয়া চলে ?' হ্যালিডে জিজ্ঞেস করলেন।

'আজ্ঞে হুজুর।'

সাহেব ভাবলেন, লেডি হয়ত কথাটা ঠিক বুঝতে পারেননি। আসলে আসামী ভাববার সময় নিয়েছিলেন একটু।

লেডির হাতের, গলার দামী দামী অলঙ্কারের দিকে চেয়ে সাহেব আরো স্পষ্ট করে জানতে চাইলেন, 'আপনার কিসে উপার্জন হয় ?'

সপ্রতিভ কৃষ্ণভামিনী বললেন, 'গান গেয়ে হুজুর।'

'আই সী!' সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'শুধু গান করিয়া? গান কোথায় হয়? গানের 'ফিস্' কত ?'

গায়িকা সবিস্তারে জানালেন, 'সাহেব, কলকাতায় অনেক বড়-লোক আছেন যাঁরা বিস্তর খরচ করে গান শোনেন। তাঁদের বাড়িতে বিয়ে, অন্নপ্রাশন এমনি নানা উপলক্ষ্যে গানের আসর বসে। দুর্গাপূজার উৎসবেও গান শোনেন তাঁরা। বাগান-বাড়িতেও জলসা হয়। বেনিয়ান মুচ্ছুদ্দিরা পার্টি দেন সাহেব-সুবাদের আপ্যায়ন করতে। সেখানেও মুজরো পাই। আমি ইংরিজী গানও গাইতে পারি। এক এক বাড়ির জলসায় একশ দেড়শ টাকা পাই। কখনো আমার বাড়িতে আসর বসে। তাছাড়া, কলকাতার বাইরেও রাজা,

জমিদারদের দরবারে মাঝে মাঝে গাইতে যাই। সে সব জায়গায় মুজরো পাই আরো বেশি। আমার গানের গ্রামোফোন রেকর্ডও বিক্রি হয়।'

এসবই অবশ্য সঙ্গীত-গুণের আমদানি। কিন্তু তাঁর প্রাচুর্যের আরেকটি বাস্তব কারণ ছিল। তা প্রকাশ করা চলে না পুলিসের কর্তার কাছে।

হ্যালিডে তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'এই বাড়ি কি আপনার?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।'

এবার সাহেব বললেন, 'আমি আপনার একটি গান শুনিব।'

কৃষ্ণভামিনী সম্মতিতে মাথা নত করলেন। তারপর হারমোনিয়ম কাছে টেনে বললেন, 'ইংরিজী গান গাইব?'

'না, না। বাংলা গান।'

কৃষ্ণভামিনী আরম্ভ করলেন—কানাড়ার সেই চমৎকার গানখানি—

সাধিলাম কাঁদিলাম কত
বুঝালাম ধরে দুটি পায়ে
মিনতি করিলাম তায় রে।

ভাষা বুঝতে সাহেবের বিশেষ অসুবিধা হল না। আর অতি মিষ্ট কণ্ঠ তো গায়িকার। শুনতে তাঁর বড় ভাল লাগল। সেই করুণ সুরে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন প্রথম থেকেই। তার সহজ ভাষা যেমন তাঁর অন্তরে সাড়া জাগাল, তেমনি প্রাণস্পর্শী হল সুরের আবেদন। মন দিয়েই সাহেব শুনতে লাগলেন। আর ক্রমেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন সুরের মায়ায়। গানের কথা আর বেশিক্ষণ যেন অনুসরণ করতে পারলেন না। সে ইচ্ছাও হল না। মনের মধ্যে শুধু গুঞ্জরণ করতে লাগল যাদু সুরের রেশ। এক একটি কথা গানের দোলায় কানে ভেসে এল—

পায়ে ঠেলে চলে গেল
সে নিঠুর হায় রে॥

'গেল' কথাটিতে এমন আকুলতা ফুটে উঠল যে সেই ভাবেই শ্রোতার মন আচ্ছন্ন হয়ে রইল। (সাহেব জানতেন না, কি মনোজ্ঞ মিড় দিয়ে গায়িকা আবেদন জানিয়েছিলেন ওই কথায়। কৃষ্ণভামিনীর এই গানখানির গ্রামোফোন রেকর্ডে তার চিহ্ন ধরা আছে।) পরের এক একটি কথা কখনো ঝঙ্কার দিয়ে উঠল হৃদয়-তন্ত্রীতে। কখনো মনের গভীরে অ-লক্ষ্যে মিলিয়ে যেতে লাগল—'ভালবাসা যা ছিল'…'আঁখিজলে'….'সুখ পাখি উড়ে গেল'…

গান শেষ হতেই হ্যালিডে উঠে দাঁড়ালেন। আর কোন কথা বললেন না। শুধু ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন।

তারপর একদিন অ্যাটর্নী ভদ্রলোক সংবাদ নিতে গেলেন লালবাজারে।

কিন্তু এমন উত্তর পাবার তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

সাহেব তাঁকে জানিয়ে দিলেন—গায়িকাকে উচ্ছেদ করবার দরকার নেই। বললেন, 'শি সিঙ্‌স্ গুড মিউজিক।'…

অ্যাটর্নী ভদ্রলোক মুখ কালো করে চলে এলেন। সাহেবকে বোঝাবার আর কোন পথ পেলেন না গায়িকার বিরুদ্ধে…

সে কালের অতি বিখ্যাত গাযিকা কৃষ্ণভামিনী। শ্রেষ্ঠা বাঙালী গায়িকাদের মধ্যে শুধু একজন নন। তাবৎ প্রথম শ্রেণীর বাঈজীদেরও অন্যতমা তিনি।

সঙ্গীতগুণে শ্বেতাঙ্গিনীর প্রায় সমকক্ষা ছিলেন কৃষ্ণভামিনী। তখনকার বাঙালী বাঈজীদের মধ্যে গায়িকা হিসেবে শ্বেতাঙ্গিনীর নামই প্রথমে করা হত। বিশেষ খেয়াল ঠুংরি গানে। কলকাতায় পশ্চিমাঞ্চলের বাঈজীরাও মানতেন সেকথা। কৃষ্ণভামিনী সেই শ্বেতাঙ্গিনীর সমসাময়িক। দুজনে প্রায় সমবয়সিনীও। তাঁদের মধ্যে সাঙ্গীতিক যোগাযোগও ছিল। আর তা ওস্তাদ গৌরীশঙ্করের যোগসূত্রে। শ্বেতাঙ্গিনী গৌরীশঙ্করের ছাত্রী। ওস্তাদজী সারঙ্গ সঙ্গত করতেন তাঁর গানের আসরেও। তেমনি কৃষ্ণভামিনীর

সঙ্গেও গৌরীশঙ্কর সারঙ্গী থাকতেন। গায়িকার এক সঙ্গীতগুরুও তিনি।

কৃষ্ণভামিনী প্রথম সারির পশ্চিমা বাঈজীদের পাশে আসন নিতে পারতেন গানের আসরে। এ বিষয়ে শ্বেতাঙ্গিনীর প্রায় সমতুল্য মর্যাদা আর সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্ব তাঁরও ছিল।

বাঈজী অর্থাৎ একাধারে গায়িকা ও নর্তকী কৃষ্ণভামিনী। কথক নাচে সক্ষম ছিলেন বটে। কিন্তু তাঁর নৃত্যগুণ গৌণ। গানের জন্যেই তাঁর সত্যিকার প্রতিষ্ঠা আর প্রসিদ্ধি ছিল। আর নানা রীতির গায়িকা হিসেবেই কৃষ্ণভামিনীর নামডাক।

আসরের প্রয়োজন কিংবা ফরমায়েস মতন খেয়াল ঠুংরি টপ্পা কাজরী চৈতী লাউনি সব রকমই তিনি গাইতেন। কারণ তিনি পেশাদার বাঈজী। বিশেষ করে টপ্পা আর টপ্‌খেয়াল গানে কৃষ্ণ-ভামিনী ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয়া, মানদাসুন্দরীরই মতন।

সঙ্গীতরসিক অমিয়নাথ সান্যালের সেই বিবৃতিটি এখানেও স্মরণ করা যায়—'উত্তম উত্তম টপ্‌খেয়ালও শুনেছি বাংলার গায়িকাদের মুখে। এঁদের মধ্যে মানদাসুন্দরী ও কৃষ্ণভামিনী মহোদয়াগণকেই শীর্ষস্থানীয়া মনে করতে বাধ্য হয়েছি।'

মানদাসুন্দরীর তুল্য গ্রামোফোন রেকর্ডের জগতেও সুপ্রসিদ্ধা ছিলেন কৃষ্ণভামিনী। আর সেক্ষেত্রেও এক শ্রেষ্ঠা। মানদারই সমসাময়িক তিনি। তবে কৃষ্ণভামিনী হয়ত বয়োকনিষ্ঠা, যদিও মানদার আগে পরলোকগতা হয়েছিলেন।

সে-যুগে মানদাসুন্দরী ভিন্ন আর কোন গায়িকার এত বেশি রেকর্ড হয়নি—এবং লালচাঁদ বড়াল ভিন্ন অন্য কোন গায়কেরও নয়।

কীর্তন-গায়িকা পান্নাময়ীর রেকর্ডের সংখ্যাও এখানে ধর্তব্য। তিনিও গ্রামোফোন জগতে উচ্চস্থানের অধিকারিণী। সেযুগে সর্বাধিক সংখ্যক রেকর্ডের জন্যে পান্নাময়ীর নামও স্মরণীয় হয়ে আছে। কারণ তিনি অন্তত ৪৫খানি গান রেকর্ড করেছিলেন। তবে সে

সমস্তই কীর্তন গান, যে বিষয়ে তাঁর খ্যাতি হয়ত সবচেয়ে বেশি। সেজন্য রাগসঙ্গীতের প্রসঙ্গে পান্নাময়ীর রেকর্ড পর্যালোচনা করা হল না। খেয়াল বা টপ্পা অঙ্গে গান করেননি তিনি।

রেকর্ড সঙ্গীতের প্রসঙ্গেও কৃষ্ণভামিনীকে একজন শীর্ষস্থানীয়া বলা যায়। কারণ তাঁর রেকর্ড করা গানের সংখ্যা ৪৭টি। সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে, গায়নশিল্পীর অত্যন্ত জনপ্রিয়তা না থাকলে এত গান রেকর্ড করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হত। কৃষ্ণভামিনীর গানের চাহিদা বোঝা যায় তাঁর রেকর্ডের সংখ্যা থেকে।

কৃষ্ণভামিনীর গ্রামোফোন রেকর্ডের একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল। সেকালের 'রেকর্ড সঙ্গীত' যতগুলি খণ্ড পাওয়া গেছে, আর অন্যান্য সূত্রে জানা যায়, সেই হিসাবে এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে এ বিবরণের অতিরিক্ত তাঁর আরো রেকর্ড থাকাও অসম্ভব নয়। কারণ তালিকা সম্পূর্ণ করবার কোন নির্ভরযোগ্য নথি-পত্র নেই। গ্রামোফোন সংস্থা থেকে তাবৎ রেকর্ড গীতাবলীর বিবরণীও প্রকাশিত হয়নি প্রচার-পুস্তিকায়।

যতদূর উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে কৃষ্ণভামিনী গ্রামোফোন ও জেনোফোনে ৪৭টি গান গেয়েছিলেন। সেকালের রেকর্ড জগতে রীতিমত গৌরবের রেকর্ড।

তাঁর এই গানগুলির প্রায় সমস্তই রাগনির্ভর। বাংলায় টপ্-খেয়াল, খেয়াল ও টপ্পা অঙ্গের। শুধু ৬খানি গান রবীন্দ্রনাথের, যদিও সেসব সঠিক 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' নয়। কারণ, সেকালের নানা গায়ক-গায়িকার মতন কৃষ্ণভামিনীও নিজস্ব সুরে গেয়েছেন রবীন্দ্র-নাথের গান। রবীন্দ্র-সংযোজিত সুর অনুসরণ করেননি।

কৃষ্ণভামিনীর রেকর্ড হয় এই গানগুলি—

(১) পারে কি ভুলিতে কভু (সিন্ধুকাফি), (২) মনের মিলে হয় যদি প্রেম (ভীমপলশ্রী), (৩) মনে করি ভুলি ভুলি (সাহানা-কানাড়া), (৪) মন রাখা দেখা দিতে (খাম্বাজ), (৫) জগৎ

দেখ না চেয়ে (ভৈরবী), (৬) সাধিলাম কাঁদিলাম কত (কানাড়া), (৭) যে দেয় যাতনা প্রাণে (হাম্বির), (৮) আমারে গোপন করে (গৌরী), (৯) বেসেছি ভাল, বাসিব ভাল (ভৈরবী), (১০) সঁপেছি জনমের মতন (কেদারা), (১১) প্রেম করে প্রাণ সখি (বেহাগ), (১২) বড় ভালবাসি চারু রূপরাশি (ভৈরবী), (১৩) আমার মনোবেদনা সই (দেশ), (১৪) যামিনী যে যায় হায় (ভৈরবী), (১৫) হর হর শঙ্কর শশাঙ্ক-শেখর (ইমন-ভূপালী), (১৬) তাই কি মনে করে মান ভরে (পূরবী), (১৭) তুই মা তারা দুঃখ হরা (সিন্ধু), (১৮) কে তুমি এসেছ কাছে (সিন্ধু খাম্বাজ), (১৯) করেছ যে নূতন প্রেম (আশাবরী), (২০) তুমি আমার সোনার পাখি আমি তোমার পিঞ্জরা (পিলু), (২১) দিবা-নিশি তোর লাগি ঝরে মোর দু নয়ন (বাগেশ্রী), (২২) হৃদয় মাঝারে নাথ এস হে লুকায়ে রাখি (মূলতান), (২৩) হায় হায় আমি বুঝিতে না পারি, (২৪) ভালবাসি বলে কি রে, (২৫) গাছের ফুলে শোভে যেমন, (২৬) আনন্দময়ী হয়ে গো মা, (ভৈরবী), (২৭) বৃথা দিন গেল হে হরি (তোড়ি), (২৮) (আমি) না জেনে পরশ ভ্রমে পাষাণে প্রাণ সঁপেছি (দেশ), (২৯) রূপেরি সাগরে আঁখি ডুবিল তোরি (সিন্ধু-ভৈরবী), (৩০) আমার প্রেমের পাগল কই (পূরবী), (৩১) একা একা এতদিন কেটে গেল (সোহিনী), (৩২) মাকে কে জানে (মালকোশ), (৩৩) মন অলসে অবশে বল কালী (পূরবী), (৩৪) সারাটি জীবন কাঁদাবে এমন (বেহাগ পূরবী), (৩৫) মন যে নিল সে তো আর ফিরে দিল না (হাম্বির মিশ্র), (৩৬) প্রাণ তোমার সুখের পথে কাঁটা হব না, (৩৭) আসি বলে চলে গেল কই সই আসিল না, (৩৮) মরি হল একি দায় (বেহাগ), (৩৯) হেরে তোরে আমার মনোদুঃখ দূরে গেল (হাম্বির), (৪০) আসি আসি বলে কেন প্রাণে ব্যথা দাও (মূলতান), (৪১) যাও যাও ফিরে চাও (ভৈরবী), (৪২) জীবনে আমার যত আনন্দ

পেয়েছি দিবস রাতি, (৪৩) স্বপন যদি ভাঙ্গিলে রজনী প্রভাতে, (৪৪) দেখো সখা ভুল করে ভালবেস না, (৪৫) ও যে মানে না মানা, (৪৬) আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে, (৪৭) যদি তারে নাই চিনি গো।

এর মধ্যে শেষের ৮খানি গান রবীন্দ্রনাথের। সুতরাং সে যুগের রেকর্ডে কৃষ্ণভামিনীও সর্বাধিক 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' গেয়েছিলেন।

এই তালিকার ৩৯, ৪০, ৪১ সংখ্যক গান তিনটি জেনোফোন সংস্থার, অবশিষ্ট ৪৪খানি গান গ্রামোফোনের।

সেকালের তিন মিনিট গানের এই সমস্ত রেকর্ড। কিন্তু সেটুকুর মধ্যেও গায়িকার সঙ্গীতপ্রতিভা আর কুশলী কণ্ঠের পরিচয় মূর্ত হয়ে আছে। তাঁর রেকর্ডগুলি মানদাসুন্দরীরই ধরনের। আর প্রায় সেই মানেরই গান। কৃষ্ণভামিনীর এই রেকর্ড সঙ্গীতের বেশির ভাগ টপ্‌খেয়াল অঙ্গের। অথচ রাগসঙ্গীতের মধ্যেই কাব্য-সঙ্গীতের আবেদনে প্রাণবন্ত।

হৃদয়ের দরদে গাওয়া কৃষ্ণভামিনীরও এক-একটি মর্মস্পর্শী গান। যেমন—'আমারে গোপন করে'। চমৎকার বন্দেশের এই গানখানি তিনি গেয়েছেন গৌরী-তে। গানের মধ্যে রীতিমত কলাবতী চালের তানও আছে। তাঁর অনেক গানে যেমন কথার তান দেখা যায়, তেমনি এখানেও। অথচ সেই সঙ্গে ফুটে উঠেছে কাব্যগীতির মাধুর্য। কথায় মেলানো এমনি তান বাংলা টপ্‌খেয়াল গানে সুন্দর মানিয়ে যায়। মানদাসুন্দরীর মতন এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন কৃষ্ণভামিনীও।

তাঁর একটি গান আছে মূলতানে—

হৃদয় মাঝারে নাথ
এস হে লুকায়ে রাখি।
আর কেউ নাহি দেখে
আমি যেমন তোমায় দেখি

এই গানখানিও অতি হৃদয়গ্রাহীভাবে গাওয়া। অথচ মূলতানের রাগরূপও গায়িকা চমৎকার ফুটিয়েছেন। আর সেই সঙ্গে রীতিমত তান। বাংলা গানেও তা বেশ মানানো। সেই কলাকুশলী তানের জন্যে গানের উপভোগে কোন বাধা দেখা যায় না—এইখানেই গায়িকার কৃতিত্ব।

কৃষ্ণভামিনীর একখানি গান আছে বাগেশ্রীতে—

দিবানিশি তোর লাগি ঝরে মোর দু নয়ন…

এ গানেও তিনি সুরের কাজ করেছেন নিপুণ ভাবে। তারা গ্রামেও কণ্ঠ রীতিমত সুরেলা, কোন স্বরবিকৃতি নেই। তাঁর এই গানে বাগেশ্রীর সুরবিস্তার যেমন যথাযথ, তেমনি উপভোগ্য সুমিষ্ট কণ্ঠের সুষমা। তিনি গহর জানের মতন এই রেকর্ডে ইংরেজীতে নিজের নাম ঘোষণা করেছেন—মাই নেম ইজ কেষ্টভামিনী।

গায়িকার প্রত্যেক রেকর্ডের নাম না করেও বলা যায়, তাঁর গানের বেশ উন্নত মান ছিল। রেকর্ডগুলি থেকে ধারণা করা যায়, টপ্‌খেয়াল গানে তিনি বাস্তবিকই ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয়া।

কৃষ্ণভামিনীর এই বাংলা গানের রেকর্ডগুলি থেকে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। তাঁর বাংলা উচ্চারণ যেন একটু হিন্দুস্থানী ধরনের। অর্থাৎ কোন উত্তরভারতীয়ের বাংলা উচ্চারণের মতন।

তাঁর বাংলা গানে এই হিন্দুস্থানী টানের কারণ মনে হয়—আসলে তিনি ছিলেন রাগসঙ্গীতের গায়িকা। হিন্দী ভাষাতেই কৃষ্ণভামিনী গানের চর্চা করেছেন অপর্যাপ্ত। বছরের পর বছর হিন্দুস্থানী কলাবতদের কাছে তালিম নিয়েছেন। দস্তুরমত শিখেছেন খেয়াল, টপ্পা ঠুংরি। সেই সঙ্গে যুক্তপ্রদেশের গান কাজরী, চৈতী, লাউনী ইত্যাদি। তারপর তাঁর আসরও বেশির ভাগই হত হিন্দী ভাষার গানে। এক শ্রেষ্ঠা পেশাদার গায়িকা হিসেবে তাঁর অন্তরঙ্গতাও ছিল কলকাতা নিবাসী পশ্চিমাঞ্চলের কলাবতদের সঙ্গে। হয়ত এইসব কারণে তাঁর

উচ্চারণ হিন্দী-ঘেঁষা হয়ে যায়। নাম না জেনে তাঁর অনেক রেকর্ডের গান শুনলে মনে হয়—ভাল বাংলা শিখে গাইছেন কোন পশ্চিমের গায়িকা।

৪৭খানি বাংলা গান রেকর্ড করলেও কৃষ্ণভামিনীর সঙ্গীত-জীবনের তা আংশিক পরিচয়। খেয়াল টপ্পা ঠুংরীর কলাবতী গায়িকা-রূপেই তিনি সঙ্গীতসমাজে বেশি প্রসিদ্ধা ছিলেন। আসরেও তাঁকে বাংলার চেয়ে অনেক বেশি গাইতে হত হিন্দী গান। খেয়াল টপ্পা ঠুংরি থেকে কাজরী চৈতী লাউনী পর্যন্ত।

সেকালে পেশাদার গায়িকাদের সম্পর্কে তাই ছিল রেওয়াজ। শুধু খেয়াল কিংবা খেয়াল আর ঠুংরি গেয়ে সেযুগের সঙ্গীতজগতে কলাবতীদের প্রতিষ্ঠা হত না। দস্তুর হিসেবে বাঙ্গালী বা অবাঙালী যাঁরাই কৃষ্ণভামিনীকে মুজরো দিতেন, তাঁর আসর করতেন, তাঁরা শুনতে চাইতেন রাগসঙ্গীত, শ্বেতাঙ্গিনীর মতন। আর পশ্চিমাঞ্চলের বাঈজীদের সামনে শ্বেতাঙ্গিনীর মতন দাঁড়াতে পারতেন, সমান দাপটে আসর করতেন কৃষ্ণভামিনীও। তাঁরও সেইরকম ব্যক্তিত্বও ছিল।

কলকাতার পেশাদার সঙ্গীতজগতে পশ্চিমাঞ্চলের বাঈদেরই মতন অবস্থান করতেন তিনি। সেই ধরনের প্রভাব প্রতিপত্তি দেখা যায় কৃষ্ণভামিনীর।

বাঈজীদের যেমন রেওয়াজ বাইবেকার কোন নতুন গায়ক বাদক এ শহরে এলে প্রথমে বাঈজীগৃহে আশ্রয় নেন। সেই বাঈজী তখন নবাগতকে পরিচিত করে দেন কোন কোন সঙ্গীত-প্রেমী পৃষ্ঠ-পোষকের সঙ্গে। নতুন গায়ক বাদক তারপর তেমনি কোন ব্যক্তির আসরে গুনপনা দেখাবার সুযোগ পান। আর কৃতিত্ব দেখালে যে স্বীকৃতি লাভ করেন তার ফলেই প্রতিষ্ঠা পেতে থাকেন পেশাদার হিসেবে।

নতুন গুণীরা তখন কলকাতায় পশ্চিমা বাঈদের মতন কোন

কোন বাঙালী বাঈজীর বাড়িতেও উঠতেন। তাঁর সহায়তায় পরিচিত হতেন এখানকার সঙ্গীতসমাজে। অনেক সময় কৃষ্ণভামিনীও এমনি মধ্যস্থতা করেছেন।

একবার পশ্চিম থেকে এক কলাবত এসেছেন কলকাতায়। কৃষ্ণভামিনীর শিমলার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে সে গায়ক শুনেছিলেন মাত্র। গুণপনার সাক্ষাৎ পরিচয় পাননি।

কৃষ্ণভামিনী তাঁকে একতলার একটি ঘরে আশ্রয় দিলেন। আর ভদ্রতা করে খাতির জানিয়ে বললেন, 'আপনার যতদিন খুশি থাকুন আরাম করে। রইস লোকদের সঙ্গে জানা চেনা হোক। দু-চার মহ্ফিল করুন। নিজের বাড়ির মতন ভাববেন এখানে। এই ঘরে যখন খুশি রিয়াজ করবেন। গাইবেন। অমি শুনব ওপর থেকে।'

ওস্তাদজী কলকাতায় নতুন এসেছেন। ভাবলেন, এ গায়িকার বয়স তো বেশি নয়। একটু আপ্যায়িত করে দেওয়া যাক কিছু অপ্রচলিত জিনিস দেবার কথা বলে।

একটা কূট রাগের নাম করে বললেন, 'বাঈসাহেবা, এই রাগের আচ্ছা খানদানী চীজ আমার কাছে আছে। দরকার হলে ফরমায়েস করবেন, আপনাকে দিয়ে যাব।'

কৃষ্ণভামিনী তখনি বললেন. 'আচ্ছা, এইরকম হবে কি?' বলে, বসে সে রাগের একখানি গান শুনিয়ে দিলেন কিছু তান-কর্তব সমেত।

বেশিক্ষণ গাইতে হল না। গানের বন্দেশ আর পাল্টার ধরন-ধারণ দেখেই ওস্তাদজীর আক্কেল হয়ে গেল।

গান শেষ করে কৃষ্ণভামিনী নিরীহ মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু গোলমাল হয়নি তো? সব ঠিক আছে?'

শুষ্ক মুখে ওস্তাদ বলে উঠলেন, 'সব ঠিক হ্যায়। কুছু ভি গুলমাল নেহি।'

তাঁর কিছুদিন থাকবার দরকার ছিল কৃষ্ণভামিনীর অতিথি হয়ে।

এ বাঈজীর অনেক মুজরো হয়, শুনেছিলেন। অনেক আশা করে ছিলেন এখানে। কিন্তু কেমন যেন ছোট হয়ে গেলেন। এই তরুণী গায়িকার এমন গান শুনে দাপট দেখে, মুষড়ে পড়লেন যেন। পরের দিনই ওস্তাদজী তল্পিতল্পা নিয়ে এ আস্তানা ছেড়ে চলে গেলেন।

পশ্চিমের সেই কলাবত তো জানতেন না, এই বাঙালী বাঈজীর সঙ্গীতজীবনের কথা। কি মানের আর কি দাপটে তিনি গেয়ে থাকেন আসরে। কত অল্প বয়স থেকে তিনি রীতিমত তালিম নিয়েছেন। কে কে তাঁর ওস্তাদ। কি অসাধারণ রিয়াজী তিনি। প্রত্যহ শেষ রাত থেকে তাঁর রিয়াজ চলে কতক্ষণ! আসরে জলসায় কি তাঁর নামডাক! এসব কথা জানলে আর তাঁকে একটা চীজ দেবার কথা মুখে আনতেন না।……

কৃষ্ণভামিনীর প্রধান সঙ্গীতগুরু দুজন। ওস্তাদ গৌরীশঙ্কর মিশ্র এবং (লছমী ওস্তাদের পুত্র) হরিদাস মিশ্র। দুজনেই বারাণসীর দুটি বিখ্যাত ঘরানার গুণী। প্রতিভাবান গায়ক হরিদাস অকালে পরলোকগত হন।

তাঁর কিছু পরিচয় দেওয়া হয়েছে 'ভারতের সঙ্গীতগুণী'র প্রথম খণ্ডে, 'ওস্তাদের ওস্তাদ' নামে অধ্যায়টিতে। আর গৌরীশঙ্করের বিবরণ 'সুরের সঙ্গতীয়া সারঙ্গী'তে সবিস্তারে দেওয়া আছে। তাঁরা দুজন ভিন্ন কালীশঙ্কর মিশ্রের তালিমও পেয়েছিলেন কৃষ্ণভামিনী।

এই তিন ওস্তাদের কাছে তিনি রীতিমতভাবে শিখেছিলেন। কিন্তু সংগ্রহ আরো অনেক সূত্রে করতেন, যেমন সব গায়ক গায়িকাই করে থাকেন অল্পবিস্তর।

এমনি সব শিক্ষায় ও পরিবেশে কৃষ্ণভামিনীর সঙ্গীতজীবন গঠিত হয়। দীর্ঘকালের চর্চায় সাধনায় তিনি হন কলাবতী। সঙ্গীতই হয় তাঁর জীবনের অবলম্বন আর বৃত্তি।

সেই মহেন্দ্র গোস্বামী লেনের যে প্রতিবেশীরা শেষরাতে জেগে উঠতেন তাঁরা সেসময় কৃষ্ণভামিনীর নিত্য সঙ্গীতচর্চা শুনতেন। অতি

প্রত্যূষে কয়েক ঘণ্টা তিনি রিয়াজ করতেন বরাবর। সঙ্গীতজীবনে রীতিমত প্রতিষ্ঠা পাবার পরেও।

গানবাজনায় কৃষ্ণভামিনীর স্বাভাবিক পটুত্ব ছিল। শুধু যে অতরকম রীতির গান গাইতেন, তা নয়। নারী শিল্পীদের পক্ষে যে বাজনায় দৃষ্টান্ত সব চেয়ে কম, প্রায় ব্যতিক্রমই বলা যায়, সেই তবলা তিনি বাজাতেন খুব ভাল। আসরে অবশ্য বাজাতেন না। নিজের ঘরেই এই তালবাদ্যের চর্চা রাখতেন। তবলায় তাঁর হাত ছিল রীতিমত তৈরি।

ওস্তাদ তবলচী রেখে দস্তুরমত তবলায় তালিম নেন এই বাঙালী বাঈজী। তবলা সাধতেনও নিয়মিত। ভোর থেকে যেমন গানের রিয়াজ চলত, তেমনি দুপুরটা প্রায়ই তবলা চর্চায় কাটাতেন। নিয়মিত তবলা সাধতেন তাল লয়ে আরো সিদ্ধ হবার জন্যে। এবং তা হয়েও ছিলেন।

শোনা যায় কলকাতায় 'স্কেল চেঞ্জিং' হারমোনিরম প্রথম তৈরি করেন সুরেন্দ্রনাথ দাস। ৮৯ হ্যারিসন রোডে শ্যামলাল ক্ষেত্রীর বাড়ির কাছেই সুরেন্দ্রনাথের সেই হারমোনিয়মের দোকান ছিল। সেখানে নতুন রকমের এই হারমোনিয়ম প্রথম তৈরি হতেই কিনলেন কৃষ্ণভামিনী। সে হল ১৯১২-১৩ সালের কথা। সুরেন্দ্রনাথ নিজেও ছিলেন ভাল হারমোনিয়ম বাদক। গণপৎ রাওয়ের শিষ্য বসির খাঁর কাছে হারমোনিয়ম শিখতেন। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কৃষ্ণভামিনীর যোগাযোগ ছিল হারমোনিয়মের সূত্রে। আলাদা যন্ত্র হিসেবে কৃষ্ণভামিনীও হারমোনিয়মের চর্চা সেসময় করতেন।

গানবাজনার আরো সখ ছিল কৃষ্ণভামিনীর। সঙ্গীতের নানা বিষয়ে কৌতূহলী তাঁর মন। একবার একটি বাজনার দোকানে দেখলেন কর্ণেট বাঁশি। দেখে বড় পছন্দ হল। তখনি কিনে নিয়ে এলেন একটি কর্ণেট। শুধু কেনা নয়, শিখতে আরম্ভ করে দিলেন। আর কিছুদিনের মধ্যেই বেশ বাজাতে লাগলেন কর্ণেট।

সঙ্গীতে এমনি সহজাত দক্ষতা কৃষ্ণভামিনীর ছিল।

তাঁর কথা আরো কিছু কিছু পাওয়া যায় বিখ্যাত গায়ক কালিপদ পাঠকের সূত্রে। পরবর্তীকালের সুপরিচিত টপ্পাগুণী পাঠক মহাশয় প্রথম জীবনে কৃষ্ণভামিনীর কাছে গান শিখেছিলেন। বিশেষ টপ্-খেয়াল আর টপ্পা। তিনি তখন নিতান্তই তরুণ। আর কৃষ্ণভামিনী তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন।

তাঁর গায়িকা জীবনের প্রথম থেকেই বাংলা গানের দিকে বেশি ঝোঁক ছিল। কৃষ্ণভামিনী তাঁকে শেখাতেন বেশির ভাগ বাংলা টপ্পা আর টপ্‌খেয়াল ধরনের গান। তাঁর এই রীতির বাংলা গান চর্চার সঙ্গে বেশ মিলে যায় কৃষ্ণভামিনীর দেওয়া শিক্ষা। তাঁর সঙ্গে কালিপদবাবুর দীর্ঘদিনের যোগাযোগ ছিল।

তিনি খুব বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন কৃষ্ণভামিনীর। আর মহেন্দ্র গোস্বামী লেনের বাড়িতে চাক্ষুষ করেছিলেন সেই বিখ্যাত গায়িকার ধনসম্পদ।

এই গায়িকা যে কত ধনী হয়েছিলেন, তা বাইরে থেকে ধারণা করা যেত না। কিন্তু তার পরিচয় পেয়েছিলেন তাঁর প্রিয় ছাত্রটি। কৃষ্ণভামিনী নিজেই সেই গোপন ঐশ্বর্যসম্ভার একদিন দেখিয়েছিলেন। সেকালের ভারি ভারি সোনার গহনা শুধু নয়। অত্যন্ত দামী হীরে মুক্তার অলঙ্কার পর্যন্ত যথেষ্টই সঞ্চয় করেছিলেন কৃষ্ণভামিনী। সেই গুপ্ত সিন্দুক মুক্ত করে তিনি সেদিন কালিপদ পাঠককে দেখান। তরুণ শিষ্যটি সেসব গল্প শোনাতেন নিজের প্রবীণ বয়সে। এখন সেসব কথা থাক।

কৃষ্ণভামিনী তাঁকে যেসব বাংলা গান শেখান তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গানও ছিল। কিন্তু সেকালে অনেক গায়ক গায়িকা যেমন রবীন্দ্রনাথের গান আপন আপন ইচ্ছামতন সুরে ও ভঙ্গীতে গাইতেন এমনকি রেকর্ড পর্যন্ত করতেন—যেমন গহর জান, মানদাসুন্দরী, পূর্ণকুমারী, ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী, কে মল্লিক প্রভৃতি—কৃষ্ণভামিনীও তেমনি একজন।

তিনিও রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন, কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে ও গায়কীতে আদৌ নয়। রবীন্দ্রনাথের গানও তিনি তখনকার প্রচলিত টপ্‌খেয়ালে গাইতেন। কৃষ্ণভামিনীর বাংলা গান গাইবারও ছিল ওই ধরন। বিশেষ কর টপ্‌খেয়াল আর টপ্পা অঙ্গে তিনি পারদর্শিনী ছিলেন। আর বাংলা গান যখন গাইতেন, টপ্পার অল্পবিস্তর তান দিতেন, গানের ভাষার সঙ্গে মিলিয়ে। টপ্পার ধরনে কথার তান।

তেমনিভাবে রবীন্দ্রনাথের গানও তিনি কালিপদবাবুকে শিখিয়ে ছিলেন টপ্‌খেয়াল রীতিতে। তারই ফলস্বরূপ অনেক পরবর্তীকালের একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়।

একটি গানের আসরের বিচিত্র আর কৌতুককর স্মৃতিও সেটি। কালিপদ পাঠক যে কৃষ্ণভামিনীর কাছে রবীন্দ্রনাথের গান শেখেন তারই সম্পর্কিত বটে। কিন্তু বহু বছর পরের ঘটনা।

পাঠক মশায়ের তখন পরিণত বয়স। আর বাংলা গানের জগতে তিনি সে সময় সুপ্রতিষ্ঠিত। বাংলার এক নেতৃস্থানীয় গায়ক তাঁকে বলা যায়। সেই সুবাদেই তিনি আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন একটি বিশিষ্ট উৎসবে। রবীন্দ্রনাথের সামনেই সভাস্থলে পাঠক মহাশয়ের সেদিন গান হবে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে তখন গোধূলি অধ্যায়। ···সালের কথা। তিনি মেদিনীপুরে এসেছেন, বিদ্যাসাগরের স্মরণ উৎসবে ভাষণ দিতে। সেই উপলক্ষ্যেই কালিপদ পাঠকেরও গানের ব্যবস্থা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সভায় উপস্থিত। তাই পাঠক মশায় স্থির করলেন তাঁর গান শোনাবেন যথাযথ। সেই প্রথম জীবনে কৃষ্ণ-ভামিনীর কাছে শেখা একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত তিনি গাইলেন—'ও যে মানে না মানা।' গায়িকার কাছে যেমন টপ্‌খেয়াল ধরনে শিখে-ছিলেন, সেই ভাবেই শোনালেন কবিকে। টপ্পাতেই কিছু কিছু তানকৃতিও দেখালেন।

গান শুনে রবীন্দ্রনাথ একটু বিশেষভাবে বললেন, 'ভাষাটা যেন আমারই মনে হচ্ছে!'

পাঠক মশায় সরল মানুষ। তিনি ভাবলেন গানখানি শুনে রবীন্দ্রনাথের মনে পড়েছে যে এটি তাঁরই স্বরচিত। আসলে কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছিলেন—গানের ভাষাটি মাত্র তাঁর। সুর, গায়কী সবই পৃথক।....

কালিপদ পাঠকের সূত্রে কৃষ্ণভামিনীর আরো কথা জানা যায়। গায়িকা হিসেবে তাঁর সম্পর্কে উচ্চ ধারণা ছিল পাঠক মশায়ের। কিন্তু এটি তাঁর সাঙ্গীতিক নয়, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। কৃষ্ণভামিনীর শারীরিক বলশালিতার কথা। তাঁর তবলা তুল্য বাদনের এও এক দুর্লভ ব্যতিক্রম যেন।

সেই সুমিষ্টকণ্ঠী গায়িকার দেহের মধ্যে একটি পুরুষালী ভাবও ছিল। দেহে যেমন শক্তি, মনেও তেমনি অকুতোভয় তিনি।

একবার একাকিনী দুজন গুণ্ডার আক্রমণ কিভাবে প্রতিহত করেন, সে গল্পও শোনাতেন পাঠক মশায়। কৃষ্ণভামিনীরও গহর জানের মতন নিজস্ব বগি গাড়ি ছিল। দুটি শাদা ঘোড়ায় টানা সেই ল্যাণ্ডো তাঁর। তবে তিনি তা নিজেই চালাতেন না গহরের মতন। কোচম্যানই হাঁকাত।

এক রাত্রে সেই গাড়িতে তিনি ফিরছেন কোন আসরে গান গেয়ে। গাড়ির মধ্যে তিনি একা। নির্জন রাত। মার্কাস স্কোয়ারের কাছে অর্থাৎ কুখ্যাত কলাবাগান বস্তির অঞ্চলে তখন তাঁর গাড়ি এসে পড়েছে। এমন সময় দুদিকের দরজায় চড়াও হল দুজন গুণ্ডা। আরোহিনীর অঙ্গে দামী দামী গহনার দিকে তাদের দৃষ্টি পড়েছিল। কিন্তু গুণ্ডারা ধারণা করতে পারেনি সেই নারীর শৌর্য আর সাহস কতখানি হতে পারে। কৃষ্ণভামিনীর বলিষ্ঠ হাতের ঘায়ে অচিরেই দুজনে দুদিকের

রাস্তায় ধরাশায়ী হল। আর তাঁর গাড়ি চলতে লাগল বাড়ির দিকে।

অন্য সূত্রে জানা যায় কৃষ্ণভামিনীর এই আশ্চর্যকর দৈহিক ক্ষমতার কারণ এবং তা আরো অদ্ভুত, অথচ সত্য বিবরণ। তা হল কলাবতী গায়িকা নিয়মিত পুরুষোচিত ব্যায়াম-চর্চা করতেন। রীতিমত ডন বৈঠক দিতেন সকালে। শেষ রাত থেকে উঠে যেমন কণ্ঠসাধনা করতেন, তেমনি তার পরেই আরম্ভ হত তাঁর ওই ভাবের স্বাস্থ্য-চর্চা। শারীরিক শক্তি এমনি অভ্যাসের ফলেই তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। অবশ্য এই ধরনের পুরুষালী প্রবণতা ছিল তাঁর স্বভাবে।

আমাদের দেশের নারীর পক্ষে ব্যতিক্রম কিংবা ক্বচিৎদৃষ্ট বলা যায় কৃষ্ণভামিনীকে। অর্থাৎ তাঁর এই পৌরুষ চরিত্রকে। কোন কোন পুরুষের মধ্যে মেয়েলী ধাত যেমন দেখা যায় তিনি তাঁর বিপরীত দৃষ্টান্ত। অথচ পরিপূর্ণ নারী-অঙ্গ। এবং কমনীয় সংগীতকণ্ঠ মিষ্টত্বের জন্যেই মনোহারী ছিল। অমন প্রচণ্ড পুরুষ-স্বভাব কোন ক্ষতি করতে পারেনি কৃষ্ণভামিনীর গানের গলা কিংবা মাধুর্যের।

হয়ত এই শারীরিক শক্তি তাঁর চরিত্রে একটি প্রবল ব্যক্তিত্ব দিয়েছিল। আর তা প্রকাশ পেত তাঁর কথাবার্তায়, ব্যবহারে, ধরনধারণে।

পরের যুগের গায়ক জমিরুদ্দিন খাঁ ছিলেন কৃষ্ণভামিনীর চেয়ে বয়সে কিছু ছোট। আর সে সময়ে আসরে গানও গাইতেন না। তখন সারঙ্গ-বাদক ছিলেন। কৃষ্ণভামিনীর সঙ্গে সেই হিসেবেই পরিচয় ছিল জমিরুদ্দিনের।

একেকদিন কৃষ্ণভামিনী তাঁকে মুরুব্বিয়ানা চালে বলতেন, 'আরে কেয়া সারেঙ্গী বাজাতা। গানা শুরু করো, গানা শুরু করো।'

এমনি ব্যক্তিত্ব ছিল কৃষ্ণভামিনীর। যত বড় আসরই হোক,

যত নামী কলাবত আসুন—তিনি সদা সপ্রতিভ, ঠিক শ্বেতাঙ্গিনীর মতন। আর নির্ভীকা তো সর্ববিষয়ে। শ্রুতি-স্মৃতিতে তাঁর এই ব্যক্তিচরিত্র সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

পুলিসের সাহেব কর্তা বাড়িতে তদন্তে এলেও যাঁর ভয় ডর নেই—বরং মিষ্টি করে গান শুনিয়ে তাঁর মনে ছাপ দিতে পারেন, যিনি একাই পরাভূত করে দেন কলাবাগানের তুটো সশস্ত্র গুণ্ডাকে তাঁর সাহসের কথা তো বোঝাই যায়।

তেমনি মামলা-মোকদ্দমা কিছুতেই ভয়ের বালাই কৃষ্ণভামিনীর ছিল না। কিন্তু স্বভাবের এসব দিক ছিল তাঁর শিল্পী-সত্তার সমান্তরালে। অর্থাৎ সেই তুর্জয় মানসিক ও শারীরিক শক্তি তাঁর ললিত-কলা চর্চাকে কখনো ছায়াচ্ছন্ন করেনি। আরো দৃষ্টান্ত আছে এবিষয়ে।

আগেই বলা হয়েছে, গৌরীশঙ্কর মিশ্র ছিলেন তাঁর প্রধান শিক্ষা গুরু। গৌরীশঙ্করের কনিষ্ঠ কালী ওস্তাদের কাছেও শিখতেন কৃষ্ণভামিনী।

তাঁরা তুজনেই কৃষ্ণভামিনীর সঙ্গে আসরে সারঙ্গ বাজাতেন। আর সেজন্যে মজুরোর অংশ পেতেন গায়িকার কাছে। সেই বাবদ টাকার হিসেব নিয়ে একবার কৃষ্ণভামিনীর মন কষাকষি হল। গৌরীশঙ্করের সঙ্গে নয়। কালী ওস্তাদের সঙ্গে কৃষ্ণভামিনীর মতান্তর ঘটল মুজরোর ব্যাপারে।

প্রথমে কলহ। তারপরে পরস্পরের মুখদর্শন বন্ধ। সুতরাং একযোগে গান বাজনা আর কি করে হয়।

কৃষ্ণভামিনীর জিদ চাপল, কালী ওস্তাদের সঙ্গে আর গাইবেন না আসরে। কালীশঙ্করের কাছে তাঁর গান শিক্ষা সংগ্রহ করাও আর হল না।

কথাটা রটে গেল সঙ্গীত-সমাজে। অন্য সারঙ্গী নিয়ে কৃষ্ণভামিনী আসর করতে লাগলেন।

এমনি কিছুদিন চলবার পর অবশেষে মামলা পর্যন্ত গড়াল বিবাদের পালা।

কালী ওস্তাদের মজুরোর ভাগ পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। গান শেখাবার মাস মাহিনাও বন্ধ। বিষম রাগে প্রতি-আক্রমণ করলেন পেশাদার ওস্তাদ। মামলার ভয় দেখিয়ে বাঈজীকে জব্দ করতে চাইলেন।

কালীশঙ্কর আদালতে কৃষ্ণভামিনীর নামে মোকদ্দমা রুজু করলেন। দেয় টাকা অনাদায়ের জন্যে নালিশ।

শমন পেয়ে কৃষ্ণভামিনীকে ছোট আদালতে হাজির হতে হল। কিন্তু তিনি কি ভয় পাবার পাত্রী? উকিল দিয়ে মামলা চালাবার যথোচিত ব্যবস্থা করলেন। নিজে আদালতে উপস্থিত হতে লাগলেন।

বাঈজী মোকদ্দমার দিন বিচারালয়ে আসতেন মহাসাজগোজ করে। এমন আসামী কদাচিৎ দেখা যায়। সুতরাং হাকিম থেকে পেসকার সেপাই সবাইকার চোখ পড়ত বাঙালী বাঈজির দিকে। তাঁর দামী দামী সব সোনার গয়না গায়ে। কোনদিন হীরে মুক্তার ঘটা। সেই উপযুক্ত কাপড় জামা। পরিপাটি সজ্জা। গৌরাঙ্গিনী, সুডৌল স্বাস্থ্যবতী। শুভ্র ললাটে পাতাকাটা সেকালের কেশ-রচনা। তবে আদালতের লোকদের জানবার কথা নয়—পাতায় কপাল ঢাকবার কারণ, একটি ক্ষতচিহ্ন। সেকালের চলতি বেণীসজ্জায় কৃষ্ণভামিনী সেই দাগটি ঢাকা রাখতেন।

কালী ওস্তাদের এই মামলা প্রথমে বিপক্ষে ছিল কৃষ্ণভামিনীর। বাঈজীরই দোষ সাব্যস্ত আর কালীশঙ্করের ক্ষতিপূরণ পাবার মতন অবস্থা। কিন্তু এমন কায়দায় কৃষ্ণভামিনীর পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালিত হল যে বিবাদের মোড় ঘুরে গেল।

মামলা আর না এগিয়ে, তদ্বির তদারকে এসে পড়ল আপোসের পথে। শেষে হাকিমের কামরার বাইরে গোল টেবিলে বাদী বিবাদী

পক্ষ বসলেন। বিরোধ মীমাংসা হতে লাগল পারস্পরিক আলোচনায়।

এই মামলায় কৃষ্ণভামিনী গায়িকা ইন্দুবালাকে সাক্ষ্য মেনেছিলেন। ইন্দুবালার তখন সতের-আঠারো বছর বয়স। গৌরীশঙ্কর ও কালী ওস্তাদের কাছে গান শিখছেন। গৌরীশঙ্কর ওস্তাদই তাঁকে নিয়ে যান কৃষ্ণভামিনীর কাছে। ছাত্রী হিসেবে ছুজনের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেন।

সেই থেকেই ইন্দুবালার সঙ্গে তাঁর আলাপ। গানের জন্যে ইন্দুবালাকে কৃষ্ণভামিনী ভালবাসতেন। ইন্দুবালাও তাঁকে মান্য করতেন বয়োজ্যেষ্ঠা গুরুবোন বলে। শ্রদ্ধা করতেন অতবড় কলাবতী গায়িকা হিসেবে। তাই কৃষ্ণভামিনীর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে রাজি হয়ে যান। কিন্তু কালী ওস্তাদ সেজন্যে রাগ করেছিলেন ইন্দুবালার ওপর।

যখন গোলটেবিলে বসে আপোসের কথাবার্তা চলত তখনো ইন্দুবালার সাক্ষ্যের গুরুত্ব ছিল। তাঁকে সেজন্যে কাছে নিয়ে বসতেন কৃষ্ণভামিনী। কালী ওস্তাদের প্রভাবের বাইরে রাখতেন।

আলোচনায় বিরতির সময় ছুজনে থাকতেন জনান্তিকে। কখনো হয়ত ইন্দুবালার কানে কানে চমৎকার গান শুনিয়ে দিতেন মেজাজ খুশি রাখতে। কারণ জানতেন, ভাল গান শুনিয়েই ইন্দুবালাকে সবচেয়ে খুশি রাখা যায়। উৎকৃষ্ট গানে বড় তৃপ্তি পেত ইন্দুবালার শিল্পীমন। আর কৃষ্ণভামিনীর ভাল ভাল গান তিনি শুনেছিলেন অনেক আসরে। তাই তাঁর বিপক্ষে যাবার সাধ্য ইন্দুবালার ছিল না।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত মিটমাট হয়ে গেল সে মামলা। মতান্তর মনান্তরের পালাও ছুজনের শেষ হল।

কিছুদিন পর থেকেই যথারীতি তাঁকে গান শেখাতে এলেন কালীশঙ্কর। পুনরায় কৃষ্ণভামিনীর গানের সঙ্গে গৌরীশঙ্কর ও কালী ওস্তাদ আসরে আসরে সারঙ্গ বাজাতে লাগলেন।

সবাই দেখলেন আবার আগের মতন কালী ওস্তাদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে বিচিত্র-চরিত্র এই বাঈজীর। ওস্তাদ ছাত্রীর, সারঙ্গী বাঈজীর হাসি হাসি কথাবার্তা গল্পসল্প আগের দিনের মতন হতে লাগল। তারপর থেকে কালী ওস্তাদের সঙ্গে কৃষ্ণভামিনীর সদ্ভাব ছিল সঙ্গীতজীবনের শেষ পর্যন্ত।

কৃষ্ণভামিনীর একজন জীবনসঙ্গীর কথাও জানা যায়। ইনি ছিলেন উত্তর বাংলার একটি জমিদারীর মালিক। রঙপুরে ভদ্রলোকের খাস আবাস। কিন্তু রাজধানীর সঙ্গে তাঁর কাজের এবং অকাজের সম্পর্কও বেশ ছিল। কলকাতায় এলেই তিনি কৃষ্ণভামিনীর কাছে আসতেন, থাকতেন। তাঁদের এই সম্বন্ধ বজায় থাকে বরাবর। অর্থাৎ কৃষ্ণভামিনীর জীবনকাল যাবৎ।

কিন্তু কৃষ্ণভামিনীর দীর্ঘায়ু হননি। শ্বেতাঙ্গিনীর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, মধ্যবয়সেই।

১৯২২-২৩ সাল কিংবা তার কিছু আগে বিগতা হন কৃষ্ণভামিনী।

সেকালের অনেক সঙ্গীতশিল্পীর স্মৃতিই একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কৃষ্ণভামিনীর তা হয়নি বলা চলে। কারণ রেকর্ডগুলিতে আছে তাঁর সঙ্গীতকণ্ঠের কিছু নিদর্শন। আর সেই বিচিত্র-চরিত্র গায়িকার একটি আত্মঘোষণা—'মাই নেম ইজ কেষ্টভামিনী'!

যাদুকরী ঠুংরী

॥ মৌজুদ্দিন খাঁ ॥

মাল্‌কা জান কদিন থেকেই লক্ষ্য করছেন ফৈয়াজ খাঁকে। তাঁর বড়ই আশ্চর্য বোধ হচ্ছে। কিন্তু তার কারণ ঠিক বুঝতে পারছেন না।

কেমন খামোশ হয়ে থাকেন ফৈয়াজ খাঁ। গম্ভীর, বিষণ্ণ যেন। গুম্ হয়ে আছেন নিজের মনে। একলা দিন কাটাতে চান।

মাল্‌কা খবর নিয়েছেন—তবিয়ৎ ঠিক আছে তো?

না, শরীরে কোন গোলযোগ নেই। কিন্তু মন যেন ভার ভার। কথা বলেন না ভাল করে। শুধু 'হাঁ' কিংবা 'না' জবাব দেন, কিছু জিজ্ঞেস করলে। আর বসে থাকেন চুপচাপ।

মৌজুদ্দিন তালিম দিতে আসেন মাল্‌কা জানকে। ফৈয়াজ তখন অন্য দিকে চলে যান।

বাঈজীকে বাতিয়ে দেবার সময় নিজে গেয়ে দেখান মৌজুদ্দিন। তখন ফৈয়াজ কখনো অন্য ঘরে অপেক্ষা করেন। কখনো বা বেরিয়ে পড়েন বাইরে, কখনো একতলায় থাকেন।

মাল্‌কা জান অবাক হয়ে ভাবেন—খাঁ সাহেবের কি হল? মৌজুদ্দিন সম্পর্কে কিছু ঈর্ষা নাকি?

স্পষ্ট জিজ্ঞেস করাও যায় না এ বিষয়ে। যদি কিছু মনে করেন। একে তো মেহমান। সম্মানিত অতিথি। আবার অতবড় ঘরানাদার। তা ছাড়া, কিছু কিছু চীজও দিচ্ছেন। তাঁকে প্রসন্ন রাখা গৃহকর্ত্রীর কর্তব্য।

তাঁর বাড়িতে থেকে মুখ ভার করে থাকছেন ফৈয়াজ খাঁ। মাল্‌কা জানের বড়ই খারাপ লাগছে।

মৌজুদ্দিনকে ফৈয়াজের এড়িয়ে চলবার কারণ কি? দুসরা খানদান? আলাদা ঘরানার জন্যে পেশাদারী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব? না অন্য কিছু? বাড়ির কর্ত্রী হিসেবে নিজের দায়িত্বের কথা ভাবেন মাল্‌কা জান।

ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীটে তাঁর সেই গৃহ। ধর্মতলা স্ট্রীট আর ওয়েলেস্‌-লির মোড়ের কাছে। ট্রাম লাইন থেকে পূর্বদিকের রাস্তা ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট। তার মধ্যে কয়েকটি বাড়ি পার হয়ে ডানদিকে অর্থাৎ দক্ষিণে সেই দোতলা বাড়ি, উত্তরমুখী। সেখানেই আগ্রাওয়ালী বাঈজী মাল্‌কা জানের অতিথি হয়েছেন ফৈয়াজ খাঁ। তিনিও আগ্রা থেকে কলকাতায় এসেছেন। এখানে এখন কিছুদিন তাঁর থাকবার ইচ্ছা।

তা হল ১৯০৯-১০ সালের কথা।

তখনকার আগ্রা ঘরানার শীর্ষস্থানীয় এবং প্রবীণতম ওস্তাদ গোলাম আব্বাস। অশীতিপর বয়সে তিনি তখনো সগৌরবে বর্তমান। পরে আরো দুই যুগ ব্যাপী আয়ুষ্মান হয়ে গোলাম আব্বাস শতবর্ষ অতিক্রম করেছিলেন। তাঁরই দৌহিত্র ও দস্তরমত তালিমে তৈয়ারি ফৈয়াজ খাঁ। মাতামহের মতন তিনিও আগ্রার সন্তান।

আর মৌজুদ্দিন কাশী থেকে কলকাতায় আগত। সেখানেই তাঁর জন্ম। পেশাদার গায়ক হিসাবে কলকাতা-নিবাসী থাকবার প্রয়াসী মৌজুদ্দিন। আগেও একাধিকবার এখানে এসেছেন, মহ্‌ফিল করেছেন। এখন স্থায়ী হতে চান ওস্তাদরূপেও। মুজরো করেন বাঈজী মহলে তালিমও দিচ্ছেন কয়েকজনকে। আগ্রাওয়ালী মাল্‌কা জান তাঁদের মধ্যে বিশিষ্টা।

মৌজুদ্দিন আর ফৈয়াজ খাঁর বয়স কাছাকাছি। কয়েক বছরের জ্যেষ্ঠ মৌজুদ্দিন। তবে তা চার-পাঁচ বছরের বেশি নয়।

শৈশবে পিতৃহীন ফৈয়াজ। রঙ্গিলে ঘরানার খেয়ালগায়ক তাঁর

পিতা ছিলেন সব্দর খাঁ। পিতাকে হারিয়ে বাল্যকাল থেকেই ফৈয়াজ মাতামহের কাছে মানুষ হয়েছেন। গানের তালিমও পেয়েছেন তাঁর নিকটে।

গোলাম আব্বাসের একেবারে হাতে গড়া ফৈয়াজ সে সময়ে বিশ বছরের ঘরানা তালিম-পাওয়া কলাবৎ। বাপের ঘর দিল্লীর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক নেই তাঁর। আগ্রাতেই সুদীর্ঘকাল বসবাস করে, মাতামহেরই শগীর্দ্ আগ্রা ঘরানাদার হয়েছেন ফৈয়াজ খাঁ। আগ্রা ঘরানার যা বৈশিষ্ট্য, ধ্রুপদ-ধামার-ভিত্তিক শিক্ষা পেয়েছেন। আর আসরে প্রধানত খেয়াল অঙ্গের গায়ক। আগ্রা ঘরানার যে আসল চীজ খেয়াল—ভারি চালের খেয়াল গোয়ালিয়রের ধরনের।

সেই ছন্দের কারিগরিতে তান কর্তবের মুন্সিয়ানায় দুরস্ত হয়েছেন ফৈয়াজ খাঁ। কণ্ঠস্বর তাঁর অন্যতম প্রধান সম্পদ। কি ভরাট নিপাট জোয়ারিদার গলা। আর এমন পাল্লাদার আওয়াজের মধ্যে কত বিচিত্র কারুকর্ম। কি দাপটের তানকারী।

সেই ফৈয়াজ বিষাদগ্রস্ত হয়ে আছেন কেন? মৌজুদ্দিনের সঙ্গে তাঁর কিছু হয়েছে নাকি?

মাল্কা ভাবেন, কিভাবে কথাটা তোলা যায়:

যে সময়ের কথা, কলকাতার সঙ্গীত-সমাজে তখন কেউ চেনে না ফৈয়াজকে। পেশাদার-রূপে আত্মপ্রকাশের সুযোগও তিনি পাননি।

নওজওয়ান ফৈয়াজ খাঁ। বয়স তখনো তাঁর ত্রিশ স্পর্শ করেনি। পশ্চিমাঞ্চলের দীর্ঘকায় স্বাস্থ্যবান যুবক। শৌখীন বেশভূষা, সুপুরুষ। কথাবার্তায় ব্যবহারে মার্জিত। সঙ্গীতই জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

আগ্রা থেকে হাজির হয়েছেন কলকাতায়। মাঝে দিল্লী ইত্যাদি কোন কোন কেন্দ্রে মহ্ফিল করেছেন। এলেম দেখিয়েছেন কলাবৎ হিসাবে। কিন্তু এমন তৈয়ারী গায়ক হয়েও কলকাতায় কোন রীতিমত আসর হয়নি এখনো। এত বড় সঙ্গীতামোদী শহর তাঁর কাছে প্রায় অপরিচিত।

তাই মাল্‌কা জানের বাড়িতে ফৈয়াজ খাঁ উঠেছেন। আগ্রাওয়ালী বাঈসাহেবার কলকাতায় সঙ্গীতবিলাসী সমাজে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি। তাঁর সূত্রে শহরের গুণী পোষক রইস লোকদের সামনে গুণপনা দেখাতে পারবেন ফৈয়াজ। তখন এখানেও তাঁর গানের কদর হবে, এই আশা।

ফৈয়াজের প্রায় সমবয়সী আগ্রাওয়ালী মাল্‌কা খেয়াল ঠুংরি দাদরা গজলের উৎকৃষ্ট গায়িকা বলে তখনই বাঈজীর বেশ নাম ডাক কলকাতায়। বিশেষ ঠুংরি গানে। আর বাঈজীদের যা দস্তুর, নৃত্য-পটিয়সীও। নাচে গানে মুজরো করেন ভালই। ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীটের এই গৃহ তাঁর স্বোপার্জিত।

মাল্‌কা জানের সুশ্রী মুখ চোখ। ঈষৎ স্থূলাঙ্গিনী হলেও সুগঠিত তনু। মাজা মাজা শ্যামবর্ণা। সঙ্গীতগুণের সঙ্গে আচরণ সহবতেও প্রথম শ্রেণীর পশ্চিমা বাঈ।

কথায় কথায় একদিন তিনি ফৈয়াজকে বললেন, 'খাঁ সাব, আপনি আমার মেহমান। অতিথির কোন অসুবিধা না হয়, তিনি আরামে থাকেন, তা দেখা আমার কর্তব্য। তাই জিজ্ঞেস করছি, আপ্ খামোশ কাঁহে? আপনার কি তক্‌লিফ আমায় বলুন। আমি যথাসাধ্য তা দূর করব। আপনি এ বাড়িকে আপনার নিজের বলে জানবেন।'

ফৈয়াজ খাঁ প্রতিবাদ করে বললেন 'না না, আপনার যত্ন-আত্তির কোন ত্রুটি হয়নি। বেফিকর রহিয়ে। আমার মন খারাপ হয়ে আছে অন্য কারণে।'

বলে, মৌন রইলেন অল্পক্ষণ। কিন্তু মাল্‌কা জান কৌতূহল প্রকাশ করলেন না।

তখন ফৈয়াজ খাঁ বুঝিয়ে দিলেন তাঁর ভাবান্তরের কারণ। অকপটে বললেন, 'আপনার কাছে তা বলতে আমার আপত্তি নেই, যদিও আপনি সে বিষয়ে কিছু করতে পারবেন না। দেখুন, কথাটা

মৌজুদ্দিনের গান নিয়ে। বলতে কি, তার গান শুনেই আমি বিষণ্ণ হয়ে আছি। আর ভাবছি নিজের কথা। আমিও দস্তুর মাফিক তালিম পেয়েছি। রিয়াজ যা করবার যথাসাধ্য করেছি, বাচ্ পনসে। কোন ফাঁকি দিইনি। তা একরকম তৈয়ার হয়েছি। আসরে দশ-জনের সামনে গানও গাইছি ঠিক ঠিক। সমঝদাররা আমায় তারিফও করেন বটে। লেকিন্ কিসিকো আঁখ মে আঁসু আতা নেহি। মৌজুদ্দিনের গান শুনে এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। আমার সঙ্গে তার গানের তফাত। আমার গানে কোন শ্রোতার চোখে তো অশ্রু ঝরে না। যেমন আমার চোখে জল আসে মৌজুদ্দিনের গান শুনে।'

ফৈয়াজ খাঁ আবার একটু থামলেন।

এ পর্যন্ত শুনে চমৎকৃতা হলেন মাল্কা জান। কিন্তু কোন প্রশ্ন করে খাঁ সাহেবের আবেগে ব্যাঘাত ঘটালেন না। বুঝলেন যে বক্তার কথা এখনো বাকি।

শ্রোত্রীকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না।

স্বগতোক্তির মতন শোনাল ফৈয়াজ খাঁর কথা, 'আহা, কি গান গায় মৌজুদ্দিন। ওই রকম না হলে আর গান। অমন গাইতে না পারলে জীবনে হল কি? বৃথা গান শেখা। মৌজুদ্দিনের কি দরদের ঠুংরি!'

আগ্রাওয়ালীর কাছে এবার পরিষ্কার হল, ফৈয়াজের আসল কথা বা মনের ব্যথা। বুদ্ধিমতী তিনি। মৌজুদ্দিনের ঠুংরি শুনে, নিজের কাছে তেমন গানের অভাব দেখে বিষণ্ণ ফৈয়াজ খাঁ।

একটু চিন্তা করে, আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে কি করবেন খাঁ সাব? মৌজুদ্দিনের কাছে কিছু নিতে তো পারবেন না আপনি। এত নাম আপনাদের আগ্রা ঘরানার। তার খেয়াল আর ধামার গানে স্বয়ং গোলাম আব্বাসের তালিমে আপনি সেই ঘরানাদার। কি করে নেবেন মৌজুদ্দিনের ঠুংরি?'

তা তো বটেই। মৌজুদ্দিনের সামনে গানের প্রার্থী হতে একেবারে নারাজ ফৈয়াজ।

দৃঢ় আপত্তি জানিয়ে বললেন,'আমার মুশকিল তো এইখানে। এই কথা নিয়েই কদিন ভাবছি। আর কোন কিনারা দেখতে পাচ্ছি না। এত বড় খানদান আমার। আমি কি মৌজুদ্দিনের কাছে হাত পাততে পারি? অথচ যেমন ধরনের গান এতদিন গেয়ে এসেছি, তাতে আর তৃপ্তি পাচ্ছি না। কি করি?'

ফৈয়াজ খাঁর এই সমস্যা। সমাধানের কোন রাস্তা না পেয়ে বিমর্ষ হয়ে আছেন। অতৃপ্ত শিল্পী-চিত্ত বিক্ষুব্ধ। অন্তরের চাহিদার সঙ্গে বংশ-গরিমার বিরোধ।

ফৈয়াজের সংকট নিয়ে ভাবতে লাগলেন মাল্‌কা জান। অবশেষে একটি উপায় স্থির করলেন। ফৈয়াজের দুদিক রক্ষা হতে পারে এই সূত্র অনুসারে।

বাঈসাহেবা বললেন, 'আমি একটা মতলব বাৎলাতে পারি খাঁ সাব। আপনি মন খারাপ করবেন না। এমন বন্দোবস্ত হবে যে, আপনার কাজ হাসিল হয়ে যাবে অথচ মৌজুদ্দিন কিছু জানতে পারবেন না।'

সাগ্রহে জিজ্ঞাসু হলেন ফৈয়াজ খাঁ।

তখন মাল্‌কা জান জানালেন, 'মৌজুদ্দিন যখন আমায় তালিম দেবেন আর গাইবেন, তখন আপনি এরকম তাঁর সামনেই থাকবেন। আর ভাল করে শুনে নেবেন তাঁর চীজ্, বন্দিশ্ আর গাইবার ঢং-ঢাং সব। অথচ মৌজুদ্দিন তার কিছুই জানতে পারবেন না। তবেই তো ফায়দা।'

ফৈয়াজ খাঁ উৎসাহ পেলেন, তবে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু তা কি করে সম্ভব? এ নিয়ে না ঝঞ্চাট বেধে যায়।'

'কোন ভাবনা নেই আপনার। আমার মতলবটা শুনুন। এবার থেকে মৌজুদ্দিন এলে আমি ওই বড় কামরায় থাকব। ওখানেই

তালিম নেব তাঁর কাছে। একেকটা গান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাঁকে দিয়ে গাওয়াব। তখন একদিকের দেওয়ালের ধারে একটা চৌপাই খাড়া করা থাকবে। আর সেই চৌপাইয়ের আড়ালে, দেওয়ালের দিকে হবে একটি বিছানা। আপনি সেখানে আরাম করে থাকবেন। শুয়ে বসে, শুনে নেবেন মৌজুদ্দিনের সব গান আর কারিগরি। মৌজুদ্দিন আপনার পাত্তাই পাবেন না।'

ফৈয়াজ সায় দিলেন কর্ত্রীর কথায়। মাল্‌কাও সেই মতন সব বন্দোবস্ত করলেন।

তারপর থেকে, মৌজুদ্দিন শেখাতে আসেন বাঈজীকে, দোতলার সেই বড় কামরায়। আর চৌপাইয়ের আড়ালে উৎকর্ণ শ্রোতা নিবিষ্ট হয়ে থাকেন।

মৌজুদ্দিন খেয়ালেরও তালিম দেন মাল্‌কাকে। তবে ঠুংরিই বেশি। আগ্রাওয়ালী যে ঠুংরির গানের জন্যে অত নাম করেন তা মৌজুদ্দিনের প্রসাদেই।

এইভাবে বেশ কিছুদিন যায়। সেবার ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীটের বাড়িতে মৌজুদ্দিন আসেন মাস দুয়েক। ফৈয়াজও সে সময় ওখানে বরাবর থাকেন। চৌপাইয়ের ওধার থেকে ঘনিষ্ঠভাবে শুনে নেন মৌজুদ্দিনের গানের চাল। তাঁর গায়কীয় খুঁটিনাটি নানা কারুকার্য। সেই গীতিমাধুর্যের নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁর অন্তরঙ্গ মর্ম-সন্ধান যেন। কত রঙ্গিনী ভাব, কত সুষমা। কি আবেগে অনুভবে অত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, শ্রোতাকে অভিভূত করে তাঁর গান—তার সাক্ষাৎ পরিচয় পেলেন ফৈয়াজ খাঁ। তার ফলে, সঙ্গীতকৃতিতে বহুলাংশে উপকৃত হলেন।

স্বয়ং সিদ্ধকণ্ঠ, উচ্চকোটির শিল্পী-প্রাণ ফৈয়াজ খাঁ। যা গ্রহণীয় তা আত্মস্থ করে নেন। বিশেষ ঠুংরি, যার চলন নেই তাঁদের আগ্রা ঘরানায়।

পরবর্তী জীবনে ফৈয়াজ খাঁ ঠুংরি গানের চর্চায় উদ্বুদ্ধ হন, যে তৃপ্তি

পেতেন ঠুংরি পরিবেশনে, নিজের সঙ্গীত বিষয়ের যে অন্তর্গত করে নেন ঠুংরি গানকে—তার মূলে মৌজুদ্দিনের সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত ও প্রভাব। ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীটের সেই বাস-পর্বে মৌজুদ্দিন এবং তাঁরই তালিমে গঠিতা মাল্‌কা জানের প্রতিও ফৈয়াজ খাঁ ঋণী ঠুংরি সম্পর্কে। মৌজুদ্দিনের গান ও তালিমের সঙ্গে এমন নিবিড় সংযোগ না ঘটলে আগ্রা ঘরানাদার ঠুংরির প্রতি আকৃষ্ট এবং তা গ্রহণ করতেন কিনা সন্দেহ।

শুধু ঠুংরিতে নয়। ফৈয়াজ খাঁর গায়ক জীবনে মৌজুদ্দিনের সামগ্রিক প্রভাবও ধর্তব্য। অসামান্য দক্ষ গায়নগুণী এবং জোয়ারিদার কণ্ঠসম্পদের অধিকারী হলেও ফৈয়াজের আওয়াজ ছিল বাজখাঁই। স্বভাবতই মাধুর্যরস বঞ্চিত। সেই ঘাটতি তিনি পূরণের প্রয়াস পান মৌজুদ্দিনের অপূর্ব গায়নভঙ্গিমা, ধরনধারণ আত্মস্থ করে। সেই অপরূপ মাধুরী আপন গানে সঞ্চারিত করতে সচেষ্ট হন, যা শ্রোতার আঁখিপট অশ্রুসজল করে তোলে। রসনিষ্ণাত হয় চিত্ত।

মৌজুদ্দিনকে সচেতনভাবে অনুধাবনের ফলে সমৃদ্ধতর হয় ফৈয়াজের গানের চাল, তাঁর পেশাদার কলাবৎ জীবনের উদ্বোধন লগ্নে।

অবশ্যই মৌজুদ্দিনের নিকটে এ সংবাদ অপ্রকাশিত থাকে এবং তা মাল্‌কা জানের কৃতিত্বে।

মৌজুদ্দিনের মধুরতার সাক্ষাৎ দৃষ্টান্তে আরো শ্রীময়ী সৌন্দর্যময়ী হয়ে ওঠে ফৈয়াজ খাঁর গান। অধিকতর রস-সঞ্চারী হয় তাঁর আগ্রা ঘরানায় উত্তরাধিকার। সঙ্গীত-রসিক সমাজে একথা সুপ্রচলিত যে, আগ্রা ঘরানা রুখা ঘরানা। রুখা বা রুক্ষ এই অর্থে যে, আগ্রা ঘরানার খেয়াল গায়নে ছন্দ-লীলা, তান-কর্তবের দাপট বেশি প্রকট। মাধুর্য রস সেই অনুপাতে গৌণ। অনেকাংশে গোয়ালিয়র ঘরানার তুল্য। গোয়ালিয়রী চালেও রসমাধুরীর আবেদন অপেক্ষা ছন্দ-কর্ম তথা লয়কারীর প্রাধান্য। এখানে প্রশ্ন এই যে, নিষ্ঠাবান আগ্রা

ঘরানাদার হয়েও ফৈয়াজ খাঁ যে ঠুংরি গাইতেন, তা কোথায় ছিল আগ্রা ঘরানায়? কোথা থেকে পেলেন ফৈয়াজ? তার সদুত্তর—মৌজুদ্দিন এবং তাঁরই ঠুংরির এক উত্তরাধিকারিণী মালকা জান।

গায়ক মৌজুদ্দিন হতে ফৈয়াজ যে গানকে হৃদয়স্পর্শী, অধিকতর সুষমামণ্ডিত করবার অভিলাষী হলেন, একথায় তাঁর গৌরবের কোন হানি ঘটে না। যথার্থ শিল্পীচিত্ত চির-গ্রহিষ্ণু। অনেক শ্রেষ্ঠ কলাকার যে অপরের থেকে গ্রহণীয় বস্তু সংগ্রহ ও আত্মস্থ করে নেন, তা আদৌ দোষাবহ নয় নন্দনজগতে। 'আর্টিস্ট হচ্ছে কালেক্টর'—ভারতীয় চিত্রশিল্পের আচার্য অবনীন্দ্রনাথের এই ভূয়োদর্শী মন্তব্য ললিতকলার সকল ক্ষেত্রেই সত্য, বিশেষ সঙ্গীতে। ফৈয়াজ খাঁও তেমনি নিজের খেয়াল গানের অবয়বে মর্মস্পর্শী রসসৃষ্টিতে সচেতন হলেন, মৌজুদ্দিনের গানের অভিজ্ঞতায়।

এখানে বলে রাখা যায়—মালকা জান এবং ফৈয়াজ খাঁর উল্লিখিত কথাবার্তা, চৌপাইয়ের আড়ালে মৌজুদ্দিনের গান ফৈয়াজের শোনার ব্যবস্থাদির বিবরণ, অলীক কিংবদন্তী নয়। এই ঘটনাপরম্পরার কথা স্বয়ং মালকা জান জানিয়েছিলেন অনাথনাথ বসুকে। মৌজুদ্দিন-ফৈয়াজ খাঁ প্রসঙ্গের ক বছর পরে, ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীটের সেই বাড়িতে বসেই। তরুণ সুদর্শন অনাথনাথ তখন বাংলার উদীয়মান প্রতিশ্রুতি-বান খেয়াল ঠুংরি শিল্পী। উপরন্তু রীতিমত তবলাবাদক। নানা আসরে গানের উপলক্ষ্যে মালকা জানের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। মালকার বাড়িতেও শিক্ষার্থীরূপে যেতেন পুত্রতুল্য স্নেহপাত্র অনাথনাথ। সেখানে মালকার অনুরোধে মৌজুদ্দিনও তাঁকে কিছু তালিম দিয়ে-ছিলেন। সেকথা পরে, মৌজুদ্দিনের অন্য প্রসঙ্গে।

বসু মশায়ের উত্তরজীবনে ফৈয়াজ খাঁর সঙ্গে বিশেষ প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল গানেরই সূত্রে। অনাথনাথের গুণমুগ্ধ খাঁ সাহেব তাঁকে বরাবর প্রীতির দৃষ্টিতে দেখেছেন।

রায়গড় দরবারে নিযুক্ত কলাকাররূপে এবং পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন

আসরের গায়ক-বাদক রূপে বসু মশায় ফৈয়াজের সংস্রবে এসেছেন বহুবার। নেতৃস্থানীয় গায়নগুণী খাঁ সাহেবের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন তিনি। এখানে প্রাসঙ্গিক কথা এই যে, মৌজুদ্দিনের সুবাদে ফৈয়াজ খাঁর লাভবান হওরার কথা অনাথনাথ নিরপেক্ষভাবে উল্লেখ করতেন ফৈয়াজের ঠুংরি গাওয়ার দৃষ্টান্ত দিয়ে, খেয়াল গানেও রসসৃষ্টিতে তাঁর আরো মনোযোগী হওয়ার কথা বলে।

সমকালীন বহু কলাকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল অনাথনাথ মাল্‌কা জানের বিবৃতি অবিশ্বাস করবার কোন কারণ পাননি। আর ফৈয়াজের ঠুংরির উৎস-স্বরূপ মনে করতেন মৌজুদ্দিন এবং মাল্‌কা জানকেও। আসলে যা একই ধারা।

বসু মশায়ের বিবৃতি যে নিরপেক্ষ হিসাবে বিশ্বাসযোগ্য তথা গ্রহণীয়, সেজন্যেই তাঁর প্রসঙ্গের অবতারণা।

তখনকার অভিজ্ঞ মহলে একটা বেশ কথাই তো আছে। ফৈয়াজ খাঁ ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীটে মাল্‌কার বাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন তাঁকে খেয়াল গানের তালিম দিতে। আর বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে ঠুংরি দাদরা নিয়ে। আগ্রাওয়ালীর কাছ থেকেও তিনি ঠুংরি দাদরা সংগ্রহ করেছিলেন বৈকি। আর প্রকারান্তরে তাও মাল্‌কার ওস্তাদ মৌজুদ্দিন থেকে প্রাপ্ত। এসব কথাও অন্তরঙ্গভাবে জানাতেন ওয়াকিবহাল অনাথনাথ বসু।

আগ্রাওয়ালীর ঠুংরি দাদরা ফৈয়াজ খাঁ কেমন নিয়েছিলেন তার একটি নমুনাও দেওয়া যায়।

এমনি দুখানি হাল্‌কা চালের গান রেকর্ড করেছিলেন ফৈয়াজ খাঁ। একটি হল, 'বালম্ পরদেশী না যাইও।' আর একখানি— 'আও পিয়া ম্যয় সেজ বিছাউ/গরোয়া লাগু করু তো কো পেয়ার।'

এই দুটি গানের মাল্‌কা জানেরও রেকর্ড আছে। জানবার কথা এই যে, গান দুখানি প্রথম রেকর্ড করেন আগ্রাওয়ালী, ফৈয়াজের ক বছর আগে।

সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায় ফৈয়াজ খাঁর ওই দাদরা ঠুংরি মাল্‌কা জান থেকে লব্ধ, কিংবা মৌজুদ্দিনের তালিম দেবার সময়।

ফৈয়াজ খাঁ মৌজুদ্দিনকে কত বড় কলাকার জ্ঞান করতেন, আপন সঙ্গীতজীবনে কি সম্মানের আসন দিতেন সেই প্রতিভাধরকে, তার পরিচয় ছিল মাল্‌কা জানের গৃহ প্রসঙ্গে। যেমন অকপট স্বীকৃতিতে তেমনি অশ্রু দিয়ে সঙ্গীত-ভাবপ্রবণ ফৈয়াজ খাঁ প্রথম যৌবনে মৌজুদ্দিনের অভিষেক করেছিলেন। তেমনি তাঁর স্মৃতি-তর্পণেরও নজির দেওয়া হবে উপমা হারে।

এখন মৌজুদ্দিনের কথা। অর্থাৎ তাঁর গীতিকলা প্রসঙ্গ।

আসরে তাঁর অনুষঙ্গে আছে—এক আশ্চর্য সুরেলা কণ্ঠ। গানে অপরূপ রসসৃষ্টি এবং দুর্লভ স্বরমাধুর্য। আর আসর মাত করবার শক্তি।

সংক্ষেপে এই হল মৌজুদ্দিনের সঙ্গীতগুণ। এমনি গুণেই তিনি শ্রোতাদের সম্মোহিত করে রাখতেন। আর তাঁর গানের যাদুতে শ্রোতারা যে মুগ্ধ, এবিষয়ে সচেতনও ছিলেন নিজে। তবে এই নিয়ে অহঙ্কার প্রকাশ করতেন না। তৃপ্ত থাকতেন সার্থকতার গৌরবে।

শ্রোতাদের যেমন মোহগ্রস্ত করতেন, তেমনি আবার অনেক আসরে নিজেও আত্মবিস্মৃত হয়ে যেতেন। গানে গানে কোন্ মায়ালোকে অন্তর্ধান করতেন শ্রোতৃমণ্ডলীর সঙ্গে। কত সময়, কেমন করে অতিবাহিত হয়ে গেছে সে বিষয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হতেন। বাস্তব জগৎ লুপ্ত হয়ে যেত সঙ্গীতের গহন অনুভবে।

তাঁর অতি সফল আসরজীবনে তার নানা দৃষ্টান্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। বলতে গেলে গল্পের মতন শোনায়।

যেমন সেবার হল রামপুরে। উত্তর ভারতের এক শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-কেন্দ্র তখন রামপুর। তার নবাব কাল্‌বে আলী খাঁর আমলের সেই রামপুর দরবারে।

মৌজুদ্দিনকে সেবার কিছুদিন সেখানে থাকতে হয়। তাঁর গানে

মুগ্ধ নবাব রেখে দেন তাঁকে। আর যখনি ইচ্ছা হয়, ফরমায়েস করে তাঁর গান শোনেন।

একদিন তাঁর গান শুনতে চেয়েছেন কাল্‌বে আলি। মৌজুদ্দিনের তলব হয়েছে। তখন সকাল। তবে বেলা হয়ে গেছে বেশ খানিক।

নবাবের এত্তেলা পেয়ে মৌজুদ্দিন প্রস্তুত হতে লাগলেন। তাঁর আসর-পূর্ব প্রস্তুতিপর্ব কিছু সময়সাপেক্ষ। ডন-বৈঠক করে নেন কয়েকটা। তারপর গোসল সারতে যান। স্নানের পরে সাজগোছ, পরিপাটি প্রসাধন—চোখে সুর্মার বাহার পর্যন্ত। তা ভিন্ন কিঞ্চিৎ ভোজন এবং সেই সঙ্গে আবশ্যিক পানযোগও ধর্তব্য।

এইসব পাট সমাধা করতে বড় দেরি হয়ে গেল মৌজুদ্দিনের।

যখন দরবারে এলেন, তখন নবাব গাত্রোত্থানের উদ্‌যোগ করছিলেন। মৌজুদ্দিনের বিলম্বে অসন্তুষ্ট, বিরক্ত। বেলা হয়েছে অনেক। এখন নাস্তার সময়।

কাল্‌বে আলি বিরস মুখে বললেন, 'এখন আর গানের দরকার নেই। ও বেলা শুনব।'

নবাব কথা বলবার আগেই মৌজুদ্দিন তাঁর মেজাজ বুঝেছিলেন মুখ দেখে।

তখন প্রস্তুত হয়ে হাত জোড় করে আর্জি জানালেন, 'থোড়া শুন্ লিজিয়ে নবাব সাব্—পন্‌র মিনিট তক্।'

দরবারে তখন মাত্র কয়েকজন হাজির। সঙ্গতকার শুধু এক সারঙ্গবাদক আর তবলচী।

নবাব অনিচ্ছার সঙ্গে রাজি হলেন।

সম্মতি পেয়েই গান আরম্ভ করে দিলেন মৌজুদ্দিন। ভৈরবীতে ঠুংরি ধরলেন।

প্রথম থেকেই জমে উঠল ভৈরবী। বিরূপতা দূর হয়ে নবাব আকৃষ্ট হলেন। আর ক্রমেই নিমগ্ন হতে লাগলেন সুরের ইন্দ্রজালে।

কাল্‌বে আলী শুধু সঙ্গীতপ্রেমী কিংবা সমঝদার মাত্র নন। তিনি একজন সঙ্গীতজ্ঞও। তাঁর সঙ্গীত দরবারের নায়ক উজীব খাঁর অন্যতম শিষ্য তিনি। তৎকালীন রামপুর ঘরানার নেতা, সেনীয়া বীণকার উজীর খাঁর কাছে ধ্রুপদ গান ও আলাপচারীর পাঠ নেন। নবাবের পরম আগ্রহ রাগসঙ্গীতে। তাঁর দরবারে ধ্রুপদ সঙ্গীত ও রাগালংকারের বিশেষ মর্যাদা আর প্রাধান্য। কিন্তু তেমন ঠুংরি হলে আরও কদর করেন কাল্‌বে আলী।

এখন মৌজুদ্দিনের ভৈরবীর সঙ্গীতে অভিভূত হয়ে পড়লেন। সব কিছু বিস্মৃত হয়ে গানের মায়ায় একান্তমুখী নবাব। সময় কোথা দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে, কতক্ষণ অতিক্রান্ত হয়েছে, কিছুই খেয়াল নেই তাঁর।

কখন ভৈরবীর পরে খাম্বাজ ধরেছেন মৌজুদ্দিন দিবা তৃতীয় প্রহরে, তাও লক্ষ্য করেননি কাল্‌বে আলি। সুরের এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে যেন তিনি ভাসমান। এক গানের শেষে অন্য গান শুরু হয়েছে বটে, কিন্তু শ্রোতার মনে কোন ছেদ পড়েনি এমনি যাদুকরের তুল্য তার প্রভাব।

খিদ্‌মদ্‌গারেরা এর মধ্যে কয়েকবার এসেছে। কিন্তু নবাবকে সেলাম করে কাছে দাঁড়াবার সাহস হয়নি তাদের, তাঁকে সময় জানানো তো দূরের কথা। কারণ সঙ্গীতের সম্মোহনে আচ্ছন্ন কাল্‌বে আলী। বাধা পড়লে বিরক্ত হবেন নির্ঘাত।

মৌজুদ্দিনের এক একটি গান যেন ফুলে ফলে পাতায় লতায় মঞ্জুরিত হয়ে উঠছে। সেই পুষ্পিত পল্লবিত বাগিচার সৌরভে আমোদিত নবাব। সময়ের হিসাব তাঁর নেই। কিন্তু সেকথা তাঁকে জানিয়ে দেবারও হিম্মত নেই কোন খিদ্‌মদ্‌গারের। তারা কামরার দরজায় অপেক্ষমান।

কিন্তু ক্রমে যে শেষ হয়ে এল দিনের আলো। বিকালের পালা আর কি বাকি? ঝাড়ের বাতিদানে রোশনি জ্বালতে হবে তো।

দরবারী ফরাস আর স্থির থাকতে পারে না। ঝাড়লণ্ঠন জ্বালিয়ে দেয় একে একে।

এতক্ষণে নবাবের হুঁশ ফিরে আসে।

কিন্তু তখনো গেয়ে চলেছেন অক্লান্ত মৌজুদ্দিন।

এবার তিনি থামলেন। লজ্জিত নবাব। কিন্তু তারিফ করলেন বিস্তর। সন্ধ্যার পরে দরবার থেকে উঠলেন।...

মৌজুদ্দিনের আরেকটি আসরের গল্প। এটির সূত্র হলেন পরবর্তী কালের বিখ্যাত পাখোয়াজগুণী বিঠলদাস গুজরাটী। তিনিও বলতেন এই ধরনের একটি আসরের কথা। তবে এ ঘটনা বিঠলদাসের সমকালীন নয়, তাঁর পূর্বযুগের বিবরণ। তাঁর কাকার একদিন এমনি অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

একটি ঘরোয়া মজলিস বসেছিল সেদিন। পশ্চিমের এক শহরে, কোন রইস্ লোকের বাড়িতে জলসা। আসরটি ছোট, শ্রোতাদের সংখ্যাও বেশি নয়। তবে তাঁদের অনেকেই বেশ বোদ্ধা। আর গায়ক ছিলেন কয়েকজন। তাঁদের অন্যতম মৌজুদ্দিন।

সন্ধ্যার পর থেকেই আসর শুরু হল। প্রথম কজন যখন গান শেষ করলেন, তখন রাত হয়ে গেছে অনেকটা। বিঠলদাসের কাকা এতক্ষণ বসে গান শুনছিলেন। কিন্তু এবার তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন, রাত হতে দেখে। কারণ তাঁর নিয়মানুবর্তী দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। আহার শয়ন ইত্যাদির সময় নির্দিষ্ট রাখা অভ্যাস। আর রাত জাগলে শরীর খারাপ হতে পারে। তাই তিনি এগোলেন বাইরের দরজার দিকে।

এমন সময় শুনলেন, এবার মৌজুদ্দিনের গান হবে।

গুজরাটী ভদ্রলোক মৌজুদ্দিনের নাম শুনেছিলেন বটে। কিন্তু তাঁর গান কখনো শোনেননি। কৌতূহলী হয়ে ভাবলেন, একটু শোনাই যাক মৌজুদ্দিনের গান কেমন।

তিনি আর আসরের মধ্যে এসে বসলেন না, পাছে উঠতে বা

বেরুতে না পারেন গান শেষ হবার আগে। দরজার ধারেই দাঁড়ালেন, একটি পাল্লায় হাতের ভর রেখে। একটু শুনেই চলে যাবেন, এই ইচ্ছা।

এ বাড়ির কোন কোন লোক তাঁকে বসে ভাল করে শুনতে বললেন।

কিন্তু তিনি আপত্তি জানালেন, 'না, আর বসব না। একটুখানি শুনে চলে যাব। আমার দেরি হয়ে গেছে।'

দাঁড়িয়ে থাকাই তাঁর সুবিধা বোধ হল।

এদিকে মৌজুদ্দিন জমিয়ে তুলছেন তাঁর গান। ভরাট আসর। শ্রোতারা যে যার জায়গায় স্থির হয়ে শুনছেন। কখনো বা প্রশংসা-সূচক কেউ বলছেন কিছু। এই পর্যন্ত মনে করতে পারেন বিঠলদাস গুজরাটীর কাকা।

সে রাত্রে মৌজুদ্দিনের যে কি মনমাতানো খেয়াল ঠুংরি হয়েছিল তার আর কোন বিবরণ আর তাঁর মনে নেই। একেবারে সকালের আলো যখন ঘরে এসে পড়েছে, ওদিকে রাস্তা পরিষ্কার করছে পৌর-কর্মীরা, তখন তাঁর খেয়াল হয়েছে যে সারা রাত কেটে গেছে মৌজুদ্দিনের গানে। কখন যে তিনি দরজার পাশ থেকে আসরের এক কোণে এসে বসেছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কখন পার হয়েছে, সেসব কিছুই তাঁর স্মরণে নেই। তাঁর কান প্রাণ মন ছেয়ে আছে শুধু সুরের এক অফুরন্ত সুরধুনী।...

এমনি আরেকদিনের কথা। ঘটনাস্থল বাংলা।

সেবারে মৌজুদ্দিন এসেছেন মুর্শিদাবাদ দরবারে। মীর্জা সাহেব তাঁকে এখানে এনেছেন। নবাব ওয়াজিদ আলী শাহর এক পৌত্র, হারমোনিয়ম-গুণী মীর্জা সাহেব। তাঁর কুটুম্বিতাও আছে মুর্শিদাবাদ নবাব পরিবারে। সেসব কথা তাঁর সম্পর্কে অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

কলকাতায় সঙ্গীতক্ষেত্রে মৌজুদ্দিনের যে অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী, মীর্জা

সাহেবও তার একজন। মৌজুদ্দিনের সঙ্গে কোন কোন আসরেও তিনি হারমোনিয়ম সঙ্গত করেছেন। গ্রামোফোন রেকর্ডেও বাজিয়েছেন তাঁর গানের সহযোগী হয়ে। তিনিই উদ্‌যোগ করে মৌজুদ্দিনকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে এসেছেন। মৌজুদ্দিন গান শোনাবেন নবাবকে এই প্রথম নবাব তাঁর গুণপনার পরিচয় পাবেন। খুবই আশায় উৎসাহে মীর্জা সাহেব মৌজুদ্দিনকে এনেছেন কলকাতা থেকে।

মুর্শিদাবাদ দরবারে কালে খাঁও ছিলেন সেসময়। পাতিয়ালার মহাগুণী খেয়ালীয়া। পরবর্তী কালের সুপরিচিত কণ্ঠশিল্পী গোলাম আলী খাঁর কাকা এবং প্রথম ওস্তাদ। কালে খাঁর গায়নকৃতির সবিশেষ ও মনোজ্ঞ পরিচয় সঙ্গীতরসিক অমিয়নাথ সান্যাল তাঁর 'স্মৃতির অতলে' পুস্তকে দিয়েছেন। কালে খাঁর সঙ্গীত-জীবনের সঙ্গে ব্যক্তি-জীবনেরও কিছু বিবরণ আছে বর্তমান লেখকের 'সঙ্গীতের আসরে' বইটিতে।

মুর্শিদাবাদ দরবারে মৌজুদ্দিনের আসর যখন হল, কালে খাঁও তখন শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত। নবাবের সঙ্গে তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রোতাদের মধ্যে আছেন। মীর্জা সাহেব হারমোনিয়মে।

আসর বসেছে সন্ধ্যার পর। একমাত্র মৌজুদ্দিনেরই গান হবে।

এখন, তাঁর আসরে গাইবার আগে যে অভ্যাসটি ছিল—অমিয়নাথ সান্যাল বর্ণিত 'কণ্ঠশুদ্ধি'—তার ব্যত্যয় হয়েছিল সেদিন। ঘটনাচক্রে মৌজুদ্দিন 'অপ্রস্তুত' অবস্থায় অর্থাৎ শুষ্ককণ্ঠেই আসরে এসেছেন। মীর্জা সাহেব তাঁর উপযুক্ত 'প্রস্তুতি'র বন্দোবস্ত করতে পারেননি কোন কারণে। এ'দিকে নবাবেরও কড়া হুকুম আছে, দরবারে বসে ওসব চলবে না।

অগত্যা সেই অতৃপ্ত মেজাজে গান শুরু করেছেন মৌজুদ্দিন। গান ধরার আগে একটু উস্‌খুস্‌ করেছিলেন। অর্থপূর্ণ চোখে চেয়েছিলেন মীর্জা সাহেবের দিকে। জনান্তিকে ইসারায় মীর্জাও বুঝিয়ে দেন—

নাচার। এ দরবারে ওসব দস্তুর নেই। কোন রকমে গেয়ে নাও, পরে দেখা যাবে।

কিন্তু তা কি করে হয়! মৌজুদ্দিনের সে মৌজ না হলে আসলে গান গাইবে কে! এই বাহ্য বস্তুর দাস তিনি যে।

মৌজুদ্দিন গাইতে লাগলেন বটে। মীর্জাও দেখলেন—গান জমছে না ঠিক। প্রাণ নেই গানে। এ যেন অন্য মৌজুদ্দিন।

কালে খাঁ কখনো মৌজুদ্দিনের গান শোনেননি। নামডাক শুনেছিলেন মাত্র। এখন অবাক হয়ে ভাবলেন—এই মৌজুদ্দিন! এমনি গানের জন্যে এত নাম। মনের ভাব কালে খাঁ মীর্জা সাহেবকে জানিয়েও দিলেন! লজ্জিত হয়ে শুনলেন মীর্জা। কিন্তু আসল কারণটা ভেঙে বলতে পারলেন না।

নবাব বাহাদুরেরও ভাল লাগছিল না মৌজুদ্দিনের গান।

সেকথা বুঝে মীর্জা সাহেব আরো সরম বোধ করেন। তিনিই বড় মুখে বলে মৌজুদ্দিনের আসর করেছিলেন এ দরবারে। এখন মৌজুদ্দিনের সঙ্গে তাঁরও ইজ্জৎ যাবার দাখিল। নবাব বাহাদুর আবার মীর্জা সাহেবের কুটুম্ব।

অগত্যা তিনি নবাবের কানে কানে ব্যাপারটা জানালেন।

'মৌজুদ্দিনের আসল গান যদি শুনতে চান তাহলে একটু ব্যবস্থা করবার হুকুম দিন।'

'কিন্তু আপনি তো জানেন, আমার দরবারে ওসব বেদস্তুর।'

'জানি, নবাব বাহাদুর। শুধু আজকের জন্যে একবার হুকুম জারি করুন। মৌজুদ্দিনকে পেয়েছেন, তার গান ভাল করে শুনে নিন। পরে এ সুযোগ হয়ত নাও পেতে পারেন। আর কখনো আপনাকে এমন আর্জি জানাব না।'

তখন অনুমতি দিলেন নবাব। আর দরবারেই কণ্ঠশুদ্ধির সাজ-সরঞ্জাম সব এসে গেল। মৌজুদ্দিনের প্রস্তুতির উপযুক্ত উপকরণ।

দেখে, কালে খাঁ একবার আফ্‌শোষের গুঞ্জরণ শোনালেন, 'নবাব বাহাদুর কখনো আমার জন্যে এমন মেহেরবানি করেন নি…' ইত্যাদি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মেজাজ-খুশ্‌ তৈয়ার হয়ে, নতুন করে গান শুরু করলেন মৌজুদ্দিন। আর আসর জমাতে তাঁর বেশি সময় লাগল না। এবার গান শুনতে শুনতে মশ্‌গুল হয়ে গেলেন নবাব।

কালে খাঁরও ভাবান্তর ঘটল। উচ্ছ্বসিত তারিফ করতে লাগলেন সরল শিল্পীচিত্তে। আর মীর্জা সাহেবেরও বুক দশ হাত হয়ে উঠল।

এদিকে সময় যে কোথা দিয়ে বয়ে চলেছে, সে খেয়াল করেননি কেউ। মৌজুদ্দিনের গানের পর গানে রাত কখন কাবার হয়ে গেছে, কারুর সে জ্ঞান নেই।

সকালে মশাল্‌চী এসে নিভিয়ে দিতে লাগল ঝাড়লণ্ঠনের বাতি-গুলো। তখনো দাপটের সঙ্গে গাইছেন মৌজুদ্দিন। আর নবাব থেকে কালে খাঁ পর্যন্ত ঠায় বসে তাঁর গান শুনছেন।

ক্রমে বেলা আরো বাড়ল। কিন্তু নিরস্ত হবার কোন লক্ষণ দেখালেন না শ্রোতা কিংবা গায়ক।

তখন মীর্জা সাহেবই উদ্‌যোগী হয়ে আসর ভঙ্গ করালেন।

একটি গানের শেষে নবাবের অনুমতি নিয়ে বললেন, 'ভাই মৌজুদ্দিন, এবার ব্যাস করো। নবাব এখানেই সারাদিন থাকবেন নাকি? নাস্তা গোসল কিছু হবে না? আজ গান এই পর্যন্ত থাক। আবার আরেকদিন মহ্‌ফিল হবে।'……

মৌজুদ্দিনের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এমনি নানা আসরের স্মৃতি। তাঁর দুর্লভ গায়নশক্তি ও কণ্ঠমাধুর্যের, আসরের পর আসর মাত করবার ও শ্রোতাদের সম্মোহিত করবার বিচিত্র প্রসঙ্গ সব। বিভিন্ন জলসার এমনি বিচিত্র শ্রুতি স্মৃতি কালের সরণি বেয়ে উপনীত হয়েছে।

কাহিনীগুলিতে কিছু অতিরঞ্জন থাকতে পারে হয়তো। উচ্ছ্বাসের খানিক আতিশয্যও সম্ভব। কিন্তু একেবারে অমূল কিংবা অনৃত ভাষণ নৈব চ। অলীক নয়, অলিখিত হলেও। মাত্র পঁয়ষট্টি-সত্তর বছর আগের ঘটনা। তার শ্রোতৃ পরম্পরায় আজও জীবন্ত। আর সেকাল একালের সেতুস্বরূপ ওয়াকিবহাল কোন কোন ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন সাম্প্রতিক কালেও।

কিন্তু এর বিপরীত ব্যাপারও আছে। মৌজুদ্দিনকে নিয়ে প্রত্যক্ষ-দর্শী রচিত এমন বিবরণ পাওয়া যায় যা হার মানায় গাল-গল্পকেও। অবাস্তব, ভিত্তিহীন, খুশিমাফিক ধারণা। স্মৃতিচারণার নামে বিসদৃশ অহমিকা আর জল্পনা-কল্পনার একাকার সমাহার। সে প্রসঙ্গও আলোচ্য, মৌজুদ্দিনের তথ্যভিত্তিক জীবনকথার প্রয়োজনে।

'স্মৃতির অতলে'র লেখক অমিয়নাথ সান্যাল বাংলা সাহিত্যে মৌজুদ্দিনকে প্রথম পরিচিত করেন। সান্যাল মহাশয়ের সাহিত্যের আসরে প্রবেশ ঘটে ওই গ্রন্থের মাধ্যমে। তাঁর দ্বিতীয় কোন পুস্তকও প্রকাশ পায়নি এই ধরনের বিষয়ে।

যৌবনে তিনি মৌজুদ্দিনের গান নানা আসরে শুনেছেন। গায়কের সঙ্গে বাক্যালাপও করেছেন কয়েকবার। তিনি স্বয়ং সঙ্গীতবিদ। তবু তাঁর বিবৃতিতে মৌজুদ্দিন সম্পর্কে গুরুতর ভ্রমপ্রমাদ রয়েছে। তাদের নিরাকরণ দরকার। কারণ তা সত্যের মর্যাদা লাভ করতে পারে সমসাময়িক বিবরণ-রূপে। পরবর্তীকালের গবেষক তথা পাঠকদেরও বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা।

সেজন্যে অমিয়নাথের তিনটি উক্তি বিশেষভাবে সমালোচ্য :

(১) শ্যামলাল ক্ষেত্রীর জবানীতে—'পরে জানলাম তার বাপ মা আত্মীয় বলতে কেউ নেই। ডালকামণ্ডীর তয়ফাওয়ালীরা তাকে গান গাইয়ে নেয়, সকালে জিলাপী ও লুচি হালুয়া খেতে দেয়।' (স্মৃতির অতলে, পৃঃ ২০)।

(২) 'শ্যামলালজী শেষে বললেন, আর মৌজুদ্দিনের সঙ্গেও আলাপ,

করে দেখো। সে না জানে রাগ কাকে বলে, না জানে তাল, অথচ রাগ ও তালে গান করে। মাত্র একবার শুনেই একটা গোটা গান আয়ত্ত করে ফেলে। লজ্জার কথা বাইরে প্রকাশ করব কি! মৌজুদ্দিন রেখাব গান্ধার জানে না। ওকে কখনও সারগম করতে শুনবে না।

…'মৌজুদ্দিন সেবার বাবুজীর বাসায় দিন কুড়ি ছিলেন। সকালে বিকালে যখনই সুবিধা পেয়েছি, ঐ সরল শিশুর মত ব্যক্তির সঙ্গে গল্প-গুজব করে বুঝতে পারলাম, বাবুজী যা বলেছিলেন তাই ঠিক। মৌজুদ্দিন রাগ তাল জানেন না, শিক্ষাও করেননি, সারগমও সাধেননি। ঠিক যেমন হাঁসের বাচ্চাকে জলে ছেড়ে দিলে সে আপনি সাঁতার কাটে, খেলা করে, মৌজুদ্দিনও সে রকম গান করেন রাগে ও তালে।'… (স্মৃতির অতলে, পৃঃ ২২)।

(৩) 'বাস্তবিকই মৌজুদ্দিনের বিজাতীয় বিদ্বেষ ছিল অপরিচিত বাঈজীদের উপরে। আসরে সকলে এসে জমায়েত হয়েছে, মৌজুদ্দিন খাসা এদিক-ওদিক চেয়ে সকলের সঙ্গে গল্প করছেন। এমন সময় একজন বাঈজী এসে বসলেন। মৌজুদ্দিন অমনি তার দিকে পিছন ফিরে ঘুরে বসলেন। কথা বলা দূরের কথা, তার দিকে তাকাতেনই না। এর সামান্য ব্যতিক্রম ছিল গহর ও মাল্‌কা বাঈ যুগলের পক্ষে। কারণ এঁরা ছিলেন ভাইয়া সাহেব ও শ্যামলালজীর অনুগৃহীত। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে সাদা চোখে যে প্রকৃতিকে তিনি অবজ্ঞা করতেন রাঙ্গা চোখে তিনি আত্মবিস্মৃত হয়ে সেই প্রকৃতির হয়েছিলেন অসহায় ক্রীড়নক।'.... (ঐ, পৃঃ ২৩-২৪)।

প্রতিভাধর খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি-শিল্পী জগদীপ মিশ্রের কথাও সান্যাল মহাশয় উল্লেখ করেছেন মৌজুদ্দিনের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। কিন্তু তাঁর জগদীপ মিশ্র-মৌজুদ্দিনের সেই যুক্ত প্রসঙ্গেও ভ্রান্ত বিবৃতি ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু জগদীপ যে মৌজুদ্দিনের চেয়ে মহত্তর গায়ক ও বৃহত্তর প্রতিভা ছিলেন, শেঠ দুলীচাঁদের দমদম গৃহের আসরে মৌজুদ্দিন যে জগদীপের সামনে অবতীর্ণ না হয়েই

আসর থেকে পলায়ন করেছিলেন, কলকাতায় পেশাদার জীবনে জগদীপকে যে তিনি কণ্টকস্বরূপ মনে করেছিলেন এবং জগদীপ কলকাতায় অবস্থান করলে তিনি এখান থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হবেন একথা জানিয়েছিলেন শ্যামলাল ক্ষেত্রী প্রমুখ প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠীকে, তারপর শ্যামলাল ক্ষেত্রী, গণপৎ রাও প্রভৃতির চক্রান্তে শান্তিপ্রিয় নির্দল জগদীপ মিশ্রকে কলকাতার সঙ্গীত জগৎ থেকে চিরবিদায় নিয়ে নেপালে চলে যেতে হয়—ইত্যাদি ঘটনাবলী বর্তমান লেখকের 'আসরের গল্প' পুস্তকের সঙ্গীতের দীপশিখা (পৃঃ ১৬১-১৭৮) অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখানে শুধু উদ্ধৃত তিনটি প্রসঙ্গ পর্যালোচনা করা হবে। সেই সূত্রে পাওয়া যাবে মৌজুদ্দিনের ব্যক্তিজীবন তথা সঙ্গীত-জীবনের সত্য পরিচয়ও।

এখন, 'স্মৃতির অতলে' লেখকের মৌজুদ্দিন সম্পর্কে উল্লিখিত বিবৃতিগুলির কথা।

(১) সান্যাল মহাশয় মৌজুদ্দিনকে এক অনাথ বেওয়ারিশ বালকরূপে বর্ণনা করেছেন—কাশীর ডালকমিণ্ডির তয়ফাওয়ালীদের ভিক্ষান্নে যার দিন গুজরান হত।

কিন্তু মৌজুদ্দিনের প্রকৃত পূর্ববৃত্তান্ত এই :—

কাশীর চৌকের পিছনে ছাতাতলা নামে এক পল্লী আছে। সেখানকার এক বাসিন্দা ছিলেন ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়ক গোলাম হোসেন। তিনি বারাণসী নিবাসী হলেও এখানে তাঁর জন্ম কিংবা প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়নি। পাঞ্জাবের তিলমণ্ডী নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন গোলাম হোসেন। সেখান থেকে কাশীতে বাস করতে আসেন। তাঁর দুই পুত্র ও দুই কন্যার জন্ম হয় বারাণসীতে। সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মৌজুদ্দিন। কনিষ্ঠ রহিমুদ্দিন।

গোলাম হোসেনের বিবি অর্থাৎ মৌজুদ্দিনের জননী গায়িকা না হলেও সঙ্গীতে যথেষ্ট অভিজ্ঞা ছিলেন। স্বামী পেশাদার গায়ক বলে

বাড়িতে ছিল সঙ্গীতের রীতিমত পরিবেশ। গৃহে নানা গায়কবাদক-দের আসা-যাওয়া ও গানের অনুষ্ঠান, গোলাম হোসেনের নিয়মিত সঙ্গীতচর্চা, সঙ্গীতবৃত্তিধারী আত্মীয়স্বজন—এ সবের সামগ্রিক প্রভাবে এবং স্বভাবের প্রবণতায় মৌজুদ্দিনের মাতারও সঙ্গীতজ্ঞান ও সঙ্গীত-সংগ্রহ ভালই হয়েছিল। আরো জানা যায় যে, গোলাম হোসেনের বিবির কণ্ঠস্থ ছিল নানা গানের বন্দিশ্ ও চীজ্। ধ্রুপদের চেয়ে বেশী খেয়াল তাঁর সঙ্গীত ভাণ্ডারে জমা হয়।

গোলাম হোসেনের আদি নিবাস ছিল পাঞ্জাবের যে অংশে সেই তিলমণ্ডী বিখ্যাত ছিল ধ্রুপদ চর্চার একটি উচ্চ মানের কেন্দ্ররূপে। তিলমণ্ডী ঘরানা যে জন্যে সুপরিচিত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতায় আগত স্বনামধন্য ধ্রুপদী মূরাদ আলী খাঁও তিলমণ্ডী ঘরানারদার বলে কথিত আছেন। মুরাদ আলী সুদীর্ঘকাল কলকাতায় অবস্থান করেন, তাঁর মৃত্যুও হয় এখানে। তাঁর বাঙালী শিষ্যদের মধ্যে যদুনাথ রায়, অঘোরনাথ চক্রবর্তী, কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় (বিপ্লবী যাদুগোপাল ও আমেরিকা-প্রবাসী লেখক ধনগোপালের পিতা), আশুতোষ রায়, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশ ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য।

সেই তিলমণ্ডী ঘরানার ধ্রুপদ-ঐতিহ্য মৌজুদ্দিনের পিতা গোলাম হোসেনও অনুসরণ করেছিলেন কিনা তা অবশ্য জানা যায় না। কিন্তু তিনি সঙ্গীত-ব্যবসায়ী হিসাবে একান্ত সঙ্গীতসেবী ছিলেন বলে প্রকাশ। ধ্রুপদ ও খেয়াল-গায়ক পিতার দৃষ্টান্তের সামনে, সঙ্গীতচর্চার সেই অন্তরঙ্গ আবহে বাল্যকাল থেকেই মৌজুদ্দিনের গীত-শক্তি মুকুলিত হয়। পেশাদার গায়ক গোলাম হোসেন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষা দিতে থাকেন অল্প বয়স থেকে। যেমন বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে স্বর-সাধনা বা কণ্ঠসাধনা উচ্চশ্রেণীর গায়ক হবার জন্যে অবশ্য প্রয়োজন, সঙ্গীতগুণী পিতা বালক মৌজুদ্দিনকে সেইভাবেই প্রস্তুত করতে লাগলেন। পেশাদার গায়কের ঘরে এমনিই দস্তুর।

বাল্যকালেই বিদ্যাশিক্ষার মতন গুরুত্ব দিয়ে সঙ্গীতশিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে এবং মৌজুদ্দিনও তার ব্যতিক্রম নন।

প্রায় শিশুকাল থেকে গোলাম হোসেনের কাছে মৌজুদ্দিনের সঙ্গীতশিক্ষা অগ্রসর হয়েছিল। তারপর দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর চোদ্দ-পনের বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষায় বিরতি দেখা দেয়নি, জননীর প্রখর তত্ত্বাবধানের জন্যে। স্বামীহারার পারিবারিক আশা-ভরসার স্থল মৌজুদ্দিন পেশাদার গায়ক হবেন, সংসার স্থিতিলাভ করবে, এই ছিল তাঁর আশা।— স্বাভাবিকভাবেই এই উদ্দেশ্যে গোলাম হোসেনের বিবি পুত্রের সঙ্গীতচর্চার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। বিশেষত মৌজুদ্দিন বালক বয়সেই হন অতি সুকণ্ঠ গায়ক এবং প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন। ভবিষ্যতের আশা, জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিয়মিত রিয়াজ শুধু জননী দেখতেন না। আপন সংগ্রহ থেকে নানা চীজ দিয়েও সহায়তা করতেন মোজুদ্দিনের সঙ্গীত অনুশীলনকে।

গোলাম হোসেনের সুগায়ক বলে বারাণসীতে নাম ডাক কিছু ছিল। উপার্জনও এক প্রকার হত সেকালের হিসাবে। তাঁর মৃত্যুতে পরিবারটি বিপদগ্রস্ত হল বটে। কিন্তু একেবারে ভেসে গেল না কর্ত্রীর তৎপরতার জন্যে।

মৌজুদ্দিন, রহিমুদ্দিন ও দুই ভগিনী জননীর পক্ষপুটে বড় হতে লাগলেন। অনটনের মধ্যে দিন কাটলেও তাঁরা গৃহবাসী। গৃহস্থ-সুলভ তাঁদের সংসারযাত্রা। মৌজুদ্দিনকে ভিক্ষুক বালক বলা সত্যের নিতান্ত অপলাপ। তয়ফাওয়ালীদের তাঁকে আহার্য দান করার কথাও তেমনি অলীক।

শিক্ষক পিতার অবর্তমানে মৌজুদ্দিনের ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু নিয়মিত সঙ্গীতাভ্যাসে ছেদ পড়েনি। তাঁর রিয়াজ বন্ধ হতে দেননি তাঁর জননী। বালক বয়সে তয়ফাওয়ালীদের সঙ্গে মৌজুদ্দিনের সংস্রবও অসম্ভব।

সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারের কর্ত্রী কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বড় করতে লাগলেন প্রতিভাবান মৌজুদ্দিনকে। জননী জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গীত-শিক্ষায় কোনদিন ঢিলা পড়তে দেননি। শুধু তত্ত্বাবধান নয়। পিতার দৃষ্টান্ত দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে, সহযোগিতা দিয়ে ভবিষ্যৎ গায়ক-জীবনের জন্যে প্রস্তুত করে তুলতে লাগলেন মৌজুদ্দিনকে। গোলাম হোসেনের শিক্ষাধারাকে পুত্রের জীবনে অগ্রগতির পথে যাত্রা করিয়ে দিলেন।

মৌজুদ্দিনের রীতিমত শিক্ষার ভিত্তি রচিত হয় আপন ঘরেই। পেশাদার পিতার তালিমে পদ্ধতিগত আদর্শে বীজ রোপিত হয়। জল-সিঞ্চনে জননী লালন-পালন করেন সেই পেলব সঙ্গীতলতিকাকে। কিন্তু সঙ্গীত-শিক্ষার শেষ কথা সেখানেই হতে পারে না। যৌবন-কালে মৌজুদ্দিন অবশ্যই সঞ্চয় করেন বৃহত্তর সঙ্গীতক্ষেত্রের আরো নানা সূত্রে। গণপৎ রাওয়ের কাছে লাভ করারও উপযুক্ত সেসব। অাত বিচিত্র, অলক্ষ্যচারী শিল্পী-প্রাণের সংবেদনশীল সেইসব সংগ্রহ, সমীকরণ, আত্মস্থকরণের নিগূঢ় প্রক্রিয়া।

মৌজুদ্দিনের তরুণ উদীয়মান কালে বারাণসীর আকাশে বাতাসে সঙ্গীত ভাসমান থাকত। খেয়াল, ঠুংরির কত চিত্তরঞ্জিনী রস-সঞ্চারী মনোহারী সব রূপ। মৌজুদ্দিনের সুগঠিত সঙ্গীত-কণ্ঠে শিল্প-মানস-পটে সুবর্ণ রেখায় সেসব সুরধ্বনি মুদ্রিত হতে লাগল। মধুকণ্ঠ গায়ক উজ্জীবিত হতে লাগলেন নব নব সংগীতের উন্মেষে। প্রাণবন্ত ঠুংরিও তাঁর নবীন প্রাণে অপরূপ ঐশ্বর্য মাধুর্যে ধরা দিতে লাগল। আবার খেয়াল গানের তান বিস্তার লীলাও।

বারাণসী তখনো রাগসঙ্গীতের এক মহা পীঠস্থান। নানা গুণীর সমাগমে ধন্য। কাশীতে মৌজুদ্দিনের শিক্ষা-সংগ্রহের সব তথ্য পাওয়া যায় না। কাল-পর্বের হিসাব-নিকাশও জানা যায়নি নিশ্চিতভাবে। কিন্তু বারাণসীতেই মৌজুদ্দিন একাধিক দিকপাল কলাবতের সান্নিধ্য লাভ করেন ও উপকৃত হন।

তাঁর পরবর্তী জীবনের সঙ্গীত-গুরু গণপৎ রাওয়ের সঙ্গে যোগাযোগের আগে এবং পরেও তখন লক্ষ্ণৌর খেয়াল ও টপ্পা গুণী বড়ে ছুন্নি খাঁ কাশীতে ছিলেন একসময়। তখন তরুণ মৌজুদ্দিন তাঁর কাছে কিছু লাভ করেন। তা ছাড়া, গোয়ালিয়রের হদ্দু খাঁর যোগ্য পুত্র অদ্বিতীয় খেয়াল-গায়ক রহমৎ খাঁর কথাও উল্লেখ্য। তিনি মস্তিষ্করোগী হয়ে বারাণসীতে থাকেন প্রায় এক বছর। তাঁর কাছেও অনেক সঞ্চয় করেন মৌজুদ্দিন। তাঁর পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, রহমৎ খাঁ বেশ কিছুকাল মৌজুদ্দিনের ছাতাতলার ডেরায়ও আস্তানা নিয়েছিলেন।

মৌজুদ্দিনের সঙ্গে শ্যামলাল ক্ষেত্রী ও গণপৎ রাওয়ের প্রথম যোগাযোগের বিবরণ বারাণসীতে এইভাবে পাওয়া যায়—

একদিন বিকালবেলা। কাশীর গঙ্গার ধারে বসে মৌজুদ্দিন গান গাইছিলেন আপন মনে। অন্য দিনও এমনি গাইতেন। আর গানের পরে গোটাকতক ডনবৈঠক দিতেন। তারপর গঙ্গায় স্নান করে, ফিরে আসতেন ঘরে। চৌকের পিছনে ছাতাতলার সেই বাড়িতে।

সেদিন দশাশ্বমেধ ঘাটের একটি পাশে তখন বসেছিলেন মৌজুদ্দিন। আর মনের আনন্দে এই ঠুংরিটি ধরেছিলেন—

অব হারি ননদীয়া
পান খায়ে মুখ লাঘ কিয়ো।
রঙ ঠুয়ে যেইসা কেসরকা।···

গণপৎ রাওয়ের প্রিয় শিষ্য ও সেবক শ্যামলাল ক্ষেত্রী তখন কাছেই কোথাও ছিলেন। তিনি আকৃষ্ট হলেন অতি সুকণ্ঠে ওই গান শুনে।

দশাশ্বমেধ ঘাটে এসে শ্যামলাল ভাল করে মৌজুদ্দিনের গান শুনতে লাগলেন। আর গান শেষ হতেই আলাপ করলেন তাঁর সঙ্গে। মৌজুদ্দিনের প্রতিভা তিনি ঠিক বুঝেছিলেন। তাঁর এত

তরুণ বয়স দেখে, গুরুজী অর্থাৎ গণপৎ রাওয়ের কাছে নিয়ে যাবার কথাও ভাবলেন ক্ষেত্রীজী। এমন আধারের আরো শিক্ষা সংগ্রহ দরকার। এমন গ্রহীতা দেখলে গণপৎ রাও যে অকৃপণ দান করবেন সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ শ্যামলাল।

কিশোর গায়ককে তিনি আহ্বান করে নিয়ে গেলেন। ভাইয়া সাহেব (এই নামেই গণপৎ রাও সঙ্গীত সমাজে সুপরিচিত) তাঁর সঙ্গেই থাকতেন একত্র। সেখানে শ্যামলাল এবং তাঁর গুরুজী মৌজুদ্দিনের সঙ্গে পরিচিত হলেন ভালভাবে। তাঁরা মৌজুদ্দিনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর সঙ্গীতচর্চা ও বাড়ির কথা সমস্তই জেনে নিলেন। সেদিনই মৌজুদ্দিনের সঙ্গে গিয়ে শ্যামলালজী সাক্ষাৎ করলেন তাঁর জননীর সঙ্গে। নিজের এবং গুরু গণপৎ রাওয়ের পরিচয় তাঁকে জানালেন।

তারপর মৌজুদ্দিনের অভিভাবিকার কাছে শ্যামলাল ক্ষেত্রী এই ধরনের প্রস্তাব করেন—মৌজুদ্দিনকে তাঁর ও গণপৎ রাওয়ের সঙ্গে রাখবেন। তাঁকে আরও সঙ্গীতশিক্ষা দেবেন ; যেখানে যাবেন সেখানেই সঙ্গে নেবেন সযত্নে। আর মৌজুদ্দিনের যেন মাহিনা স্বরূপ তাঁর জননীকে মাসিক কিছু টাকা দেবেন। দু-চার দিনের মধ্যেই তাঁরা কাশী থেকে যাত্রা করবেন মৌজুদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে।

শ্যামলাল ক্ষেত্রী ও গণপৎ রাওয়ের সম্বন্ধেও খবর নিলেন মৌজুদ্দিনের মা। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁদের সম্মতি দিলেন।

এমনিভাবে ওস্তাদ গণপৎ রাও-এর শিষ্যমণ্ডলীভুক্ত হলেন মৌজুদ্দিন। আর নব নব শিক্ষায়, অভিজ্ঞতায় তাঁর সঙ্গীত-জীবনের পুষ্পিত পর্যায় আরম্ভ হল। আচার্য-স্থানীয় গুণী ভাইয়া সাহেবের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ঠুংরিতে। অবশ্যই ধ্রুপদ খেয়ালেও তিনি রীতিমত অধিকারী ছিলেন। কিন্তু আসরে ঠুংরি অঙ্গে বাজাতেন হারমোনিয়ম। ঠুংরিতে একটি চালের (লচাও ঠুংরি) ধারা-প্রবর্তক রূপে কথিত আছেন তিনি। মৌজুদ্দিনও তাঁর প্রভাবে ঠুংরি গায়ক

হিসাবেই বেশী জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর গানের সঙ্গে কলকাতা ও অন্যান্য আসরে হারমোনিয়ম সঙ্গত করেছেন গণপৎ রাও। তাঁর শ্যামলাল, বশির, ইরসাদ, গোফুর প্রভৃতিদের নিয়ে গঠিত শিষ্য-গোষ্ঠীর মধ্যমণি হয়ে থাকেন মৌজুদ্দিন।

গণপৎ রাওয়ের সে যাত্রায় তিনি কাশী থেকে ওস্তাদের সঙ্গী হলেন।

গণপৎ রাও নানা সঙ্গীতকেন্দ্রে যোগ দিতেন, অবস্থান করতেন কিছুদিন। সেবারও শ্যামলাল ক্ষেত্রী এবং মৌজুদ্দিনকে নিয়ে ত্যাগ করলেন বারাণসী। অন্যত্র কিছুদিন থেকে সদলে কলকাতায় উপস্থিত হলেন।

মৌজুদ্দিনের বয়স তখন বিশ বছরের কিছু কম।

সঙ্গীতে মহা পণ্ডিত এবং ঠুংরির এক নেতৃস্থানীয় গুণী গণপৎ রাও। তাঁর সঙ্গলাভে মৌজুদ্দিন তারপব থেকে অনেক শিক্ষার সুযোগ পান। তাঁর প্রতিভা গণপৎ রাওয়ের সাহচর্যে দীপ্ত হয়ে ওঠে নতুন প্রভায়।

সঙ্গীতসমাজে সম্মানিত ভাইয়া সাহেব নানা সঙ্গীতকেন্দ্রে বিশেষ কলকাতায় মৌজুদ্দিনকে ক্ষেত্র করে দিলেন। আসরে স্বয়ং হারমোনিয়ম নিয়ে সঙ্গত করতে লাগলেন মৌজুদ্দিনের গানের সঙ্গে। মৌজুদ্দিনের গান এবং ভাইয়া সাহেবের হারমোনিয়ম-বাদন আসরে আসরে পরিপূরক হয়ে উঠল। কলকাতায় শেঠ দুলীচাঁদ প্রমুখ মুক্তহস্ত সঙ্গীতপ্রেমীর আনুকূল্য লাভ করালেন মৌজুদ্দিনকে।

কলকাতাই হল মৌজুদ্দিনের প্রতিভার প্রধান বিচরণ-ক্ষেত্র। তাঁর পেশাদার সঙ্গীতজীবনের শ্রেষ্ঠ কর্মক্ষেত্রও। কলকাতা সে সময়—বিশ শতকের প্রথম ভাগে—ঠুংরি গানের চর্চা ও কদরদানের জন্যে মহা অনুকূল জগৎ ছিল। দাক্ষিণ্য প্রকাশ করে ঠুংরি গুণীদের সমাদরের এমন স্থান তখন বেশী ছিল না উত্তর ভারতে।

তারপর থেকে মৌজুদ্দিন বেশির ভাগ কলকাতাতেই অবস্থান

করতেন। কাশীতে যেতেন খুব কম। কনিষ্ঠ রহিমুদ্দিনকেও নিয়ে আসেন কলকাতায়। তাঁকেও ঠুংরি গায়ক হিসেবে এই শহরে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এখানকার সঙ্গীতক্ষেত্রে দীর্ঘকাল একজন হয়ে থাকেন রহিমুদ্দিন। তাঁর মৃত্যুও হয় কলকাতায়। সে অনেক পরের কথা।

মৌজুদ্দিনের নিজের পেশাদার সঙ্গীত-জীবনও আরম্ভ হল এই শহরে। তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী জগদীপ মিশ্রকে শ্যামলাল ক্ষেত্রীরা কলকাতার ফলন্ত সঙ্গীতক্ষেত্র থেকে আশ্রয়চ্যুত করে দেন। আর প্রতিভার অনুকূল নিরঙ্কুশ পরিবেশ লাভ করেন কাশীর মধুকণ্ঠ গায়ক মৌজুদ্দিন।

ধ্রুপদ খেয়াল গায়ক গোলাম হোসেনের পুত্র যে বারাণসীর এক ভিক্ষুক বালক ('তার বাপ মা আত্মীয় বলতে কেউ নেই') এবং অশিক্ষিত-পটু গায়ক ছিলেন না। অমিয়নাথ সান্যালের এই দুটি বিবৃতিই অবাস্তব এবং বিভ্রান্তিকর। সেই কথার সূত্রে মৌজুদ্দিনের ব্যক্তি—তথা সঙ্গীতজীবনেরও একটি রূপরেখা দেওয়া হল। এ বিবরণের মধ্যে কোন কল্প-কুহেলি নেই। আষাঢ়ে গল্প বর্জিত এবং বংশীয় ওয়াকিবহাল সূত্রে সমর্থিত মৌজুদ্দিনের এই পারিবারিক সাঙ্গীতিক পটভূমিকা। গঙ্গার ঘাটে মৌজুদ্দিনের গান শুনে শ্যামলাল ক্ষেত্রীর সঙ্গে তাঁর প্রথম যোগাযোগের কথা মৌজুদ্দিন-জননী তাঁর কোন আত্মীয়কে ওইভাবে বিবৃত করেছিলেন। মৌজুদ্দিনের সঙ্গীতজীবন গঠনে তাঁর পিতা-মাতার দান ও ভূমিকা অনুল্লেখ রাখাও গুরুতর ত্রুটি। তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদনের পক্ষে এই বৃত্তান্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচনায় প্রকাশ করা হল, অহেতুক বাদানুবাদের উদ্দেশ্যে নয়।

(২) 'স্মৃতির অতলে'র দ্বিতীয় উদ্ধৃতির বিষয়টি আরো অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য এবং অযৌক্তিক। মৌজুদ্দিন রাগ তাল কাকে বলে জানে না, শিক্ষাও করেনি, সারগম সাধেনি, রেখাব গান্ধার জানে

না—এইসব দায়িত্ববোধহীন কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত উক্তি প্রতিবাদেরও অযোগ্য। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হল, সান্যাল মহাশয়ের মন্তব্য বলে। সমালোচনা না হলে তাঁর ওই মতামতগুলি সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকত। সঙ্গীত সম্পর্কে কিছুমাত্র ধারণা যাঁর আছে ওই ধরনের মন্তব্যের অসারতা তিনি উপলব্ধি করবেন।

দীর্ঘকালের সচেতন স্বর-সাধনা, রাগ ও তালের পদ্ধতিগত শিক্ষা চর্চাদি ভিন্ন রাগ সঙ্গীত, বিশেষ খেয়াল গান যে অসম্ভব—এই ধ্রুব সত্যের বিস্তারিত সমর্থন নিষ্প্রয়োজন। ওয়াকিবহাল মহলে সান্যাল মহাশয়ের ওই উক্তি উদ্ভট ও হাস্যরসের উপাদান যোগাবে মাত্র। কিন্তু সাহিত্যজগতে এমনি মজাদার চটকদার কথা আশ্চর্য সত্য বলে গৃহীত হতে পারে। কারণ সাহিত্য-পাঠকরা এবং লেখকরা সচরাচর রাগ-সঙ্গীত কিংবা তার ব্যাকরণাদি বিষয়ে অনবহিত। সুতরাং অলৌকিক বিবরণে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এক্ষেত্রেও হয়েছে তাই।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং বহুমুখী শক্তিধর সাহিত্যিক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ও পরিণত বয়সে মৌজুদ্দিনের ওই কাহিনী পাঠ করে লিখেছিলেন, '…শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল এক আশ্চর্য গায়কের গল্প বলেছেন। তাঁর নাম মৌজুদ্দিন। তিনি কোনদিন সা রে গা মা সাধেননি, রেখাব গান্ধার জানতেন না, রাগ-রাগিণী চিনতেন না, কোন্‌টা কি তাল তাও বুঝতেন না। অথচ বড় বড় ওস্তাদদের সঙ্গে বসে তিনি একেবারে নির্ভুলভাবে উচ্চ শ্রেণীর যে কোন কালোয়াতী গান গেয়ে বৈঠক মাৎ করে দিতে পারতেন। ভারতবিখ্যাত ওস্তাদরাও তাঁর সামনে গান গাইতে নারাজ হতেন। কারণ দীর্ঘকালব্যাপী কঠিন সাধনার পর যে সব গান তাঁরা আয়ত্তে আনতে পেরেছেন, সে সব একবার মাত্র শুনেই মৌজুদ্দিন তৎক্ষণাৎ শিখে ফেলতেন এবং নিজেই আবার গেয়ে সকলকে বিস্ময়ে হতভম্ব করে দিতেন। মৌজুদ্দিন এখন পরলোকে। তাঁর গান আমিও শুনেছি বটে, কিন্তু

তাঁর এই অলৌকিক শক্তির কথা জানতুম না। অমিয়বাবুর মত বিশেষজ্ঞের মুখে না শুনলে একথা আমি বিশ্বাসের অযোগ্য বলেই মনে করতুম।' (যাঁদের দেখেছি, দ্বিতীয় পর্ব, পৃঃ ৯)। হেমেন্দ্রকুমার প্রথমে ওই যে লিখেছেন, 'শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল এক…গল্প বলেছেন।' আসল কথা অতর্কিতে এসে গেছে ওইখানে। এ-সব নিতান্তই 'গল্প'।

এই অদ্ভুত অশিক্ষিতপটুত্ব মৌজুদ্দিনের বাস্তব জীবনকথা নয়। 'হাঁসের বাচ্চাকে জলে ছেড়ে দিলে সে আপনি সাঁতার কাটে, খেলা করে' বটে। কিন্তু তেমনভাবে প্রথম শ্রেণীর খেয়াল-গায়ক হওয়া যায় না। মৌজুদ্দিনও হাঁসের বাচ্চার মতন অক্লেশে, অশিক্ষায় গায়ক হয়ে ওঠেননি। বারাণসীর সেকালের সঙ্গীতসমাজে সকলেই জানতেন এই সত্য। মৌজুদ্দিনের গান শুনেছেন, তাঁকে বিলক্ষণ অবগত আছেন এমন একাধিক গুণী কাশীতে এখনো বিদ্যমান। যেমন, ওস্তাদ বেচু মিশ্রের বংশীয় খেয়াল-টপ্পা গায়ক, অশীতিপর রামু মিশ্র। তাঁরও দ্বিধাহীন উক্তি ঃ 'যেমন পদ্ধতিগত-ভাবে বছরের পর বছর খেয়াল গায়করা শেখেন, তেমনিভাবে মৌজুদ্দিনও শিখেছিলেন—' সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য, কারণ নিরপেক্ষ। বাল্যকাল থেকে ধ্রুপদ খেয়াল গায়ক পিতার শিক্ষাধীনে স্বর-সাধনা ও দস্তুরমত সঙ্গীতচর্চা করেই খেয়াল ঠুংরি দাদরা গায়ক হয়েছিলেন মৌজুদ্দিন। হাঁসের বাচ্চার উপমা এক্ষেত্রে নিতান্ত অর্থহীন, অবান্তর, অযথার্থ!

হেমেন্দ্রকুমারের আরেকটি বাক্যও বর্তমান প্রতিবাদের প্রেরণা দিয়েছে। 'অমিয়বাবুর মত বিশেষজ্ঞের মুখে' না শুনলে অনেকেই মৌজুদ্দিনের ওইসব 'অলৌকিক শক্তির কথা' বিশ্বাসের অযোগ্য বিবেচনা করবেন, এই আশঙ্কায় প্রসঙ্গটি করা হয়েছে, জীবনী-লেখকের কর্তব্য ও দায়িত্ববোধে। সান্যাল মহাশয়ের প্রতি ব্যক্তিগত বিরূপতার বশে নয়। মনে হয়, তিনি প্রিয় গায়ক

সম্পর্কে 'বীরপূজা'র বাগাড়ম্বর করে ফেলেছেন ভাবের উচ্ছ্বাসে। অমিয়নাথের 'কালে খাঁ' অধ্যায়েরও (একই পুস্তকে) একাধিক বিবরণের অসারতা প্রদর্শন করতে হয়েছে 'কালে খাঁ বনাম এমদাদ খাঁ' নিবন্ধে (সঙ্গীতের আসরে, পৃঃ ৯৯-১১৯)।

(৩) তৃতীয় উদ্ধৃতির বিষয়টিও কম উদ্ভট নয়। বাস্তবিকই মৌজুদ্দিনের 'বিজাতীয় বিদ্বেষ ছিল অপরিচিত বাঈজীদের ওপর' 'সাদা চোখে যে প্রকৃতিকে তিনি অবজ্ঞা করতেন' ইত্যাদি বিবৃতির সঙ্গেও বাস্তব সত্যের সম্পর্ক কোথায় ?

মৌজুদ্দিনের সমগ্র পেশাদার সঙ্গীত-জীবনেই বাঈজীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। এমন কি সত্যের খাতিরে স্বীকার্য, ওয়াকিবহাল মহলের শ্রুতিস্মৃতিতে তাঁকে পাওয়া যায় এই শ্রেণীর রমনীদের সঙ্গকামী রূপেই। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তিনি নানা বাঈজীকে তালিম দিয়েছেন তাঁদের ঘরে বসে। 'বিজাতীয় বিদ্বেষ' কিংবা 'সাদা চোখে অবজ্ঞা' কিছুই প্রকাশ পায়নি তাঁর বাঈজীদের সঙ্গে সুদীর্ঘ সময়ের মেলামেশায়। কিংবা শিক্ষাদান কালের সাঙ্গীতিক যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের বেলায়। মৌজুদ্দিন অন্তত কুড়ি বছর কলকাতায় সঙ্গীতজীবন যাপন করেন। সে সময়ের মধ্যে তালিম দেন আগ্রাওয়ালী মাল্‌কা জানকে, জদ্দন বাঈকে, চুলবুলাওয়ালী মাল্‌কাকে, আসমৎ বাঈ ও চন্দা বাঈ (রোশেনারার জননী) ভগ্নীদ্বয়কে।

উল্লিখিত বাঈজীরা বেশী পরিচিতা ও প্রসিদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ভিন্ন আরো বাঈজী মৌজুদ্দিনের কাছে নানা সময়ে কলকাতাতেই ঠুংরি দাদরা শেখেন যাঁদের নাম জানা যায়নি তাঁদের খ্যাতির অভাবে।

তাছাড়া, কলকাতা থেকে অল্পকালের জন্যে মাঝে মাঝে বারাণসীতে মৌজুদ্দিন বাস করে আসতেন। তারই মধ্যে তালিম দিতেন বড়ী মতী বাঈকে বিশেষ করে। তা ভিন্ন

মানুকী বাঈ প্রভৃতি আরো কজন বাঈজীকেও তিনি কাশীতে শিখিয়েছেন।

এত বাঈজীফে মৌজুদ্দিনের এতকাল যাবৎ তালিম দেওয়া অসম্ভব হত তাঁদের প্রতি 'বিজাতীয় বিদ্বেষ' বা 'সাদা চোখে অবজ্ঞা' থাকলে- একথা বোঝা আদৌ কঠিন নয়।

কথা যখন উঠেছে, প্রসঙ্গত আরো একটি বিষয় এখানে যোগ করা যায়। মৌজুদ্দিনের বিবাহিতা বিবি থাকতেন কাশীতে। সেখানে তাঁরা নিঃসন্তান। কিন্তু কলকাতায় মৌজুদ্দিনের আর এক জীবনসঙ্গিনী বাস করতেন এবং তাঁদের এক পুত্রের কথা জানা যায়। মৌজুদ্দিনের সেই আত্মজ এখনো কলকাতায় বর্তমান। তাঁর বয়স এখন প্রায় পঞ্চান্ন বছর। মৌজুদ্দিনের উত্তরাধিকার তাঁর ওপর কিছু বর্তেছে। কারণ তিনি ভাল হারমোনিয়ম-বাদক। হারমোনিয়মে ঠুংরি অঙ্গ বাজাবার দিকেই তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা। তাঁর কাছে জানা যায় যে তাঁর সাত বছর বয়সে মৌজুদ্দিনের মৃত্যু হয়। মৌজুদ্দিনের এই পুত্র কাশীতেও ছিলেন কিছুকাল। মৌজুদ্দিন জননীর আদর যত্নও পেয়েছিলেন।

নানা সূত্রে যতদূর বোঝা যায়, ১৯২৮-২৯ সালে যবনিকা পতন ঘটে মৌজুদ্দিনের সঙ্গীতজীবনে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স চল্লিশ পার হয়েছিল। কিন্তু পঁয়তাল্লিশ উত্তীর্ণ কিনা সন্দেহ। সেই হিসাবে তাঁর অকাল-মৃত্যু বলা যায় হয়ত। কারণ গৌরবর্ণ সুপুরুষ মৌজুদ্দিন বেশ স্বাস্থ্যবানও ছিলেন। ছেলেবেলা থেকে স্বাস্থ্যচর্চা করতেন নিয়মিত। তাছাড়া পশ্চিমের সন্তান। সুতরাং শরীর তাঁর সুগঠিত ছিল। কিন্তু উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে শরীরে ভাঙন ধরে যৌবন-কালেই। মৌজুদ্দিদের তুল্য গায়ক উচ্চ-কোটির শিল্পী। কিন্তু একথাও অস্বীকার করা চলে না যে, ভারতীয় সঙ্গীতকে এঁরা বড়ই গ্লানিময় তামসিকতায় নামিয়েছিলেন। সাত্ত্বিক চরিত্র আশা করা যায় না এই পটভূমির শিল্পীদের কাছে। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা

থাকলে রাজসিক হওয়া সম্ভব ছিল। তাঁদের শিল্পী-জীবনও তাহলে যেমন শোভন, সৌন্দর্যময় দেখাত, তেমনি মণ্ডিত হত পরিপূর্ণ সার্থকতায়।......

জীবনের উপসংহার পর্বে মৌজুদ্দিনের কলকাতায় বাস আর সম্ভব হয়নি। অসুস্থতার জন্যে অবসর নিতে হয় পেশাদারী সঙ্গীতজীবন থেকে।

নৈরাশ্যকর ভগ্ন শরীরে তিনি এতকালের সঙ্গীত-ক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়ে যান। স্বাস্থ্যলাভের আশায় প্রথমে আসনে লক্ষ্ণৌতে। গণপৎ রাওয়ের আর এক প্রিয় শিষ্য এবং সুবিখ্যাত ঠুংরি শিল্পী বব্বন সাহেবের (সৈয়দ আলী কদর) লক্ষ্ণৌ-আবাসে অতিথি থাকেন কয়েক মাস। কিন্তু স্বাস্থ্যোদ্ধার অসম্ভব হয়। নিশ্চিতভাবে ঘনিয়ে আসে অমোঘ অন্তিমকাল। তখন কাশীতে ফিরে আসেন। অবশেষে একদিন ছাতাতলার সেই আবাল্য বাসস্থানেই শেষ নিঃশ্বাস পড়েছিল মৌজুদ্দিনের।...

তাঁর কয়েকটি গানের গ্রামোফোন রেকর্ড হয়েছিল। (১) রং দেখ্ জিয়া লল্চায় (ভৈরবী ঠুংরি)। (২) পিরায় মোরি আঁখিয়া, রাজা হাম সে না বোলো (খাম্বাজ, দাদরা)। (৩) পানি ভরেলি কোন্ আলবেলি কিনার ঝমাঝম্ (গারা, দাদরা)। (৪) ফুলওয়া বিনত ডার ডার (বসন্ত। খেয়াল)। (৫) লঙ্গর কা করিয়ো জিনে মারো (গুর্জরি তোড়ি। খেয়াল) ইত্যাদি।

মৌজুদ্দিনের পেশাদার জীবনের প্রায় সর্বাংশই—অন্ততঃ কুড়ি বছর—কলকাতায় অতিবাহিত হয়। কলকাতায় অজস্র মহ্ফিল থেকে উপার্জন করতেন—শনি-রবিবার একটা-দুটো আসর তাঁর হতই। দমদমের নানা বাগানবাড়িতে, বড়বাজার বৌবাজার জোড়াসাঁকো অঞ্চলের বিভিন্ন সঙ্গীতবিলাসীদের আসরে আসরে মৌজুদ্দিনের গান কলকাতার সঙ্গীত-সমাজের অঙ্গ ছিল দীর্ঘকাল যাবৎ।

মধ্য ও উত্তর কলকাতার নানা স্থানে তিনি বাস করেছেন।

রাজাবাজারে ছিলেন অনেক দিন। লালবাজার বৌবাজার অঞ্চলের বাঈজী পাড়াতেও থাকেন। শেঠ তুলীচাঁদের দমদমের বাগান-বাড়িতে আসর হলেই থেকেছেন অনেক সময়। শ্যামলাল ক্ষেত্রীর ১০১ হ্যারিসন রোডের আস্তানায়ও মৌজুদ্দিন কখনো কখনো অবস্থান করেছেন। আরো নানা জায়গায় থেকেছেন কলকাতায়।

কাশী, বিশেষ কলকাতার অনেক শ্রেষ্ঠা বাঈজীই রীতিমত গান শিখেছেন তাঁর কাছে। বিভিন্ন বাঈজীদের যে সারা জীবন ধরে তালিম দিয়েছেন তাও তাঁর পেশাদার সঙ্গীতজীবনের এক বৈশিষ্ট্য। কাশীর বড়ী মোতি বাঈ, মান্‌কী বাঈ প্রভৃতি এবং কলকাতার আগ্রাওয়ালী মাল্‌কা, জদ্দন বাঈ, আসমৎ বাঈ, চন্দা বাঈ, চুলবুলা-ওয়ালী, মাল্‌কা, হেনা বাঈ এবং আরো অনেক বাঈজী তাঁর কাছে গান শিখেছেন দীর্ঘকালের সংস্রবে ও সঙ্গ লাভে। মৌজুদ্দিনের সঙ্গীত-জীবনের শ্রুতি-স্মৃতিতে যেমন ওতপ্রোত হয়ে আছে তাঁর বহু আসর মাত করার কাহিনী, তেমনি সেরা বাঈজীদের সঙ্গে তাঁর প্রীতিময় ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাও। বাঈজীদের প্রতি তাঁর 'বিজাতীয় বিদ্বেষ' কিংবা 'সাদা চোখে' তাঁদের প্রতি অবজ্ঞার একটিমাত্র দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় না।...

গহর জান কখনো মৌজুদ্দিনের কাছে তালিম নেননি, আগ্রাওয়লা কিংবা জদ্দন, আসমৎ বাঈ প্রভৃতির মতন। কিন্তু গণপৎ রাওয়ের শিষ্যা বলে তাঁর সঙ্গেও মৌজুদ্দিনের সহযোগিতায় একটি হার্দিক সম্বন্ধ ছিল। বহু আসরে গহর জান শুনেছেন মৌজুদ্দিনের গান। একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তাঁরা। ইন্দোরের যে বসির খাঁ (গণপতের শিষ্য এবং আল্লাদিয়া খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র) মৌজুদ্দিনের গানের সঙ্গে আসরে হারমোনিয়ম বাজাতেন, তিনি গহর জানেরও হারমোনিয়ম বাদক। বসির খাঁ যেমন মৌজুদ্দিনের রেকর্ডে হারমোনিয়ম সঙ্গত করেছেন, তেমনি গহর জানেরও রেকর্ডে। এমনি নানাভাবে মৌজুদ্দিনের সঙ্গে গহর জানের সাঙ্গীতিক যোগাযোগ ছিল।

বাঈজী মহলের মতন কলকাতায় মৌজুদ্দিনের গায়ক শিষ্যদের নামও উল্লেখ্য। বাংলার স্বনামধন্য ঠুংরি-গুণী গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মৌজুদ্দিনের কাছে দীর্ঘকালের সান্নিধ্যে অনেক গ্রহণ করেছিলেন। শ্যামলাল ক্ষেত্রীর আবাসে, দুলীচাঁদের ভবনে এবং বহু ঘরোয়া, প্রকাশ্য আসবে মৌজুদ্দিনের গান তন্নিষ্ঠ অনুধাবন করে সেই চালেব র আত্মস্থ করেন গিরিজাশঙ্কব। মৌজুদ্দিনের সঙ্গে বহুদিনের সংশ্রবে গিরিজাশঙ্করের ঠুংরি-শিল্পীর জীবন সার্থকতার পথে অগ্রসর হয়ে যায়। এই সব কারণে তিনিও পরোক্ষে মৌজুদ্দিনের শিষ্যরূপে গণনীয়।

বরাহনগরের অমূল্যধন পাল ছিলেন মৌজুদ্দিনের এক সঙ্গীতশিষ্য।

তখনকার উদীয়মান খেয়াল ঠুংবি গায়ক অনাথনাথ বসুর কথা বলা হযেছে প্রথমেই। তিনি মৌজুদ্দিনেব কাছে ঠুংবি দাদরা শিক্ষার সুযোগ পান। আগ্রার মাল্‌কা জানের অনুরোধে মৌজুদ্দিন অনাথনাথকে (ইণ্ডিয়ান মিরব স্ট্রীটের বাড়িতে) যে সমস্ত গানের তালিম দেন তাঁর মধ্যে ছিল—(১) 'পিরায় মোরি আঁখিয়া রাজা হাম সে না বোলো, (২) সাঁচি কহো মুসে বাতিয়া (খাম্বাজ, ঠুংরি), (৩) সজন কাহে কো নেহা লাগাও, আঁখিয়া তরস ত হায় তুমহাবি দরশ কো (খাম্বাজ মিশ্র, ঠুংরি), (৪) নির মহি মোরা জিয়ারা কেইসে জাদু ডরা (পিলু মিশ্র, দাদরা)—এইসব চমৎকার গান।

পরবর্তীকালেব সুপরিচিত ঠুংরি, দাদরা গায়ক জমিরুদ্দিন খাঁও মৌজুদ্দিনের এক শিষ্য বলা যায়। বহুদিন যাবৎ তিনি মৌজুদ্দিনের সেবা পরিচর্যা করে, ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের ফলে এবং সঙ্গীতক্ষমতায় আয়ত্ত করেন মৌজুদ্দিনের ঠুংরির চাল। সংগ্রহ করেন তাঁর দাদরা ঠুংরির সম্পদ। মৌজুদ্দিনের মৃত্যুর পর কলকাতার সঙ্গীতাসবে তাঁর স্থান খানিক অধিকার করেছিলেন জমিরুদ্দিন খাঁ, তাঁরই ধারা অনুসরণে।

আর আখ্‌তাব-এ-মুসিকী ফৈয়াজ খাঁ? তাঁর সঙ্গীত-জীবনের

সঙ্গে মৌজুদ্দিনের গানের এক নিগূঢ় রহস্যময় সম্বন্ধ ছিল। মৌজুদ্দিনের রসোত্তীর্ণ সঙ্গীতের অনুভবে, যৌবনকালে ফৈয়াজ খাঁর চোখে ঝরত আনন্দের, আবেগের অশ্রু। তখন মাল্‌কা জানের সেই কক্ষে চৌপাইয়ের আড়ালে থেকে দিনের পর দিন অন্তরঙ্গভাবে মৌজুদ্দিনের গান তিনি শুনেছিলেন। আর গানকে রসাপ্লুত, রমণীয় করবার এক মহৎ ধারণা ও আদর্শ পেয়েছিলেন মৌজুদ্দিনের গায়ন-রীতি থেকে। ফৈয়াজ খাঁ তাঁর দৃষ্টান্তে শুধু ঠুংরি গানের প্রেরণা পানান। খেয়ালের কোন কোন কারুকর্মও যে গ্রহণ করেন তা বোঝা যায় মৌজুদ্দিনের গানের রেকর্ড থেকে।

মৌজুদ্দিনের সঙ্গে ফৈয়াজের প্রথম যৌবনকালে সেই অদৃশ্য সংযোগ। মাল্‌কা জানের ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট ভবনে, এক নাটকীয় পরিস্থিতিতে। ফৈয়াজ-জীবনের সেই অপ্রকাশিত অধ্যায়।

তারপর দীর্ঘকাল পার হয়ে গেছে। মৌজুদ্দিনের সঙ্গে আর তাঁর তেমন যোগাযোগ ঘটেনি। ভারতের দুই প্রান্তে প্রধানত অবস্থান করেছেন দুজনে। মৌজুদ্দিন পূর্বাঞ্চলে এবং ফৈয়াজ দাক্ষিণাত্যে ও পশ্চিমে। লক্ষ্যে অলক্ষ্যে কি বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে ভারতের সঙ্গীত-জগতে, ফৈয়াজ খাঁর সঙ্গীত-জীবনে। কবে মৌজুদ্দিন জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রস্থান করেছেন। আর মহীশূরের রাজদত্ত উপাধি 'আফ্‌তার-এ-মুসিকী'-কে সার্থক করে তিনি সঙ্গীতাকাশে পরিক্রমণ করেছেন প্রখর দীপ্তিতে। সেই সূর্য এখন ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে, করুণ ছটায় গগন আকীর্ণ করে।

অস্তের ক্ষণকাল বিলম্ব মাত্র। এমনি এক সময়ের কথা।

মৌজুদ্দিনের কোকিল-কণ্ঠ প্রায় দুই যুগ আগে চির-নীরব হয়ে গেছে। এখন বরোদায় ফৈয়াজও একই পথের পথিক।

ভারতপ্রসিদ্ধ কলাকার একই পন্থায় ইহলোক ত্যাগের যাত্রী। অহোরাত্র পানে পানে মরণকে ত্বরান্বিত করে আনছেন। স্বখাত সলিলে নিমজ্জমান।

সেদিনও ফৈয়াজ খাঁ ঘরে ছিলেন সঙ্গের সঙ্গী বোতলবাহিনী নিয়ে।

এক গায়ক, একজন বাঈজী এবং একটি সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তি তখন ফৈয়াজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। তাঁদের আলাপন হচ্ছে পুরানো জমানার গীত-শিল্পীকুল সম্পর্কে।

অতিথিরা পূর্ব যুগের একেকজনের নাম করে জিজ্ঞেস করছেন, 'উও গাওয়াইয়া কেইসা থে? আপকা গানা কিস ঢং কা?' এমনি ধরনের প্রশ্ন।

ফৈয়াজ খাঁ পান করছেন। আর একেক মন্তব্যে নস্যাৎ করে দিচ্ছেন এক-একজন নামী ওস্তাদকে—'আরে গোলি মারো।' 'আরে ঝাড়ু লাগাও।' ইত্যাদি।

কথায় কথায় একজন জানতে চাইলেন মৌজুদ্দিনের বিষয়ে। তিনি কেমন গাইতেন? তাঁর গানের চাল কিরকম ছিল, খাঁ সাব?

অমনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন ফৈয়াজ খাঁ। তাঁর মুখ-চোখের ভাব অন্য রকম হয়ে উঠল। পানপাত্র সরিয়ে রাখলেন এক পাশে।

উচ্চারণ করে কি যেন তিনি বলতে চাইলেন। কিন্তু আবেগে অবরুদ্ধ হয়ে গেল কণ্ঠস্বর। কোন কথার পরিবর্তে তাঁর বিস্ফারিত চক্ষু দিয়ে শুধু বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরতে লাগল। বাক্যহারা ফৈয়াজ খাঁ।

কিন্তু এ তাঁর সেই যৌবনের শিল্পী-প্রাণের আনন্দাশ্রু নয়। মৌজুদ্দিনের নাম শুনে, তাঁর গানের স্মরণ-মননে উচ্ছ্বসিত, অন্তিমের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ফৈয়াজ খাঁর জীবনসায়াহ্নে চোখের জলে মৌজুদ্দিনের স্মৃতি-তর্পণ।...

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥